দাঙ্গাবিরোধী গল্প

সম্পাদনা ও অনুবাদ

কমলেশ সেন

প্রতপাদী ১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশিকা ঃ প্রীতি মুখার্জী, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক ঃ বিভোর মান্না, দেওয়ালী প্রেস, ১৪০/২, বেনারস রোড, হাওড়া ও
মনোরঞ্জন পান, নিউ জয়কালী প্রেস, ৮/এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-৭০০০০৬ ।

প্রকাশকাল মার্চ ১৯৬২

মুখবন্ধ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে সাম্প্রদায়িকতার উৎস, সময়-কাল এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিদ্বজ্জনদের মধ্যে অবশ্যই যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এই মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তবে তাঁরা অধিকাংশই অন্তত একটা বিষয়ে একমত যে, ব্রিটিশ শাসনকালে একদিকে যেমন সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে উঠেছে এবং সেই ঐক্য জঙ্গী রূপ নিয়েছে; তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির চক্রান্তে একাধিকবার সাম্প্রদায়িক অনৈক্য এবং রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত সুকৌশলে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি চালিয়ে গিয়েছে—যে রাজনীতি আজ সুগভীরভাবে এদেশের মাটিতে প্রোথিত।

একদিন এই ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীরাই বিপ্লবের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম দেয়—যাতে বিপ্লবের রাশ জাতীয় কংগ্রেসের বুর্জোয়া নেতাদের হাতে থাকে। কিন্তু তা সত্বেও ভারতবর্ষের শোষিত নির্যাতিত মানুষ এই কংগ্রেসের পতাকাতলেই জমায়েত হয়। তাই কংগ্রেস নেতৃত্বের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের বেড়াজাল বারবার ভেঙ্গে পড়ে সেই আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও শাসনের ভিত কাঁপিয়ে তোলে।

জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব এবং বিকাশের যুগে জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতারা জাতীয়তার ভারতীয় ভিত্তিভূমি অনুসন্ধান করছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম এবং সামন্ততান্ত্রিক হিন্দু সংস্কৃতিকেই তাঁদের জাতীয়তার ভিত্তি করলেন। ফলে গো-রক্ষা সমিতি স্থাপন, শিবাজী উৎসব এবং গনেশ পূজারও প্রচলন এবং বাঙলা দেশে শক্তির উপাসনা শুরু হয়। এমন কি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শক্তির এই উপাসনায় মেতে ওঠে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের এই মেল-বন্ধন ছিল মারাত্মক। আজও এই বন্ধন নানাভাবে অটুট।

এই জাতীয়তাবাদী নেতারা জাতীয় আন্দোলনকে পরিপুষ্ট, সতেজ ও সবল করার জন্যে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের বীর নেতাদের কখনই ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন না। অথচ তাদের সামনেই ছিলেন বাসুদেব ফাড়কে, চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, কুঁয়ার সিংহ, ফৈজাবাদের মৌলনা আহম্মদুল্লাহ—ছিল সাঁওতাল এবং নীল বিদ্রোহের অমর সংগ্রামের কাহিনী

ও বীর নায়করা। কিন্তু কেন তাঁরা এই সংগ্রামী ঐতিহ্যগুলির মধ্যে থেকে জাতীয়তার মাল-মশলা সংগ্রহের জন্যে আগ্রহী হলেন না? তার কারণ এই সব নেতারা ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ। শ্রেণী-স্বার্থকেই তাঁরা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন।

এই উগ্র এবং প্রাচীনপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতারা পরবর্তী সময়ে অধিকাংশই হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতায় পরিণত হন এবং ইংরেজদের সমর্থক হয়ে ওঠেন। ফলে হিন্দু মহাসভা এবং আর-এস-এস-এর মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়।

স্বাভাবিক কারণেই ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনে এক বিরাট ফাটল সৃষ্টি হয়—যে ফাটল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ে বিষের ধারা। তাই একদিন (১৯০৬, ৩০ ডিসেম্বর) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন এবং উসকানিতে জন্ম হল ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ্-র নেতৃত্বে মুসলিম লীগ। মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের খয়ের খাঁ হয়ে আসরে নামে এবং বিভেদ সৃষ্টি করতে থাকে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মেহনতী মানুষ নেতৃত্বের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে সংগ্রামের রণভূমিতে অবতীর্ণ হয়। এই রণভূমি ছিল যেমন ব্যাপক তেমনি সুসংহত। এই সুসংহত সংগ্রামের রূপ আমরা দেখতে পাই পেশওয়ার অভ্যুত্থান, শোলাপুর কমিউন, বরদৌলী কৃষক অভ্যুত্থান, চৌরিচোরা, পুন্নপা ভায়লারের কৃষক সংগ্রাম, রশিদ আলী দিবসে।

এইসব গণ-অভ্যুত্থান এবং সংগ্রামে ভীত-সন্ত্রস্ত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে ভারত বিভাগের পরিকল্পনা করে। এবং সমগ্র উপমহাদেশে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। এই দাঙ্গা যে কত সর্বগ্রাসী আকার ধারণ করে তা আমরা প্রত্যক্ষ করি আমাদের জীবন এবং মান-সম্মান দিয়ে।

ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বাঙলা দেশ—সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতি এবং সমাজ জীবনে এই সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতি বিদ্বেষ আজ গভীর থেকে গভীরতর আকার ধারণ করেছে। এই কট্টর সাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং রাজনীতির বিরুদ্ধে যে আদর্শগত এবং তত্ত্বগত লড়াই পরিচালনা করা উচিত ছিল তা আজও অনুপস্থিত। অনুপস্থিত বলেই যাঁরা সমাজ সচেতন-বলে পরিচিত, তাঁরাও নির্বাচনে মুসলিম এলাকায় মুসলিম প্রার্থী দাঁড় করান। এবং নির্বাচনে ধর্মের আশ্রয় নেন।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী রাজনীতির সপক্ষে দৃঢ়ভাবে না দাঁড়ালে এ দাঙ্গা কখনই বন্ধ করা সম্ভব নয়। শুধু দু ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া আমাদের আর কোন কিছুই করার থাকবে না। কারণ আজ যে তীব্র শ্রেণী

সংঘাত শুরু হয়েছে সেই শ্রেণী সংঘাতকে ধ্বংস করার জন্যে শাসকশ্রেণী আরও উগ্র আকারে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও জাতপাতের জিগির তুলে রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে।

এই বিদ্বেষ, এই হত্যার বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ উঠেছে—প্রতিরোধও হয়েছে। সেই প্রতিবাদ, সেই প্রতিরোধ একদিকে যেমন শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী মানুষও করেছে, তেমনি লেখক শিল্পীরাও নীরব-নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেননি। আমরা চাই সারাদেশ ব্যাপী এই দাঙ্গার বিরুদ্ধে আবার সোচ্চার প্রতিবাদের ঝড় উঠুক। এই প্রতিবাদ ক্রমেই সংহত রূপ নিক এবং আমাদের মনন ও চিন্তার জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করুক। এই আলোড়ন এবং লক্ষ্যমুখ নির্দিষ্ট করার জন্যই এই সংকলনের প্রচেষ্টা। সংকলনের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে দেশ বিভাগের সময়-পর্বে রচিত ছোট গল্প থেকে। এই গল্পগুলোর রাজনৈতিক সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

সংহত জীবনবোধ এবং চিন্তায় সমুজ্জ্বল
আশা, মার্গারেট, আয়েশা, কল্পনা, মলয়া, রতি
মালতি, তৃপ্তি, মিতা, লিলি, বুলু এবং আরতি গাঙ্গুলীকে

সংকলনের গল্প

অমৃতসর / কৃষণ চন্দর : ৫
ভারতমাতার পাঁচ রূপ / খাজা আহামদ আব্বাস : ২৮
ওস্তাদের কসম / কিশোর শাহ্ : ৪৯
রমন্তে তত্র দেবতা / অজ্ঞেয় : ৫৪
ঘরের খোঁজে / রাঙ্গেয় রাঘো : ৬৪
গুরমুখ সিং-এর উইল / সাদাত হোসেন মণ্টো : ৮০
সাদা ঘোড়া / রমেশ চন্দ্র সেন : ৮৮
একটি তুলসী গাছের কাহিনী / সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ : ৯৬
আদাব / সমরেশ বসু : ১০৫
ড্রেসিং টেবিল / সলিল চৌধুরী : ১১৪
ঠাণ্ডা প্রাচীর / গুরমুখ সিং জিত : ১২৭
দলিল / নারায়ণ ভারতী : ১৪৫
ব্যথার মঞ্জরী / অমৃত রায় : ১৪৯
অমৃতসর এসে গিয়েছে / ভীষ্ম সাহানী : ১৫৬
খড় কাটার মেশিন / উপেন্দ্র নাথ অশ্ক : ১৭২
অতীত / দর্শক : ১৭৮
জল এবং পুল / মহীপ সিং : ১৮৫
খোদা আর ঈশ্বরের লড়াই / যশপাল : ১৯৩
লাজবন্তী / রাজেন্দ্র সিং বেদী : ২০৫

কৃষণ চন্দর

অমৃতসর

কৃষণ চন্দর উর্দু সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কথাশিল্পী। জন্ম :১৯১৪, ২৬ নভেম্বর। শৈশব এবং যৌবনের অধিকাংশ দিন অতিবাহিত হয় কাশ্মীরে। ১৯৩৪ সালে লাহোর ক্রিশ্চান কলেজ থেকে ইংরেজী সাহিত্যে এম.এ. করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে লিখতে শুরু করেন। সাহিত্যে তিনি সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় বিশ্বাসী। প্রগতি লেখক সংঘের তিনি ছিলেন একজন অন্যতম কর্ণধার। 'গদ্দার', 'যব খেত জাগে' 'এক গাধা কি আত্মকথা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'হাম ওয়াসি হ্যায়' 'অন্নদাতা' 'ফুল আউর পাথর' প্রভৃতি গল্প সংকলন তাঁকে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে তুলে দেয়। ব্যঙ্গ গল্প রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় তাঁর একাধিক গল্প অনূদিত হয়।

স্বাধীনতার আগে

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। এই হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে হিন্দু এবং মুসলমান দু-ই ছিল। হিন্দু এবং মুসলমান, মুসলমান এবং শিখদের আলাদা আলাদা ভাবে চেনার কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। তাদের চেহারা, তাদের মেজাজ, তাদের চাল-চলন এবং ধর্ম পৃথক হওয়া সত্ত্বেও, জালিয়ানওয়ালাবাগে আজ তাদের সবাইকে এক এবং অভিন্ন করে দিয়েছিল। তাদের হৃদয়ে একই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা টগবগ করছিল। আর এই ধিকি ধিকি আগুনের উত্তপ্ততা সমাজ ও সভ্যতার যে বন্ধুত্ব তাকে একসূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছিল। তাদের হৃদয়ে বিপ্লবের এমন এক নিরন্তর স্রোতধারা প্রবাহিত হচ্ছিল, যে স্রোতধারা চারদিকের পরিবেশকে বিদ্যুতের ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল এই শহরের বাজারের প্রতিটি পাথর, দালান-কোঠার প্রতিটি ইট যেন এই নিস্তব্ধ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত,—যেন এক থর থর হৃৎকম্পনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর তা যেন প্রতিক্ষণ বলে চলেছিল : স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। সেই ভিড়ের

প্রতিটি মানুষ নিরস্ত্র, সবাই আজাদীর জন্যে উন্মাদ। তাদের হাতে লাঠি বা রিভলবার, ব্রেনগান বা স্টেনগান, হ্যাণ্ডগ্রেনেড বা দেশী-বিদেশী কায়দায় তৈরি বোম—কোন কিছুই ছিল না। তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিরস্ত্র, কিন্তু তাদের চোখে যে আগুন ঝরছিল তাতে ছিল ভূমিকম্পের প্রলয়ঙ্করী তেজ এবং উত্তাপ।

সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের হাতে ছিল লোহার হাতিয়ার। আর জালিয়ানওয়ালাবাগের মানুষের হৃদয় তৈরি হয়েছিল ইস্পাতে-ইস্পাতে। আর তাদের রক্তে এমন এক পবিত্র তেজ সৃষ্টি হয়েছিল, যে তেজ শুধু মহান আত্মত্যাগ থেকেই জন্ম নিতে পারে। পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর জল, তার রোমান্স, তাঁর সাচ্চা প্রেম আর তার ঐতিহ্যময় বীরত্ব আজ প্রতিটি মানুষের প্রতিটি শিশুর প্রতিটি বৃদ্ধের জ্যোতির্ময় চেহারায় জ্বল জ্বল করছিল। আর এই সমুজ্জ্বল গরিমা তারা সেই মুহূর্তেই অর্জন করেছিল। এই সমুজ্জ্বল গরিমা একটি জাতির জীবনে এনে দেয় যৌবন—ঘুমিয়ে থাকা দেশকে তোলে জাগিয়ে। যারা অমৃতসরের এই ক্রোধ দেখেছে, তারা কখনও গুরুর এই পবিত্র নগরীর কথা ভুলতে পারবে না।

জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার মানুষের ভিড়। আর এই হাজার হাজার মানুষের ওপর চলে গুলির বর্ষণ। তিন দিক থেকে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, শুধু একদিকে ছোট্ট একটা দরজা খোলা ছিল। এই দরজা ছিল জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে প্রসারিত। হাজার হাজার মানুষ হাসতে হাসতে শহীদের মৃত্যু বরণ করল। স্বাধীনতার জন্যে হিন্দু মুসলমান এবং শিখ একজোট হয়ে হৃদয়ের খাজাঞ্চিখানা উজার করে দিল। আর পঞ্চনদীর বিস্তীর্ণ ধারার সঙ্গে আর একটি নদীর ধারা মিলিত করল। এ তাদের সম্মিলিত রক্ত-নদী—এ তাদের রক্তের উত্তাল নদী। এ নদী উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার আঘাতে আঘাতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

সমগ্র দেশের জন্যে পাঞ্জাব তার রক্তকে উৎসর্গ করল। কেউ কখনও এই বিস্তীর্ণ আকাশের নীচে আজ পর্যন্ত এমন ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এবং ভিন্ন ভিন্ন মেজাজ একই রক্তে রাঙিয়ে উঠতে দেখেনি। এতে ছিল শহীদের রক্তের পাকা রঙ। এতে ছিল ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্য—স্বাধীনতার সৌন্দর্য……।

সিদ্দিক কাটরা ফতেহ খাঁতে থাকত। ওমপ্রকাশের বাড়িও কাটরা ফতেহ খাঁতে। সে অমৃতসরের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর ছেলে। সিদ্দিক আর ওমপ্রকাশ পরস্পরকে ছেলেবেলা থেকেই জানত-শুনত। কিন্তু তাদের দু'জনের মধ্যে কোন বন্ধুত্ব ছিল না, কারণ সিদ্দিকের বাবা গরীব এবং চামড়ার ব্যবসা করত। আর ওমপ্রকাশের বাবা ছিল ব্যাঙ্কার এবং ধনী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে জানত। তারা ছিল প্রতিবেশী। আর তারা দু'জনেই জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজির হয়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেতাদের চিন্তা এবং ভাবনাকে তাদের হৃদয়ে ঠাঁই দিচ্ছিল। ঠাঁই দিতে দিতে তারা একেকবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি মিষ্টি হাসছিল—যেন ছেলেবেলা থেকেই তাদের কত বন্ধুত্ব—কত পরিচিতি। তাদের অন্তরের কথা তাদের চোখের ভাষায় ভাস্বরিত হয়ে উঠেছিল—স্বাধীনতা স্বাধীনতা স্বাধীনতা!

যখন গুলি চলল, গুলি প্রথম এসে লাগল ওমপ্রকাশের কাঁধে। ওমপ্রকাশ মাটিতে পড়ে গেল। ওমপ্রকাশ পড়ে যেতেই সিদ্দিক ঝুঁকে তাকে দেখতে লাগল। সেই সময় একটা গুলি এসে সিদ্দিকের উরু এফোঁড় ওফোঁড় করে দিল। তারপর সমানে বর্ষার ধারার মতো গুলি ছুটে আসতে লাগল। গুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রক্তের ধারা বয়ে চলল। শিখদের রক্ত মুসলমান এবং হিন্দুদের রক্ত মুসলমানদের সঙ্গে একাকার হয়ে চলল। যেন একটিই গুলি একই শক্তি একই চোখ এবং সবার হৃৎপিণ্ড ভেদ করে ছুটে চলেছে।

সিদ্দিক ওমপ্রকাশের ওপর আরও একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। যেন সে তার সমস্ত দেহটা দিয়ে ওমপ্রকাশের ওপর ঢাল বানিয়ে রেখেছিল। তারা দুজনে—সে আর ওমপ্রকাশ—গুলির বর্ষণের মধ্যেই হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে একটা প্রাচীরের কাছে এল। প্রাচীরটা তেমন কোন উঁচু নয় যে লাফিয়ে পার হওয়া যায় না। কিন্তু লাফিয়ে পার হওয়ার সময় সিপাইয়ের গুলির নিশানার মধ্যে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিল। সিদ্দিক নিজের দেহটাকে প্রাচীরের সঙ্গে ঠেকিয়ে জন্তুর মতো চার হাত-পায়ের পাঞ্জা মাটিতে রেখে বলল, "প্রকাশ, খোদার নাম নিয়ে প্রাচীরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পার হও।"

গুলির বিরাম নেই।

প্রকাশ অনেক কষ্টে সিদ্দিকের পিঠের ওপর দাঁড়াল এবং লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

শনশন করে একটা গুলি ছুটে এল।

সিদ্দিক নীচ থেকে বলল, "জলদি কর"।

সিদ্দিকের বলার আগেই প্রকাশ প্রাচীরের ওপারে লাফিয়ে পড়ল। জানোয়ারের মতো চার হাত-পায়ের ওপর ভর করেই সিদ্দিক চারদিক এক নজর দেখে নিল। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এক লাফে প্রাচীরের ওপারে গিয়ে পড়ল। কিন্তু ওপারে পড়তে না পড়তেই আর একটা গুলি শনশন করে ছুটে এসে তার আর একটা পায়ে বিঁধল। সিদ্দিক প্রকাশের ওপর ছিটকে গিয়ে পড়ল। নিজেকে এক ঝটকায় সরিয়ে নিয়ে সিদ্দিক প্রকাশকে ওঠাতে গেল।

"প্রকাশ, তোমার খুব লাগেনি তো?"

সিদ্দিক দেখল, প্রকাশের দেহে কোন প্রাণ নেই। কিন্তু তার আঙুলের হীরের আংটি তখনও জ্বলজ্বল করছে। তার পকেটে দু'হাজার টাকার নোট। তার উষ্ণ রক্ত মাটির পিপাসাকে নিবৃত্ত করছে। জীবনের গতি উচ্ছাস আবেগ আর সব কিছুই তার মধ্যে আছে—শুধু —সে নিজেই আর নেই।

প্রকাশকে উঠিয়ে সিদ্দিক বাড়িতে নিয়ে গেল। তার দুই উরু প্রচণ্ড ব্যথায় টনটন করছিল। হাড় থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে রক্ত ঝরছিল। আর হীরের আংটি যেন অনেক কথাই বলছিল। সবাই তাকে বুঝিয়েছিল। তাদের দু'জনের আচার-বিচার ধর্ম এক নয়। প্রকাশের সমাজ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কিন্তু সিদ্দিক কারও কোন কথায় কান দিল না। সে তার বহমান রক্তধারা এবং প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে যে ছটফটানি তার ফরিয়াদও শোনেনি। সে তার নিজের পথেই পা বাড়িয়েছিল।

এ রাস্তা ছিল সম্পূর্ণভাবে নতুন। যদিও কাটরা ফতেহ খাঁ-ই ছিল তার গন্তব্যস্থল। আজ যেন দেবদূত তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। এক কাফেরকে আজ সে কাঁধে বয়ে নিয়ে চলেছিল। আর তার রক্ত এমন ভরপুর এবং সজীবতায় উজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল যে কাটরা ফতেহ খাঁতে পৌঁছে সে সবাইকে ডেকে বলতে লাগল, "এই

নাও হীরের আংটি, দু'হাজার টাকা আর শহীদের মৃতদেহ।"

কথা ক'টি কোন রকমে উচ্চারণ করে সিদ্দিক সেখানেই পড়ে গেল। আর সারা শহরের মানুষ দু'জনের জানাজা এমন সমারোহের সঙ্গে করল, যেন তারা দু'জন আপন ভাই।

কার্ফু তখনও শুরু হয়নি। কুচা রামদাসের দু'জন মুসলমান, একজন শিখ আর একজন হিন্দু মহিলা তরি-তরকারি কেনার জন্যে বাজারে আসে। গুরুদ্বারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তারা সবাই মাথা হেঁট করে শ্রদ্ধা জানাল। তাদের খুব তাড়াতাড়ি ফেরার কথা। কার্ফু শুরু হওয়ার আর দেরি নেই। কিন্তু বাতাসে শহীদের রক্তের ডাক গুনগুন করে ঝংকার তুলছিল। বাজার করতে করতে এবং কথা বলতে বলতে তাদের দেরি হয়ে গিয়েছিল. বাজার করে তারা যখন ফিরছিল, তখন কার্ফু শুরু হওয়ার আর কয়েক মিনিট বাকী।

বেগম বলল, "চল, এই গলি দিয়ে বেরিয়ে যাই, কয়েক মিনিটে পৌঁছে যাব।"

"কিন্তু এদিকে তো গোরা সৈন্যের পাহারা বসেছে।" পারো বেগমকে বলল।

শ্যাম কাউর বলল, "গোরাদের কোন ভরসা নেই।"

জৈনব বলল, "মেয়েদের ওরা কিছু বলবে না। ঘোমটা টেনে পার হয়ে যাব। তাড়াতাড়ি চল।"

তারা চারজনই সেই গলি ধরে এগিয়ে চলল।

সৈন্যরা বলল, "এই ঝাণ্ডা—ইউনিয়ন জ্যাককে সেলাম কর।"

চারজনেই ঘাবড়িয়ে গেল এবং কিছু বুঝতে না পেরে ইউনিয়ন জ্যাককে অভিবাদন করল।

গলির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত দেখিয়ে সৈনিকটি বলল, "হাঁটু গেড়ে বসে ঐ মাথা থেকে কুর্নিশ করতে করতে পার হও।"

জৈনব বিস্মিত হয়ে বলল, "হাঁটু গেড়ে আমি বসতে পারব না।"

"সরকারের হুকুম, হাঁটু গেড়ে বসে মাথা হেঁট করে ঘসটাতে ঘসটাতে পার হতে হবে।"

শ্যাম কাউর ঝংকার দিয়ে উঠল, "আমি হেঁটে পার হব, দেখি কে

রোখে ?”

শ্যাম কাউর টানটান হয়ে এগিয়ে চলল।

পারো শ্যাম কাউরকে ডেকে বলল, “আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও।”

গোরা সৈনিকটি বলল, “দাঁড়াও বলছি, না হলে গুলি করবো।”

কিন্তু শ্যাম কাউর টানটান হয়ে হেঁটে চলল।

ঠাস্।

শ্যাম কাউর মাটিতে পড়ে গেল।

জৈনব আর বেগম একমুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তারা দু'জনেই হাঁটু ভেঙে চলতে লাগল।

গোরা সৈন্যটি আনন্দে গদগদ। সে ভাবল, সরকারের হুকুম কে অবজ্ঞা করবে।

জৈনব আর বেগম হাঁটু ভেঙে দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরল। কিছুক্ষণের জন্যে নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেল। তারপর তারা দু'জনে সোজা উঠে দাঁড়াল এবং হেঁটে চলল।

গোরা সৈন্যটি কেমন একটু ঘাবড়িয়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। সে তার রাইফেল তাদের দিকে তাক করে ধরল।

ঠাস্, ঠাস্।

পারো কান্নায় ভেঙে পড়ল। আমাকেও মরতে হবে। কী বিপদেই না পড়লাম। আমার স্বামী আমার সন্তান আমার মা-বাবা—তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। মৃত্যু আমি চাই না, কিন্তু মরতে আমাকে হবেই। আমার বোনদের ছেড়ে আমি একা কীভাবে যাই! পারো কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে চলল।

গোরা সৈনিকটি নরম সুরে তাকে বলল, “কান্নার কী আছে! সরকারের হুকুম মেনে হাঁটু গেড়ে এই গলি পার হয়ে যাও। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।”

গোরা সৈনিকটি নিজেই হাঁটু ভেঙে কীভাবে চলতে হয় দেখিয়ে দিল।

পারো কাঁদতে কাঁদতে গোরা সৈনিকটির একেবারে কাছে এল। সৈনিকটি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পারো তার মুখের ওপর একগাদা

থুথু ছিটিয়ে দিয়ে উল্টো মুখ হয়ে গলি পার হতে লাগল।

বুক টানটান করে পারো গলির মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল। গোরা সৈনিকটি হতবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। মুহূর্ত-খানেকের মধ্যে হুঁশ ফিরে আসতেই পারোকে লক্ষ করে সে তার বন্দুক তাক করল। পারো ছিল তার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল—সবচেয়ে ভীতু। কিন্তু আজ সে সবার সামনে এগিয়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করল।

পারো, জৈনব, বেগম, শ্যাম কাউর……

অন্তঃপুরের নারীরা……পর্দানশীন নারীরা, তাদের বুকে স্বামীর সোহাগ আর তাদের সন্তানদের জন্যে মমতা-ভরা স্তন নিয়ে অত্যাচারের যে অন্ধকার গলি তা পার হয়েছিল—তাদের দেহ গুলিতে গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাদের পা এতটুকু টলেনি। হয়তো সেই মুহূর্তে কারও ভালোবাসা তাদের আহ্বান করেছিল, হয়তো কোন কচি কচি হাত তাদের ডাকছিল, হয়তো কারও ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। কিন্তু তাদের রক্ত ডেকে বলেছিল, "না, মাথা হেঁট কর না। আজ শত সহস্র বৎসর পরে এই ক্ষণটি এসে সারা ভারতবর্ষকে জাগিয়ে তুলেছে—মেরুদণ্ড টানটান করে এই গলি পার হচ্ছে, মাথা উঁচু করে সামনে এগিয়ে চলেছে।" জৈনব বেগম পারো শ্যাম কাউর, তোমাদের কে বলেছে এ দেশে সীতা নেই? কে বলেছে এ দেশে সীতা সতী সাবিত্রীর জন্ম হয় না? আজ কাদের পবিত্র রক্তে এই গলির প্রতিটি প্রান্তর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে? শ্যাম কাউর জৈনব পারো বেগম—তোমরাই শুধু মাথা উঁচু করে এ গলি পার হওনি, তোমাদের দেশও আজ মাথা উঁচু করে এ গলি পার হচ্ছে। স্বাধীনতার উড্ডীন পতাকাও আজ এ গলি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আজকে তোমাদের দেশ তোমাদের সভ্যতা তোমাদের ধর্মের সর্বস্বীকৃত ঐতিহ্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বের শির আজ গর্বে উন্নত হয়ে উঠেছে। তোমাদের রক্তের প্রতি রইল আমাদের হাজারো সেলাম।

স্বাধীনতার পরে

পনেরোই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান স্বাধীনতা কায়েম করল। উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট সারা হিন্দুস্তান জুড়ে স্বাধীনতার উৎসব পালন হচ্ছে। আর স্বাধীন পাকিস্তান আনন্দে স্লোগান দিয়ে চলেছে।

পনেরোই আগস্ট, উনিশ শ' সাতচল্লিশ লাহোর দাউ দাউ করে জ্বলছে। আর অমৃতসরে হিন্দু মুসলমান এবং শিখ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতায় ডুবে গিয়েছে। ডুবে গিয়েছে তার কারণ, কেউ-ই পাঞ্জাবের জনসাধারণের কাছে জিজ্ঞেস করেনি, বছরের পর বছর ধরে তোমরা যেভাবে একসঙ্গে আছ সেভাবে থাকবে, না পৃথক পৃথক ভাবে থাকবে। যুগ যুগ ধরে পাঞ্জাবে স্বেচ্ছাচারিতা চলে আসছে, আর সেই স্বেচ্ছা-চারীরা কেউ-ই একবারের জন্যে তাদের মতামত চায়নি। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরাও এসে পাঞ্জাবে তাদের সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন করেছে। তারাও ভিত স্থাপন করতে গিয়ে ফৌজে পাঞ্জাব থেকে সিপাই আর ঘোড়া নিয়েছে। আর এর পরিবর্তে তারা পাঞ্জাবকে উপহার দিয়েছে শুধু খাল আর পেন্সন। পাঞ্জাবকে তারা থোড়াই জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। এর পরে এসেছে রাজনৈতিক জাগরণ এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে গণতান্ত্রিক চেতনা। এই চেতনার সঙ্গে সঙ্গে নেতারা ময়দানে উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু ফয়সালা করার সময়ে তাঁরাও পাঞ্জাবের জনসাধারণকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেননি। একটা মানচিত্র সামনে রেখে এক কলমের আঁচড়ে তারা পাঞ্জাবকে দু'টুকরো করে দিয়েছেন। যে রাজনীতিবিদরা পাঞ্জাবের এই ফয়সালা করলেন তাঁরা হচ্ছেন গুজরাটী আর কাশ্মিরী। তাই পাঞ্জাবের মানচিত্র সামনে ফেলে তার ওপর কলম দিয়ে দাগ কেটে একটা সীমারেখা টানা বিশেষ কোন মুশকিলের ব্যাপার ছিল না।

মানচিত্র একটা নগণ্য জিনিস। আট আট আনায় বা এক টাকায় পাঞ্জাবের মানচিত্র কিনতে পাওয়া যায়। আর সেই মানচিত্রের ওপর কালি দিয়ে একটা দাগ টেনে দেওয়া এমন কী কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এক টুকরো কাগজ আর একটা কলম। একটা কলম—যে কলম পাঞ্জাবের

হৃদয়কে দু'টুকরো করেছে সে কীভাবে পাঞ্জাবের দুঃখ অনুভব করবে। তিন তিনটি ধর্মের মানুষ আছে পাঞ্জাবে। কিন্তু তাদের হৃদয় অভিন্ন। তাদের পোশাক তাদের ভাষাও অভিন্ন। তাদের গান তাদের খেত-খামার এক। তাদের খেতের রোমান্টিক পরিবেশ, কৃষকদের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থাও এক। এক অভিন্ন সভ্যতা, এক অভিন্ন দেশ, এক অভিন্ন জাতীয়তার স্বাক্ষর পাঞ্জাব মনে করিয়ে দেয়। তবে কি উদ্দেশ্যে তার গলায় ছুরি চালানো হল? কিসের জন্যে তার খামার শয়তানি অত্যাচার আর পাশবিক বর্বরতার আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দেওয়া হল?

"আমরা জানতাম না……আমরা দুঃখিত……আমরা এই পাশবিকতার নিন্দা করছি।" এই অত্যাচার এই হাঙ্গামা এই অমানুষিক বর্বরতার যারা হোতা—যারা পাঞ্জাবের ঐক্যকে ধ্বংস করতে চেয়েছে আজ তাদেরই চোখে কুম্ভীরাশ্রু। পাঞ্জাবের সন্তানরা আজ দিল্লীর অলি-গলিতে, করাচীর হাটে-বাজারে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। তার মেয়েদের সতীত্ব লুণ্ঠন করা হয়েছে। তার খেত উজাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের সরকার বলছে, শরণার্থীদের জন্যে তারা বিশ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই বিশ কোটি টাকা এক কোটি শরণার্থীর মাথাপিছু পড়ছে বিশ টাকা। আমাদের চোদ্দ পুরুষের জন্যে তোমরা অনেক কিছু করেছ। তবে, আমরা তো মাসে বিশ টাকার লস্যি খাই। কয়েকদিন আগেও হিন্দুস্থানের সমস্ত কৃষকের মধ্যে যারা ভালোভাবে থাকত, আজ তাদেরই তোমরা খয়রাতি দিচ্ছ।

তোমরা যারা গণতন্ত্রের ধারক এবং বাহক, তোমরা কি একবারের জন্যেও পাঞ্জাবের কৃষক ছাত্র খেতমজুর দোকানদার—তাদের মা স্ত্রী আর কন্যাকে জিজ্ঞেস করেছ: এই নকশায় যে কালির আঁচড় টানছি সে সম্পর্কে তোমার মতামত কী? এ নিয়ে তাদের ভাবনার কী আছে! পাঞ্জাব যদি তাদের নিজের দেশ হত, তাদের দুঃখ এবং গান হত, তবে তারা অনুভব করত এ ভুলের পরিণাম কী। এ দুঃখ-কষ্ট কে সহ্য করবে!

এ দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব, যে হীর-রঞ্ঝার বিচ্ছেদ দেখেছে, যে সোনী আর মহিবালকে বিরহে ছটফট করতে দেখেছ, যে

পাঞ্জাবের খেতে আপন হাতে গমের সবুজ সবুজ দানা ফলিয়েছে আর কাপাসের ফুলে ছোট্ট চাঁদকে ঝিলিক দিতে দেখেছে। এসব রাজ-নীতিবিদরা কীভাবে এই দুঃখকে বুঝবে। ওরা যে গণতন্ত্রকামী রাজনীতিজ্ঞ।

এই ক্রন্দন—এই মৃত্যু তো শাশ্বত। মানুষ হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়ানো এখনও অনেক দিন বাকী আছে। আর গল্পকারের গল্প ফাঁদার মধ্যে এমন কোন কারুকার্য নেই যে, তাকে জীবন জ্ঞান শিল্প বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন —এসব নিয়ে ভাবতে হবে। পাঞ্জাবের মৃত্যু হল, কি সে বেঁচে থাকল তাতে তার কা আসে যায়। মেয়েদের ইজ্জত গেল, কি থাকল; শিশুদের গলায় ছুরি চালানো হচ্ছে, না মমতা-মাখানো ঠোঁট তাকে চুম্বনে চুম্বনে ভরিয়ে দিচ্ছে—এসব তার কাছে প্রয়োজনহীন ছাড়া আর কিছু নয়। এ সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে সে তার গল্প বলার জন্যে উৎসুক। এমন সব ছোট-মোট গল্প সে বলতে চায়, যে গল্প মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে—উৎফুল্ল করে! এত বড় বড় গাল গল্প তার শোভা পায় না।

হাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এখন তাই অমৃতসরের স্বাধীনতার কাহিনী শুনুন। অমৃতসরের কাহিনী—যেখানে জালিয়ানওয়ালাবাগ আছে। যেখানে উত্তর ভারতের সবচেয়ে বড় বাজার আছে—শিখদের সবচেয়ে পবিত্র গুরুদ্বার আছে। যেখানে জাতীয় আন্দোলনে হিন্দু এবং শিখরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একের পর এক বিরাট সংগ্রাম করেছে। আর তাই বোধহয় বলা হয়, লাহোর হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দুর্গ, অমৃতসর জাতীয়তার কেন্দ্রস্থল। সেই জাতীয়তার কেন্দ্রস্থল অমৃতসরের কাহিনী শুনুন।

উনিশ শ' সাতচল্লিশের পনেরোই আগস্ট, অমৃতসর স্বাধীন হয়। প্রতিবেশী লাহোর তখন জ্বলছে। কিন্তু অমৃতসর স্বাধীন। অমৃতসরের প্রতিটি বাড়িতে দোকানে বাজারে তে-রঙা পতাকা পতপত করে উড়ছে। অমৃতসরের জাতীয় মুসলমানরা স্বাধীনতার এ উৎসবে সামনের সারিতে ছিল। কারণ স্বাধীনতার আন্দোলনেও তারা ছিল সামনের সারিতে। এ অমৃতসর শুধু আকালী আন্দোলনের অমৃতসর নয়। কিংবা

ডাক্তার সত্যপালের অমৃতসরও নয়। এ অমৃতসর কিচলু আর এহসাম-উদ্দীনের অমৃতসর। আজকে সেই অমৃতসর স্বাধীন। আর তার জাতীয়তার সুগভীর পরিবেশে স্বাধীন ভারতবর্ষের স্লোগান গুঞ্জরিত হচ্ছে। অমৃতসরের হিন্দু মুসলমান শিখ সবাই আজ মুখরিত। জালিয়ানওয়ালাবাগের শহীদরা আজ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় স্টেশনে যখন আলো জ্বলে উঠল, ঠিক তখন স্বাধীন হিন্দুস্থান আর স্বাধীন পাকিস্তান থেকে দুটি স্পেশাল ট্রেন এল। পাকিস্তান থেকে যে ট্রেন এসেছিল তাতে ছিল হিন্দু আর শিখ। আর হিন্দুস্থানথেকে যে ট্রেন পাকিস্তানে যাচ্ছিল তাতে ছিল মুসলমানরা। দুটো ট্রেনেই দু-তিন হাজার করে লোক ছিল। মোট ছ'-সাত হাজার লোকের মধ্যে মাত্র দু হাজারই তখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। বাদবাকী সবাই মৃত। তাদের ধড় থেকে মাথা আলাদা। মাথাগুলো গাড়ির জানলায় সার করে ভালায় গেঁথে রেখে দিয়েছে।

পাকিস্তান স্পেশালে বড় বড় হরফে লেখা : "কীভাবে হত্যা করতে হয় তা পাকিস্তানের কাছ থেকে শেখ।" আর হিন্দুস্থান স্পেশালে হিন্দীতে লেখা : "প্রতিশোধ নেওয়া হিন্দুস্থানের কাছ থেকে শেখ।"

পাকিস্তান স্পেশালের দশা দেখে হিন্দু আর শিখরা উন্মাদের মতো হয়ে উঠল। "দেখ জালিমরা আমাদের ভাইদের সঙ্গে কী বেইমানী করেছে। হায়, ওরা হিন্দু আর শিখ শরণার্থী।"

হিন্দু আর শিখ শরণার্থীদের অবস্থা দেখে তারা ছটফট করতে লাগল। তারা শরণার্থীদের তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামিয়ে নিয়ে রিফিউজি ক্যাম্পে পৌঁছে দিল। পৌঁছে দিয়ে হিন্দু আর শিখরা গাড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আহত আর অর্ধমৃত এই শরণার্থীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে যদি আক্রমণ বলে অভিহিত করতে চান তবে তা আক্রমণ। এই আক্রমণে অর্ধেক মানুষের মৃত্যুর পর মিলিটারি আসে এবং অবস্থা আয়ত্তে আনে। গাড়িতে এক বৃদ্ধা বসেছিল। বৃদ্ধার কোলে ছিল তার শিশু নাতি। পথে তার ছেলের মৃত্যু হয়েছিল। ছেলের বউকে জাঠরা অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে। আর তার স্বামীকে ভালা দিয়ে দু'টুকরো করেছে। বৃদ্ধা নিশ্চুপ-নিথর হয়ে বসেছিল। তার ঠোঁটেও ব্যথার কোন কম্পন ছিল না। চোখের জলও শুকিয়ে

গিয়েছিল। হৃদয়েও কোন কাতর প্রার্থনা নেই। তার যে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। এক নির্বাক পাথরের মূর্তির মতো সে বসেছিল। যেন সে বধির—অন্ধ। যেন সে অনুভূতি-হীন এক জরদগব।

কোলের শিশুটি তার দাদিকে বলল, "দাদি, জল।"

দাদি নির্বাক।

শিশুটি আবার বলল, "দাদি আম্মা, জল দাও।"

দাদি আম্মা শিশুটিকে বলল, "এখানে জল কোথায় পাবি, পাকিস্তান আসুক, জল দেব।"

শিশুটি তার দাদিকে জিজ্ঞেস করল, "দাদি, হিন্দুস্থানে কি জল নেই ?"

"না বাছা, আমাদের দেশে এখন জল নেই।"

শিশুটি তার দাদিকে আবার জিজ্ঞেস করল, "হিন্দুস্থানে কেন জল নেই দাদি ? আমার যে খুব তেষ্টা পেয়েছে। আমি জল খাব। দাদি, জল। জল খাব।"

এক আকালী ভলান্টিয়ার সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। শিশুটির কথা শুনে সে রক্তবর্ণ দৃষ্টিতে শিশুটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিরে, জল খাবি ?"

শিশুটি মাথা কাত করে বলল, "হাঁ।"

দাদি আম্মা ভয়ে আকালী ভলান্টিয়ারকে বলল, "না, না, ও আপনাকে কিছু বলেনি –ও কিছু চাইছে না। সর্দারজী, খোদার কাছে আর্জি করছি, ওকে ছেড়ে দিন। ও ছাড়া আমার আর কিছু নেই।"

আকালী ভলান্টিয়ার হেসে উঠল। সে পাদানি থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তার করতলে তুলে শিশুটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "তেষ্টা পেয়েছে, না ? খা। খুব সুন্দর রক্ত—মুসলমানের রক্ত।"

দাদি আম্মা এক ঝটকায় পেছনে সরে গেল। শিশুটি কাঁদতে লাগল। বাচ্চাটিকে তার পেছনে আড়াল করে দাদি আম্মা তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে দিল। আকালী ভলান্টিয়ার হাসতে হাসতে চলে গেল। দাদি আম্মা ভাবতে লাগল—গাড়ি কখন ছাড়বে। আল্লা, পাকিস্তানে কখন পৌঁছব।

একজন হিন্দু জলের গ্লাস নিয়ে এল। "নাও, একে জল খাইয়ে দাও।"

শিশুটি জলের গ্লাস নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। তার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছিল। চোখ দু'টি যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। তার দেহের প্রতিটি রোমকূপ তৃষ্ণায় ছটফট করছিল।

হিন্দুটি তার প্রসারিত হাতটি একটু টেনে নিল। টেনে নিয়ে বলল, "এ জলের দাম আছে। মুসলমানের বাচ্চাকে মাগনা জল দেওয়া হয় না। এই এক গ্লাস জলের দাম পঞ্চাশ টাকা।"

দাদি আম্মা নম্রতার সঙ্গে বলল, "পঞ্চাশ টাকা! বাবা, আমার কাছে এক কানা কড়িও নেই। পঞ্চাশ টাকা আমি কোত্থেকে দেব!"

"জল······জল······আমাকে জল দাও।······এক গ্লাস জল দাও······দাদি আম্মা, দেখ আমাকে জল দিচ্ছে না।"

ট্রেনের অন্য একজন যাত্রী বলল, "দাও,······আমাকে দাও। এই নাও পঞ্চাশ টাকা।"

হিন্দুটি হাসতে লাগল, "পঞ্চাশ টাকা দাম তো বাচ্চার জন্যে। তোমাকে দিতে হবে একশ' টাকা। একশ' টাকা দাও আর এই জল নাও।'

"বেশ তাই হবে। এই নাও একশ' টাকা।"

যাত্রীটি তাকে একশ' টাকা দিয়ে এক গ্লাস জল নিল। নিয়ে ঢক-ঢক করে খেতে লাগল।

তাকে জল খেতে দেখে শিশুটি গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল। "জল, জল, দাদি আম্মা জল দাও।"

মুসলমান যাত্রীটি ঢকঢক করে জল খেয়ে গ্লাসটি খালি করে চোখ বন্ধ করল। গ্লাসটি তার হাত থেকে ছিটকে ট্রেনের মেঝেতে পড়ে গেল। যে দু-এক ফোঁটা জল গ্লাসে অবশিষ্ট ছিল তা মেঝেতে পড়ল।

শিশুটি কোল থেকে ঝাঁপিয়ে সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। প্রথমে সে খালি গ্লাসটা চাটল। তারপর মেঝের ওপর যে দু-এক ফোঁটা জল পড়েছিল তা সে জিভ দিয়ে চাটতে লাগল। তারপর সে চীৎকার করে কাঁদতে লাগল, "দাদি আম্মা জল, জল দাও।"

সেখানে জল ছিল, আবার নেই-ও। হিন্দু শরণার্থীরা জল খাচ্ছিল।

আর মুসলমান শরণার্থীদের প্রাণ তেষ্টায় কাতর। প্লাটফরমের ওপর সার সার কলসি ভর্তি জল। নল খোলা। মেথররা শৌচ কাজের জন্যে হিন্দু শরণার্থীদের জল দিচ্ছিল। কিন্তু মুসলমান শরণার্থীদের জন্যে কোন জল নেই। কারণ পাঞ্জাবের মানচিত্রের ওপর কালো মৃত্যুর একটা দাগ টানা হয়েছে। তাই গতকালের যে ভাই আজ সে দুশমন। গতকাল যাকে বোন বলে সম্বোধন করেছি, আজ সে আমাদের কাছে বেশ্যারও অধম। গতকালও যে মা ছিল আজ সে ডাইনী হয়ে গিয়েছে। আর তার সন্তান সেই ডাইনীর গলায় ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে।

জল হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান দু'জায়গাতেই ছিল। কিন্তু আজ জল কোথাও নেই। কারণ চোখের জল যে শুকিয়ে গিয়েছে। আর এই দু'টি দেশই আজ ঘৃণার মরুভূমি হয়ে গিয়েছে—ঝড়-ঝঞ্ঝায় কাফিলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

জল ছিল। কিন্তু সে জল আজ মৃগ মরীচিকার মতো। যে দেশে লস্যি আর দুধ জলের মতো প্রবাহিত হয়, আজ সেখানে জলের অভাব। আর তার সন্তান এক ফোঁটা জলের জন্যে কাতরাচ্ছে। কারণ সেখানে জল আছে আবার নেই-ও। পাঞ্জাবে পাঁচ পাঁচটি নদী বয়ে চলেছে, কিন্তু হৃদয়ের যে নদী সে নদী শুকিয়ে গিয়েছে। তাই জল আছে আবার নেই-ও।

এরপর এল স্বাধীনতার রাত্রি। দীপাবলিও এত রোশনাইতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে না। কারণ দীপাবলিতে শুধু প্রদীপের আলো জ্বলে। কিন্তু আজকে বোমা ফাটছে—মেশিনগান চলছে। ব্রিটিশ রাজত্বে ভুলেও কোথাও একটা রিভলবার পাওয়া যেত না। কিন্তু স্বাধীনতার প্রথম রাত্রেই না জানি কোথা থেকে এত বোমা হ্যাণ্ডগ্রেনেড মেশিনগান ব্রেনগান স্টেনগানের গুলি ফুলঝুরির মতো ঝরতে লাগল। এসবই ব্রিটিশ আর আমেরিকান কোম্পানীর তৈরি। আর স্বাধীনতার প্রথম রাত্রেই তা হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের অন্তস্থলকে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিচ্ছে। লড়ে যাও বাহাদুররা, মর বাহাদুরের মতো। তোমাদের লড়াই-এর জন্য আমরা অস্ত্র তৈরি করব। শাবাস বাহাদুররা, দেখ, যেন আমাদের গোলা বারুদের কারখানার মুনাফায় টান না পড়ে। বেশ ভালো হয় এমন জোর লড়াই চললে। চীনারা

লড়াই করছে, হিন্দুস্থান পাকিস্তান কেন লড়াই করবে না। ওরাও এশিয়ার, তোমরাও এশিয়ার। দেখ, যেন এশিয়ার ইজ্জত নষ্ট না হয়। বাহাদুররা লড়াই চালিয়ে যাও। তোমরা লড়াই বন্ধ করে দিলে এশিয়ার চেহারা পালটে যাবে। আমাদের মুনাফা, আমাদের হিস্যা আমাদের নির্বিঘ্নের সাম্রাজ্য সংকটে পড়ে যাবে। বাহাদুররা জোর লড়ে যাও। আগে তোমরা আমাদের দেশ থেকে কাপড়, কাঁচের জিনিসপত্র, সেণ্ট ইত্যাদি আমদানি করতে, এখন আমরা তোমাদের বোম এরোপ্লেন কার্তুজ পাঠাব। কারণ এখন তোমরা স্বাধীন।

সশস্ত্র হিন্দু আর শিখদের যৌথ বাহিনী মুসলমানদের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগাচ্ছিল আর উল্লাসে জয়ধ্বনি দিচ্ছিল। আর মুসলমানরা ঘরে লুকিয়ে আক্রমণকারীদের ওপর মেসিনগান চালাচ্ছিল এবং হ্যাণ্ডগ্রেনেড ছুঁড়ছিল।

স্বাধীনতা আর স্বাধীনতার পর তিন-চারদিন ধরে এই রকমের মোকাবিলা চলল। আর শিখ এবং হিন্দুদের মদত দেওয়ার জন্যে আশ-পাশের সমস্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে আসতে লাগল। মুসলমানরা ঘর-বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করল। বাড়ি-ঘর মহল্লা বাজার দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের বাড়ি-ঘরই বেশী পুড়ল। আর হাজার হাজার মুসলমান দল বেঁধে শহর ছেড়ে পালাতে লাগল। এরপর যা কিছু ঘটেছে তাকে ইতিহাসে অমৃতসরের হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করা হবে।

কিন্তু অবস্থা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই মিলিটারি আয়ত্বে নিয়ে আসে। হত্যাকাণ্ড বন্ধ হল সত্য। তবে হিন্দু আর মুসলমানরা আলাদা আলাদা ক্যাম্পে নিজেদের বন্দী করে 'রিফিউজি' হল। হিন্দুরা নিজেদের 'শরণার্থী' আর মুসলমানরা নিজেদের 'পনাহগুঁজি' বলে অভিহিত করতে লাগল। তাদের উভয়ের ওপর একই দুরবস্থা নেমে এসেছিল। কিন্তু তাদের এই নাম তাদের অস্তিত্ব থেকে পৃথক করে দিয়েছিল—হাজার দুঃখ কষ্টেও যেন তারা আর এক জায়গায় মিলিত হতে না পারে। তাদের ক্যাম্পের ওপর কোন ছাদ ছিল না। কোন আলো বিছানা এবং শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু এক ক্যাম্পকে বলা হত 'হিন্দু আর শিখ শরণার্থীদের ক্যাম্প,' অন্যটিকে 'মুসলমান মহাজরিনদের ক্যাম্প।'

হিন্দু শরণার্থী ক্যাম্পে স্বাধীনতার প্রথম রাত্রেই এক অসুস্থ সন্তানের সামনে তার মা প্রচণ্ড জ্বরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময়েও সংগ্রাম করে চলেছিল। তারা পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে এসেছে। পনেরো জনকে নিয়ে ছিল এই সম্ভ্রান্ত পরিবার। পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে পৌঁছতে পৌঁছতে তারা মাত্র দু'জনই অবশিষ্ট থেকে গিয়েছে। আর এই দু'জনের একজন অসুস্থ—অন্যজন মৃত্যু পথযাত্রী।

পনেরো জনের এই কাফিলা যখন ঘর-বাড়ি ছেড়ে পথে বের হয়, তখন তাদের সঙ্গে বিছানা, বাসন-কোসন, কাপড় ভর্তি ট্রাঙ্ক, টাকা, গয়না আর বাচ্চার একটা সাইকেল ছিল। তারা ছিল মোট পনেরো জন।

গুজরাওয়ালা পর্যন্ত আসতেই কমতে কমতে দশজন হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে টাকা-পয়সা যায়। তারপর একে একে যায় গয়না এবং মেয়েদের ইজ্জত।

তারা যখন লাহোরে এসে পৌঁছল, তখন তাদের কাফিলায় আর মাত্র ছ'জন বেঁচে আছে। পথে কাপড়-চোপড়, ট্রাঙ্ক, বিছানাপত্র লুট হয়ে যায়। আর সাইকেল কেড়ে নিয়ে যাওয়াতে বাচ্চাটির মনে খুব দুঃখ হয়।

মোগলপুরা তারা যখন ছাড়ল, তখন মাত্র তারা দু'জনই বেঁচে। মা আর ছেলে। আর অবশিষ্ট ছিল মাত্র একটা কম্বল। যে কম্বলটি মা জ্বরের জন্য গায়ে জড়িয়ে আছে। এখন, এই রাত্রির দ্বিপ্রহরে স্বাধীনতার প্রথম রাত্রে, মহিলাটি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার অপেক্ষায় ছিল। আর তার সন্তান মায়ের শিয়রের কাছে নিশ্চুপ বসে জ্বরে আর শীতে থরথর কাঁপছিল। আর কখন নিজের অজান্তেই তার চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল।

মা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে, সে ধীরে ধীরে তার মার গা থেকে কম্বলটা টেনে নিল। এবং নিজের গায়ে জড়িয়ে ক্যাম্পের অন্য দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একজন স্বয়ংসেবক তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "ঐ...ঐ দিকে যে মরে পড়ে আছে সে তোমার মা?"

—"না, না, আমি কিছু জানি না, চিনি না ওকে!" ছেলেটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল। তারপর কম্বলটাকে আরও ভালোভাবে গায়ে

জড়িয়ে সে স্বয়ংসেবকটিকে বলল, "ও আমার মা নয়, এই কম্বল আমার। এটা আমার—কম্বল আমি কাউকে দেব না। এ কম্বল আমার।"

চীৎকার করে সে বলতে লাগল, "না, ও আমার মা নয়। এটা আমার কম্বল। কাউকে আমি এ কম্বল দেব না। আমি সঙ্গে করে এনেছি···এ কম্বল আমি দেব না, কিছুতেই দেব না।"···

একটি কম্বল, একজন মা, একটি মৃত মনুষ্যত্ব। কে কোন্ দিন ভাবতে পেরেছিল, এমন এক কলঙ্কের গল্প আপনাদের কাছে আমাকে বলতে হবে।

মুসলমানরা যখন পালাতে লাগল, তখন লুটতরাজ শুরু হয়ে গেল। দু-একজন যাঁরা সৎ মানুষ ছিলেন, তারাই শুধু লুটতরাজে যাননি।

স্বাধীনতার তৃতীয় দিন। আমি গলি ধরে বড় রাস্তার জলের কলে গরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছি। এক হাতে বালতি, অন্য হাতে গরুর দড়ি। গলির মোড়ের কাছে মিউনিসিপ্যালিটির ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে গরুকে বেঁধে জল আনার জন্যে কলের দিকে পা বাড়ালাম। জল ভরে ফিরে এসে দেখি গরু উধাও। চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও গরুটার হদিস পেলাম না। হঠাৎ সামনের একটা বাড়ির উঠোনে আমার চোখ গিয়ে পড়ল। দেখলাম উঠোনে আমার গরুটা বাঁধা রয়েছে। কোন দ্বিরুক্তি না করে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই এক সর্দারজী বেশ তিরিক্ষি মেজাজে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "এই যে ভাই সাহাব, এখানে কেন?"

বললাম, "সর্দারজী এ গরু আমার। এইমাত্র গরু বেঁধে আমি জল আনতে গিয়েছিলাম। আর···"

সর্দারজী মুচকি হেসে বলল, "আরে ভাই, তাতে কী হয়েছে, ভেবেছিলাম গরুটা কোন মুসলমানের। গরু আপনার হলে নিয়ে যান।"

বলতে বলতে সর্দারজী গরুর দড়ি খুলে আমার হাতে দিল।

গরু নিয়ে আমি যখন ফিরছি, সর্দারজী আবার আমার কাছে ক্ষমা চাইল, "মাফ করবেন, ভেবেছিলাম কোন মুসলমানের গরু বুঝি।"

ঘটনাটা বন্ধু সর্দার সুন্দর সিংকে বলতেই, তিনি সশব্দে হেসে উঠেছিলেন।

আমি তাঁকে বললাম, "আচ্ছা মজা তো, এতে হাসির কী আছে বলুন তো!" আমার কথা শুনে তিনি আরও জোরে হেসে উঠলেন।

সুন্দর সিং কমিউনিস্ট। তাই সাম্প্রদায়িকতা থেকে তিনি বহু ঊর্ধে। আমার বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা লুটতরাজে যাননি সুন্দর সিং তাঁদের মধ্যের একজন।

আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "ঘটনাটিকে কি আপনি সমর্থন করেন?"

তিনি বললেন, "না, না, সেজন্যে নয়। হাসছিলাম তার কারণ, আজকে সকালে এমনই একটা ঘটনা আমারও ঘটেছে। হাল বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হল সামনের কাটরাতে সর্দার সবেরা সিং থাকেন, একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই। পুরনো গদর পার্টির নেতা ছিলেন। নিজের গ্রামে তিনি তিন-চার শ' মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছেন। ভাবলাম, দেখি তাদের কী হাল। কোন রকমে মুহাজিরিন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা।

"ভাবতে ভাবতে মহম্মদ রজাকের জুতোর দোকানের (যে দোকানটা সম্প্রতি লুট হল) সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে কাটরাতে ঢুকলাম। বৃদ্ধ সর্দারজী বাড়িতে ছিলেন না বলে কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এলাম। ফিরে এসে দেখি গাড়ি সেখানে নেই। আরে! এইমাত্র তো এখানে দাঁড় করিয়ে গেলাম। জিজ্ঞাসাবাদ করেও গাড়ির কোন হদিস মিলল্না। ইতিমধ্যে হাল বাজারের শেষ প্রান্তে গিয়ে আমার চোখ পড়ল। দেখলাম, আমার গাড়ি সেখানে দাঁড় করানো। একটা জিপের পেছনে বাঁধা।

দৌড়তে দৌড়তে সেখানে হাজির হলাম। দেখলাম এক বিখ্যাত কংগ্রেসী কর্মকর্তা সর্দার—সিং জিপে বসে আছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় চললেন?"

তিনি বললেন, "নিজের গ্রামে যাচ্ছি।"

"এই মোটরটাও কি আপনার সঙ্গে গ্রামে যাচ্ছে?"

"কোন্ মোটরের কথা বলছেন? ও, যেটা জিপের পেছনে বাঁধা

রয়েছে ? এটা আপনার মোটর ? আরে দোস্ত, মাফ করে দিন, এটা আপনার মোটর তা চিনতে পারিনি। মহম্মদ রজাকের দোকানের সামনে দাঁড় করানো ছিল, ভাবলাম কোন মুসলমানের গাড়ি। তাই জিপের পেছনে বেঁধে নিয়েছি। হা হা কী কাণ্ড! বাড়িতেই নিয়ে যাচ্ছিলাম বুঝলেন। ভালই হয়েছে, আপনি ঠিক সময় এসে পড়েছেন।

দড়ির বাঁধনটা খুলে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখন ফের কোথায় যাচ্ছেন ?"

"এখন…? যাব কোথাও! কোন না কোন মাল ঠিকই জুটে যাবে।"

সর্দার—সিং ছিলেন কংগ্রেসী কর্মকর্তা। একদিন তিনি খেসারত দিয়েছেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে জীবনও উৎসর্গ করেছিলেন। ঘটনাটা আমাকে শুনিয়ে সুন্দর সিং বলছিলেন, "উঃ ব্যাধিটা এমন বিস্তার লাভ করেছে!—সং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকরাও এই সংক্রামক ব্যাধি থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারেননি। এমন কি আমাদের যে পার্টিগুলো আছে, তার কর্মীদেরও একটা অংশ এই লুটতরাজ হত্যা বা ভাঙচুরে সামিল হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে যদি এসব বন্ধ করা না যায় তবে দুটো পার্টিরই ফাসিস্ট পার্টিতে পরিণত হতে খুব বেশী দিন লাগবে না। দু'-চার বছরের মধ্যেই সেটা হয়ে যাবে।

সুন্দর সিংএর চেহারায় চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম। পথে খালসা কলেজ রোডে এক ধনী মুসলমানের বাড়ি লুট হচ্ছিল। আমার নাকের ডগা দিয়ে এক এক্কা গাড়ি ভর্তি লুটের মাল নিয়ে যেতে লাগলো এবং মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমার চোখের সামনে সর্বত্র লুটপাট শুরু হয়ে গেল। শিখ আর হিন্দু যারা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারাও লুট করার জন্যে বাড়িগুলোর দিকে ছুটল। কিন্তু পুলিসদের বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল।

পুলিশের কাছেও কিছু লুটের মাল আর একটা সিল্কের টাই ছিল। আর একটা কোটের হ্যাঙ্গারে মাফলার ঝুলছিল। লোকদের দিকে তাকিয়ে তারা হেসে বলল, "কোথায় যাচ্ছ ? কিছুই আর নেই, সব আগেই সাফ হয়ে গেছে।" একজন ভদ্রলোক, দেখে আর্যসমাজের লোক বলে মনে হল, তিনি বাড়িটার দিকে ছুটে গিয়েছিলেন। ফিরে

আসার সময় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেখেছেন মশায়, দুনিয়া কেমন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।"

এক দুধওয়ালা যাচ্ছিল। দেখলাম, বেচারার ভাগে গোটা কয়েক বই পড়েছে। বই কটা নিয়েই সে হাঁটা দিয়েছে।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বই নিয়ে কি করবে? পড়তে জান?"

"না, বাবু।"

"তবে যে বড় নিয়ে যাচ্ছ?"

বইগুলোর দিকে সে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। তাকিয়ে বলল, "কি করব বাবু, যেখানেই যাই, দেখি আগে-ভাগেই ভালো ভালো জিনিস সব সাফ হয়ে গেছে। আমারই বদনসীব বাবু।"

সে আবার বইগুলোর দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাল। তার ভাব দেখে মনে হচ্ছিল বইগুলো সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু তার সেই ভাব পালটে গেল। বলল, "মোটা মোটা বই আছে, উনুনে জ্বালানি করব। রাতের খাবার তৈরি করতে আর কাঠের দরকার হবে না।"

খুব ভালো ভালো বই ছিল। আরিস্টটল, সক্রেতিস, প্লেটো, রুশো সেক্সপিয়র—বিলকুল উনুনে গেল।

দিনের তৃতীয় প্রহরের দিকে হাট-বাজার নিস্তব্ধতায় হেয়ে যেতে লাগল। কার্ফু শুরু হবে। জলদি জলদি কুচা রামদাস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে গুরুদ্বার। গুরুদ্বারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মাথা হেঁট করলাম। সামনেই অন্ধকার গলি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা-কাণ্ডের সময় হাঁটু ভেঙে এই গলি পার হতে বাধ্য করা হয়েছিল। ভাবলাম আজকে বরং এই গলি দিয়েই হেঁটে যাই। এ পথ দিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে।

আমি গলির দিকে এগিয়ে চললাম।

গলিটি ছিল সরু। দিনের বেলাতেও প্রায় অন্ধকার। এই গলিতে আট দশ ঘর মুসলমান থাকত। মুসলমানদের সমস্ত বাড়িই লুট করা হয়েছে—জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। দরজাগুলো হাট করে খোলা, জানলাগুলো ভাঙা, কোন কোন বাড়ির ছাদ পুড়ে গেছে।

গলিতে কেমন একটা নিস্তব্ধতা। রাস্তায় মেয়েদের লাস পড়ে রয়েছে।

ফিরে যাওয়ার জন্যে সবে পা বাড়িয়েছি এমন সময় একটা গোঙানি শুনতে পেলাম। গলির মাঝখানে যে মৃতদেহগুলো পড়েছিল তার মধ্য থেকেই এক বৃদ্ধা ঘসটাতে ঘসটাতে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছিল। এগিয়ে গিয়ে আমি তাকে তুললাম।

"বাবা জল।"

অঞ্জলি ভরে আমি জল নিয়ে এলাম। গুরুদ্বারের সামনেই জলের কল ছিল।

"খোদা তোমাকে রহম করুক বাবা। তুমি কে ?—তুমি যেই হও না কেন খোদা তোমাকে রহম করুক। আমি এক মৃত্যু পথযাত্রী। বাবা, তুমি খোদার রহমতের কথা ভুলো না।"

আমি তাকে ওঠাতে ওঠাতে জিজ্ঞেস করলাম, "মা তোমার কোথায় আঘাত লেগেছে ?"

বৃদ্ধা বলল, "আমাকে উঠিও না। এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে দাও—আমার ছেলের বউ আমার মেয়েদের মাঝখানে। তুমি জিজ্ঞেস করছ, কোথায় আমার আঘাত লেগেছে ? আঘাত, এই আঘাত যে খুব গভীরের, বাছা। এই ক্ষত যে হৃদয়ের অন্তস্থলে। খুব গভীর ক্ষত। এই ক্ষতের গভীরতা তোমরা কীভাবে মাপবে। জানি না, খোদা কেমন করে এদের ক্ষমা করবে।"

"মা, আমাদের ক্ষমা করে দাও।"

বৃদ্ধা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। সে আপন মনে বলে চলল,—"প্রথমে ওরা আমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তারপর বাড়ি লুট করেছে। লুট করার পর টানতে টানতে আমাকে এই গলিতে নিয়ে আসে—এই পবিত্র গুরুদ্বারের সামনে। যে গুরুদ্বারকে আমরাও প্রতিদিন মাথা হেঁট করে শ্রদ্ধা জানাই। ওরা আমার ইজ্জত নিল, তারপর গুলি করল। বলো, আমি তো ওদের ঠাকুরমার বয়সী ! তবু ওরা আমাকে রেহাই দিল না।"

ধীরে ধীরে সে আমার জামার আস্তিন চেপে ধরল : "তুমি কী জান এই অমৃতসর আমার শহর। যেমন মসজিদকে সেলাম করি, তেমনি প্রতিদিন এই গুরুদ্বারকে সেলাম করি। আমরা এই গলিতে হিন্দু

মুসলমান শিখ সবাই একসঙ্গে ছিলাম। কত পুরুষ ধরে আমরা এখানে একসঙ্গে বসবাস করছি। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসতাম, আমাদের মধ্যে ছিল প্রীতির সম্পর্ক। এখানে কোনদিন কিছু হয়নি।"

"মা, আমাদের ধর্মের লোকদের তুমি ক্ষমা করে দাও।"

"তুই জানিস আমি কে? আমি জৈনবের মা। জৈনব কে জানিস? জালিয়ানওয়ালাবাগের দিনে গোরা সৈন্যের সামনে দিয়ে মাথা এতটুকু হেঁট না করে সে এই গলি বুক টান করে পার হয়েছিল। নিজের দেশ আর জাতির ইজ্জতের জন্যে সে মাথা উঁচু করে এ গলি দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। এ সেই স্থান যেখানে জৈনব শহীদ হয়েছিল।

"আমি সেই জৈনবের মা। এত সহজে আমি তোদের ছাড়ব না। আমাকে উঠে দাঁড়ানোর জন্যে সাহায্য কর। আমি আমার লাঞ্ছিত আবরু, আমার পুত্রবধূ আর কন্যাদের বেইজ্জতি নিয়ে লীডারদের কাছে হাজির হব। আমাকে তুই ধর। আমি তাদের বলব, আমি জৈনবের মা—আমি অমৃতসরের মা। আমি পাঞ্জাবের মা। তোমরা আমার কোল খালি করে দিয়েছ। এই বৃদ্ধ বয়সে আমার মুখে কালি ঢেলেছ। আমার যুবতী পুত্রবধূ আর কন্যাদের পবিত্র রক্তকে জাহান্নামের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছ। আমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করব, এই স্বাধীনতার জন্যেই কি জৈনব তার প্রাণ উৎসর্গ করেছিল? আমি—আমি জৈনবের মা।……"

বলতে বলতে সে আমার কোলের ওপর ঢলে পড়ল। তার মুখ দিয়ে রক্তের ধারা অবিরাম গড়িয়ে পড়ছিল। কিছুক্ষণ পরে মা শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

জৈনবের মা আমার কোলে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। আমার জামায় তার রক্ত। জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে আমি উঁকি দিতে লাগলাম। আমার মানসচোখে সিদ্দিক ওমপ্রকাশ আর জৈনবের গর্বিত মুখ ভেসে উঠল। শহীদরা বলল, আমরা আবার আসব। সিদ্দিক ওমপ্রকাশ… …আমরা আবার আসব,……শ্যাম কাউর জৈনব পারো বেগম…… আমরা আবার আসব—আসব আমাদের সতীত্বের দৃপ্ততা, আমাদের

নিষ্কলঙ্ক আত্মার মহানতা নিয়ে। আসব, কারণ আমরা মানুষ—এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির পতাকাবাহক। সৃষ্টিকে কেউ ধ্বংস করতে—তার ইজ্জতকে কেউ নষ্ট করতে পারে না। সৃষ্টিকে লুণ্ঠন করা সম্ভব নয়। কারণ আমরা হচ্ছি সৃষ্টি, আর তোমরা হচ্ছ ধ্বংস। তোমরা জানোয়ার, তোমরা নিষ্ঠুর। তোমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা মৃত্যুহীন। মানুষের মৃত্যু নেই—মানুষ অমর। মানুষ নিষ্ঠুর ক্রূর নয়। মানুষের আত্মা সুন্দর, আনন্দময়—অনিন্দ্য।

খাজা আহামদ আব্বাস

ভারতমাতার পাঁচ রূপ

খাজা আহামদ আব্বাসের জন্ম ১৪ জুন ১৯১৪, পানিপথে। শিক্ষা শুরু হয় হালি মুসলিম হাইস্কুলে। আলিগড় মুসলিম ইউনিভারসিটি থেকে তিনি স্নাতক হন। চিন্তা-ভাবনায় তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী। ১৯৩৭ সালে তিনি বোম্বে ক্রনিকলে সাব এডিটর হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। প্রথম গল্প 'আবাবিল' উর্দু সাময়িকপত্র 'জামায়া'-তে প্রকাশিত হয়। এরপর থেকে তিনি অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস লেখেন। 'এক লেড়কি', 'লাল আউর পীলা', 'লাভ ইন মুসৌরী' তাঁর গল্প সংকলনগুলির মধ্যে অন্যতম। 'ইন দ্য ইমেজ অব মাও' এবং ডাঃ কোটনিসের অমর জীবনের ওপর লেখা 'ফেরে নাই শুধু একজন'-দুটি অসাধারণ গ্রন্থ। এই দুটি গ্রন্থ বামপন্থী মহলে তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। আই. পি. টি. এ-এর সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

ভগবান নিজ হাতে মাটির এক পুতুল তৈরি করে তাতে প্রাণ দিলেন, আর ক্রমবিকাশের ঘূর্ণাবর্তে বানর থেকে মানুষে রূপান্তরিত হল। এই গল্প-কথা অনেক অনেক বছর ধরে চলে আসছে, এবং আজ পর্যন্ত এই গল্প-কথার কোন ফয়সালা হয়নি, কিন্তু মা-ই যে মানুষের জন্মদাত্রী একথা কেউই অস্বীকার করতে পারবে না। ন'মাস পর্যন্ত মা তার রক্তকে সিঞ্চিত করে—নিজের জীবনকে বিপন্ন করে আসন্ন শিশুর জীবন গড়ে তোলে। মা আর শিশুর এই মধুর আত্মীয়তা দৃঢ় এবং অবিচ্ছিন্ন।

আজও মানুষ যে জিনিসের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী বন্ধনে আবদ্ধ তা হচ্ছে তার মায়ের ভালোবাসার স্মৃতি। নিজের দেশকে 'মাতৃভূমি' 'মাদরে-বতন' বা 'মাদারল্যাণ্ড' বলা হয়। নিজের ইউনিভারসিটি বা কলেজকে 'আলমামাতের' (ulma-Mater) 'মাদরে তালিমি' বা 'জ্ঞান মা' বলা হয়। আর মাটি—যে মানুষকে মার মতো ভালোবেসে পরিচ্ছদ এবং আহার্য দেয় তাকে বলা হয় 'ধরিত্রী মাতা'।

আমরা ভারতবাসীরা তো হাজার হাজার বছর ধরে এই দেশের যে আত্মা তাকেই 'ভারতমাতা' নাম দিয়েছি।

ভারতমাতা কি জয়।

বন্দে মাতরম্!

এই দুটি জাতীয় স্লোগানের মধ্যে নিজের দেশকে মা বলে ডাকতে শিখেছি।

লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি মানুষ এই স্লোগান তুলেছে ঠিকই, কিন্তু কেউ কি ভেবে দেখেছে এই 'ভারতমাতা' কে?

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁর 'হিন্দুস্থান কী কহানী'-তে লিখেছেন যে তিনি একদল কৃষককে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাদের 'ভারতমাতা' কে? কোন একজন কৃষক তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, যে মাটিতে আমরা জন্ম নিই, যে মাটি আমাদের খাদ্য এবং কাপড় দিয়ে পালন করে, সেই মাটিই হচ্ছে আমাদের ভারতমাতা। পণ্ডিতজী কৃষকদের বলেছিলেন, হ্যাঁ, এটাই সত্য—আর ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষকেই 'ভারতমাতার সন্তান' বলা হয়।

এক দিক দিয়ে অবশ্যই এ কথা ঠিক যে সমস্ত ভারতবাসীর একাত্মীয়তার সাংকেতিক নামই হচ্ছে 'ভারতমাতা'। কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে যদি একে বিচার করে দেখানো হয় তবে তা পুরুষের রূপে দেখানো সম্ভব নয়। 'ভারতমাতা' একমাত্র নারীই হতে পারে। কিন্তু সে নারী কী ধরনের?

'ভারতমাতা' কি স্বর্গে বসবাসকারী কোন দেবী, যিনি ভগবানের মতো আমাদের দেশের ভালো-মন্দ দেখা-শোনার জন্যে নিযুক্তা? 'ভারতমাতা' কী দীর্ঘকেশী, গোলাপী কপোল-যুক্তা, সুন্দর-শাড়ি-পরিহিতা, সোনার অলঙ্কারে ভূষিতা হৃষ্টপুষ্ট কোন মহারানী—যে মহারানীকে প্রতিমায় অথবা নাটকে দেখা যায়?

না, 'ভারতমাতা' এই তেত্রিশ কোটি ভুখা-নাঙ্গা মানুষের মা। সে কোন দেবী অপ্সরা বা মহারানী হতে পারে না। ভারতবর্ষের কোটি কোটি গরিব মাতাদেরই সে একজন; কিংবা তারা প্রত্যেকেই একজন 'ভারতমাতা'। যে শকুন্তলার সন্তানের নাম অনুসারে এই দেশকে ভারত বলা হয়, সেই শকুন্তলা তো এমনই একজন মা ছিল।—গরিব, আশা-ভরসাহীনা, অসহায়া। তার পিতা ঋষি আর মা একজন নর্তকী। সে আশ্রমে পালিত হয়েছিল, স্বামী তাকে ভুলে গিয়েছিল আর সারা জীবন-ভর সে শুধু দুঃখই পেয়ে গেল। কিন্তু সে মা ছিল—সে ছিল এমন এক মা,

যে একাকী হওয়া সত্ত্বেও তার সন্তানকে প্রতিপালনের জন্যে দুনিয়ার সমস্ত রকম বাধা বিপত্তি দারিদ্র্য অনাহার বনবাসের সম্মুখীন হয়েছিল। তিনিই প্রথম 'ভারতমাতা'!

আর তারপর? আমাদের যুগে কি এমন মা নেই যে নিজেকে 'ভারতমাতা' বলে পরিচয় দিতে পারে?

আমি যখনই 'ভারতমাতা কি জয়' স্লোগান শুনি তখনই আমার সামনে ভেসে ওঠে যেসব মুখ সে মুখগুলি খুব সাধারণ সাদামাটা মায়েদের। তাদের মধ্যে কেউই নামী দামী নয়। তাদের ছবি তো দূরের কথা, তাদের কারো নামই আজ পর্যন্ত পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়নি। কিন্তু তবু (আমার মতে) তাদের প্রত্যেককেই 'ভারতমাতা' বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

খদ্দরের কফন

তিরিশ বছর আগেকার কথা, তখন আমি খুব ছোট, আমাদের পাড়ায় এক বৃদ্ধা তাঁতি থাকত। তার নাম ছিল হাকিমা, কিন্তু সবাই তাকে 'হক্কো' 'হক্কো' বলে ডাকত। তখন তার বয়স হয়েছিল প্রায় ষাট। তরুণী অবস্থাতেই সে বিধবা হয়েছিল, আর নিজ হাতে কাজকর্ম করে সে তার সন্তানকে প্রতিপালন করেছিল। বৃদ্ধা বয়সেও—কী গরম কী শীতে সে সূর্য ওঠার আগে উঠত। আমরা লেপের তলায় শুয়ে শুয়েই তার ঘর থেকে যাঁতা পেষার শব্দ শুনতাম। সারা দিন ধরে সে ঝাঁট দিত, চরকা কাটত, কাপড় বুনত, রান্না করত, ছেলে-মেয়ে এবং নাতি-পুতিদের কাপড় ধুত। তার বাড়িটা ছিল খুবই ছোট।

আমাদের এই বিরাট আঙিনা যুক্ত বাড়ির তুলনায় ওর বাড়ি ছিল একটা জুতোর বাক্সের মতো দেখতে। দুটি ঘর, এক অপ্রশস্ত বারান্দা আর দু-তিন গজ লম্বা চওড়া আঙিনা। কিন্তু এই বাড়িকেই সে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং লেপে-মুছে রাখত যে সারা পাড়াব মানুষ বলত, হক্কোর বাড়ির আঙিনায় খাবার রেখে খাওয়া যায়।

ভোর থেকে অর্ধেক রাত পর্যন্ত সে কাজ করে চলত। আর হক্কো

যখন আমাদের বাড়িতে আসত, তখন তার চোখে মুখে আমরা লাবণ্যের কী ছটাই না দেখতাম! খুব হাসিখুশি ছিল সে। গায়ের রঙ ছিল বেশ শ্যামলা আর সেই শ্যামবর্ণের ওপর বকের মতো ধবধবে সাদা চুল খুব সুন্দর লাগত। তার দেহের গঠন ছিল বেশ মজবুত, মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত তার কোমর আমরা ঝুঁকতে দেখিনি। হাঁ, শেষ বয়সে তার কয়েকটা দাঁত পড়ে গিয়েছিল, ফলে কথা বলার সময় বোঝা যেত সে ফোকলা। খুব মজার মজার কথা বলত। আমরা ছোটরা যখন তাকে ঘিরে ধরতাম তখন সে তিন শাহজাদা, সাত শাহজাদী, রাক্ষস এবং পরীদের গল্প শোনাত। সে পর্দানশীন ছিল না। নিজের কাজকারবার নিজেই চালাত। হক্কো লেখাপড়া জানত না। সে কোন দিন স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা শোনে নি ; শোনে নি গণরাজ বা সমাজ-বাদের কথা। না শুনেও হক্কো কোন দিন পুরুষের কাছে নত হয়নি, বা বড়লোক, অফিসার এবং দারোগা দেখে ভয়ও পেতোনা।

হক্কো সারা জীবনভর মেহনত-মজতুরি করে তার ছেলে-মেয়ের জন্যে সামান্য কিছু টাকা-পয়সা জমিয়েছিল। ব্যাঙ্কের নাম সে কোন দিন শোনেনি। তার সমস্ত পুঁজি (সম্ভবত তা তুশো টাকা হবে) দিয়ে সে রুপোর গয়না করে কানে গলায় হাতে পরে ছিল। রুপোর কান-ছাবিতে ঝুঁকে-পড়া তার কান তুটো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। এই গয়না তার জীবনের থেকেও প্রিয় ছিল, কারণ এ ছিল তার বৃদ্ধ বয়সের সম্বল। একদিন পাড়ার সমস্ত মানুষ অবাক হয়ে দেখল হক্কোর কানে কানছাবি নেই, গলায় হার নেই, তার হাতে বালা চুড়ি কিছুই নেই। তবু ওর মুখে লেগে রয়েছে সেই আগের হাসি, আর কোমরটা একটুও বেঁকে যায়নি।

মহাত্মা গান্ধী সেই সময় মুহম্মদ আলী শওকত আলীর সঙ্গে একবার পানিপথে এসেছিলেন। আমার ঠাকুরদার বাড়িতে তিনি স্বরাজ এবং অসহযোগের ওপর বেশ কয়েকটি ভাষণ দিয়েছিলেন। তারপর যখন চাঁদা তোলা হল তখন হক্কো তার সমস্ত গয়না খুলে থলিতে দিয়ে দিল। তার দেখাদেখি অন্যান্য মেয়েরাও গয়না খুলে চাঁদা দিয়ে দিয়েছিল।

সেই দিন থেকে হক্কো 'স্বরাজী' হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে এসে ঠাকুরদা আর বাবার কাছ থেকে খবর শুনত আর প্রায়ই জিজ্ঞেস করত,

"এখানে ইংরেজ রাজ কবে শেষ হবে ?" খিলাফত কমিটি বা কংগ্রেসের সভা হলে সে খুব উৎসাহের সঙ্গে ছুটে যেত এবং সাধ্যমত সে রাজনৈতিক আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা করত। কিন্তু সারা জীবন ভর মেহনত করে তার শরীর ভেঙে গিয়েছিল—প্রথমে তার চোখ তাকে জবাব দিয়ে দিল, তারপর তার হাত-পা। ঘর থেকে বেরনোই তার বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সে চরকা কাটা ছাড়ল না। চোখ ছাড়াই হাতের আন্দাজে সে কাপড় বুনে যেত। ছেলে এবং নাতিপুতি তাকে নিষেধ করলে সে বলত, এ কাপড় আমার কফনের জন্যে বুনছি।

তারপর হক্কো একদিন মারা গেল। তার শেষ ইচ্ছে ছিল "আমার হাতে বোনা কাপড় দিয়ে আমাকে কফন দিও। ইংরেজি মিলের কাপড় দিয়ে কফন দিলে আমার আত্মার শান্তি হবে না।" সেই সময় সাধারণত লং ক্লথ দিয়েই কফন হত। খদ্দরের কফন হক্কোই প্রথম পেয়েছিল।

হক্কোর যখন জানাজা হয় তখন শুধু তার কয়েকজন আত্মীয় এবং দু-একজন পাড়া প্রতিবেশীই উপস্থিত ছিল। না কোন মিছিল হয়েছে, না কোন ঝাণ্ডা উড়েছে, এন্তেকালের পর একটা ফুলও জোটেনি হক্কোর —শুধু এক ফালি খদ্দরের কফন!

এই সময় যদি আমার একটুও বোঝার বয়স হত তবে আমি অন্তত একটি স্লোগান দিতাম—'ভারতমাতা কি জয়!'

মহর্ষি মনুর পরাজয়

মহর্ষি মনু মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন। ব্রহ্মার মুখ থেকে যাদের জন্ম তারা ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে যাদের জন্ম তারা ক্ষত্রিয়, উদর থেকে যাদের জন্ম তারা বৈশ্য, আর ব্রহ্মার পা থেকে যাদের জন্ম তারা শূদ্র—সেই শূদ্ররা সব সময়েই অন্যান্য জাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে। এদের সবার থেকে আলাদা এবং শূদ্রদের থেকেও অপবিত্র হচ্ছে ম্লেচ্ছ। অন্য ধর্মাবলম্বীরা হচ্ছে ম্লেচ্ছ, ঋষিপ্রবর মনুর সমাজে তাদের কোন স্থান নেই। মনুর যুগে এই শ্রম-বিভাজন সমাজের প্রগতির জন্যে খুব সম্ভব

লাভদায়ক ছিল এবং বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার ভাব সৃষ্টি করারও প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বিগত কয়েক হাজার বছর ধরে এই বর্ণ-বৈষম্যটা বিবেককে ধ্বংস করে চলেছে এবং একটা অনড় কঠিন পাথরের মতো হয়ে গেছে। পৃথিবী তার রূপ বদল করে চলেছে ; যাযাবর জীবন থেকে কৃষি, কৃষি থেকে জমিদারি, জমিদারি থেকে জায়গিরদারি, জায়গিরদারি থেকে বাদশাহী, বাদশাহী থেকে বিদেশী সাম্রাজ্য, আর বিদেশী সাম্রাজ্য থেকে স্বরাজ ! একটা দৌড় শেষ হতে না হতেই আরেক দৌড় শুরু হয়ে যাচ্ছিল ; কিন্তু জাতিভেদের থাবা আগের মতোই অটুট রইল। এবং এখনও অনেকটা সে রকম রয়ে গেছে।

সমস্ত ভারতীয়দের মা যে 'ভারতমাতা' সে কি তাঁর সন্তানদের মধ্যে এই যে বৈষম্য এবং বৈরি মনোভাব মানবে ? তাঁর কাছেও কি ব্রাহ্মণ আর শূদ্র, হিন্দু আর মুসলমানের উঁচু-নীচু ; বা কোন শিশুর ময়লা সাদা, সুন্দর বা কুৎসিত বুদ্ধিমান বা মূর্খের ভেদাভেদ আছে ? 'ভারত-মাতা' তো অশিক্ষিত—প্রাচীন রীতি এবং প্রথাকে সে শুধু মানেই না, পূজোও করে। সে কি কখনো ঐ ঋষিপ্রবর মনুর প্রদর্শিত পথকে ছেড়ে সমস্ত মানুষকে ভাই এবং এক—এই বিশ্বাসের রাস্তায় চলতে পারবে ?

আমি যখন এই সব প্রশ্ন নিয়ে ভাবি, তখন আমার বন্ধুর দিদিমা—যিনি পুণাতে থাকতেন, তাঁর কথা আমার মনে পড়ে যায়। আশি বছরের এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সমসাময়িক কালের অনেক উঁচু-নীচু ভেদাভেদ দেখেছিলেন। তাঁর কোঁচকানো মুখে এক অদ্ভুত শান্তি বিরাজিত ছিল, যেন তিনি তাঁর জীবনের শেষ রহস্যের হদিস পেয়ে গিয়েছিলেন। আর যেন তার মনে মৃত্যুর কোন ভয় ছিল না। জানি না কত দিন ধরে তিনি বৈধব্য নিয়ে তাঁর নাতি-নাতনিদের সেবা-আত্তি করে কাটাচ্ছিলেন। সে সময়ে খুব কাজ-কর্ম করেন ; তাঁর হাতে-পায়ে এমন জোর ছিল না কিন্তু তবু তিনি ঐ বৃদ্ধ বয়সেও বাড়ির মধ্যে সবার আগে ঘুম থেকে উঠতেন, ঠাণ্ডা জল দিয়ে স্নান করতেন এবং পূজো-আচ্চায়ও বসতেন।

দিদিমা মারাঠী ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতেন না। তাঁদের শিশু বয়সে মেয়েদের লেখা-পড়া শেখানো হত না। তিনি কোন দিন

খবরের কাগজ পড়েননি; না শুনেছেন রেডিও না কোন জনসভায় নেতাদের ভাষণ শুনেছেন। তিনি কোন দিন 'ইনক্লাব' স্লোগান দেননি, কিন্তু তবু কিভাবে ইনক্লাব স্বয়ং দিদিমাকে খোঁজ করতে করতে পুনার অন্ধকার আর সরু গলি দিয়ে তাঁর ঘরে উপস্থিত হয়েছিল।

ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম, দিদিমার এক নাতি বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সময় পুণার নওজোয়ান সোস্যালিস্টদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর? তারপর দিদিমার সেই এতটুকু ঘরে, যে ঘরে যুগ যুগ ধরে ঈশ্বর ভজন ছাড়া আর কোন আওয়াজ শোনা যায়নি, সেই ঘরটায় 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' তরুণ বিপ্লবীদের গুজুর-গুজুরে মুখরিত হয়ে উঠল। নতুন নতুন কথা আর নতুন নতুন ভাবনা দিদিমার কানে আসতে লাগল।—আজাদি, ইনক্লাব, আন্দোলন, সাম্রাজ্যবাদ, স্বরাজ, প্রজাতন্ত্র।

দিদিমার বাড়ি এক সরু গলিতে ছিল বলেই গোপন কাজের খুব উপযুক্ত ছিল। কত 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড' বিপ্লবীই না সেখানে এসে থাকতে লাগল—কত নতুন মুখ আসতে লাগল, তাদের কোন নাম ছিল না, কোন জাত ছিল না। তারা সবাই ছিল বিপ্লবী ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ। রাত্রির অন্ধকারে তারা আসত আর ভোরে সূর্য ওঠার আগেই চলে যেত। তাদের মধ্যে দু'চারজন পুলিসের হাত থেকে বাঁচার জন্যে দোতলায় দিনের পর দিন বন্ধ হয়ে লুকিয়ে থাকত। আর দিদিমা তার নিজের নাতির মতোই তাদের আদর-যত্ন করতেন। তাদের জন্যে চা করতেন, রান্না করতেন, শোয়ার জন্যে বিছানা দিতেন আর প্রতিদিন পুজোর পরে তাদের রক্ষার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতেন। কারণ দিদিমার অশিক্ষিত মনেও এই বিশ্বাস গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল—এই তরুণরা তাদের জীবনকে হাতের মুঠোয় করে দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছে।

দিদিমা অশিক্ষিত ছিলেন সত্য, কিন্তু মুর্খ ছিলেন না। কথা কম বলতেন, কিন্তু সব কিছু শুনতেন আর বুঝতেন তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী। খুব অল্প দিনেই তিনি বুঝতে পারলেন তার নাতির বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সবাই ব্রাহ্মণ নয়,—নীচ জাতিরও অনেকে আছে। শূদ্রও আছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানও আছে। জানি না দিদিমা কেন তাদের ছোঁয়া-ছুঁয়িতে কিছু মনে করতেন না। চা দেওয়ার সময় তিনি জিজ্ঞেস করাও

আবশ্যক মনে করতেন না, পেয়ালাটায় ব্রাহ্মণ, শূদ্র না ম্লেচ্ছ বা মুসলমান কে চা খাবে। দিদিমার কী যেন হয়ে গিয়েছিল, ঋষিপ্রবর মনুর নিয়ম-কানুন নির্দ্বিধায় ভাঙার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন।

যখন ছেলেরা সব শুয়ে পড়ত, দিদিমা সারা রাত ধরে জানলার কাছে সজাগ হয়ে বসে থাকতেন, যাতে করে পুলিশের সামান্যতম পায়ের শব্দেই ছেলেগুলোকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া যায়।

একদিন গভীর রাতে অন্ধকারের মওকা দেখে পুলিস এসে গেল। সবাই ঘুমিয়ে ছিল, শুধু দিদিমা জেগে ছিলেন। বাইরে রাস্তায় পুলিশের গাড়ি থামার শব্দ শুনতেই দিদিমা তার নাতি এবং তার সমস্ত সাথীদের জাগিয়ে দিলেন। পুলিশ ঘরে ঢোকার আগেই তারা সবাই সোজা বাড়ির ছাদের ওপর উঠে গেল এবং এক ছাদ থেকে আরেক ছাদে লাফিয়ে বিপজ্জনক এলাকা পার হয়ে চলে গেল। তারপর পুলিশ যখন ঘরে ঢুকল তখন তারা সেখানে অল্পদৃষ্টিসম্পন্ন বৃদ্ধা দিদিমাকে ছাড়া আর কাউকে পেল না, কিন্তু ফরাসের ওপর তখনও গোটা কয়েক কম্বল পড়েছিল। পুলিশ দিদিমাকে থানায় নিয়ে গেল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁকে এই অপমান সহ্য করতে হল। সেখানে তাকে কয়েক ঘণ্টা ধরে জেরা করা হল।—তোমার ঘরে কে কে ছিল? তারা কি কথাবার্তা করছিল? তোমার নাতি কোথায়? তার সাথী কে?···কিন্তু দিদিমা তাদের প্রতিটি জেরার জবাবে না বোঝার ভান করে উত্তর দিয়েছে— "আমি কিছু জানি না। আমি অশিক্ষিত বুড়ি, এসব আমি কী করে জানব?" রেগে মেগে পুলিশ দিদিমাকে ছেড়ে দিল। দিদিমার কাছ থেকে বিপ্লবীদের সন্ধান পাওয়া যায়, এমন একটি কথাও পুলিশ বের করতে পারল না।

দিদিমা এখনও পূজা-আর্চা করেন, কিন্তু কোন ছোঁয়া-ছুঁয়ি মানেন না। গত বৎসর যখন তাঁর সেই সোস্যালিস্ট নাতির বিয়ে হয়, তখন সেই বিয়েতে তার কয়েকজন মুসলমান বন্ধুও আসে এবং তাদের বাড়িতেই ওঠে। বিয়ের উৎসবে তারা অংশগ্রহণ করলে তাদের কয়েক জন গোঁড়া আত্মীয় বিয়েতে থাকতে সোজাসুজি অস্বীকার করেছিল। দিদিমাকেও বলা হয় তাঁদের বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনি যেন নাতিকে রাজি করান, যাতে বিয়ের উৎসবে ম্লেচ্ছরা না থাকে। কিন্তু

দিদিমা তাদের কোন কথাই শুনলেন না। বরং আমি বিয়ের আগের দিন সকালে দেখলাম দিদিমা আমার স্ত্রীর পাশে বসে তাকে চা খাওয়াচ্ছেন এবং তার নাতিকে নিয়ে গল্প করছেন—ঠিক আমার দিদিমা যে ভাবে কথা বলেন আর যা করেন উনিও হুবহু তাই করছেন।

আর সেই দিন থেকে আমি প্রায় সব সময় ভাবতাম যখন ভারত-বর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লেখা হবে তখন কি তাতে অজ্ঞাত অখ্যাত এই দিদিমার নামটাও থাকবে? স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের জন্যে তাঁর যুগ-যুগান্তের চিন্তা-ভাবনা ত্যাগ করেছিলেন। আমার আরো প্রশ্ন জাগে এই রোগা শুকনো ফোকলা বৃদ্ধা মহিলার মধ্যে এমন কি শক্তি ছিল যা ঋষিপ্রবর মনুর মোকাবিলা করতে এতটুকু ভয় পায়নি? এই জন্যেই কি যে তিনিই হলেন স্বয়ং; 'ভারতমাতা' আর এই 'ভারতমাতা' মনুস্মৃতি থেকে অনেক বেশী দৃঢ় এবং অমর।

হিন্দুস্থান আমাদের

আমরা যারা উত্তরে থাকি তারা দক্ষিণ-ভারত সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করি—যেমন সারা দক্ষিণ ভারতে 'মাদ্রাজী'রা থাকে। তারা সবাই মাদ্রাজী ভাষায় কথা বলে, আর ছোঁয়া-ছুঁয়ির ব্যাপারে এরা এত গোঁড়া যে শূদ্রের ছায়া কোন ব্রাহ্মণের ওপর পড়লে শূদ্রকে পেটানো হয় এবং ব্রাহ্মণকে সঙ্গে সঙ্গে স্নান করতে হয়।

কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম, যখন আমি এবং আমার স্ত্রী মাদ্রাজে গেলাম। আমার এক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, 'আপনি আমাদের ওখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন।' আমি জানতাম, আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও জাতিভেদ মানত না কিন্তু তার মা-বাবা? বিশেষ করে তার মা? তাদের ওখানে দু'জন 'ম্লেচ্ছ' খাবে তা কি তিনি মেনে নিতে পারবেন? আমি ভাবলাম, খুব সম্ভব রান্নাঘরের বাইরে বসিয়ে আমাদের খাওয়ানো হবে। এসব ভাবতে ভাবতেই আমরা তাদের বাড়িতে পৌঁছলাম। বাড়িতে আমার বন্ধুর দু বোন আর তার মা ছিলেন, বাবা বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। এই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের

আচার-আচরণ কেমনটা হবে, সেই কথা ভেবে আমার স্ত্রী খুব ভীত হল। কিন্তু সেখানে পৌঁছতেই এমন হৃদ্যতার সঙ্গে তারা আমাদের আপ্যায়ন করল যে আমাদের আগের সমস্ত সন্দেহ আর ভুল ভেঙে গেল।

আমরা মাত্র দশ দিন মাদ্রাজে ছিলাম, আর এই দশ দিনই আমরা দিনের খাবার এই ব্রাহ্মণ পরিবারেই খেয়েছি। তারা কেতা-দুরস্ত ছিল অথচ ইংরেজি কায়দায় চেয়ার-টেবিলে খাওয়া-দাওয়া না করে মাটিতে বসে কলার পাতায় বা তামার থালায় খাবার খেত। যতদিন আমরা সেখানে ছিলাম কোনদিনই কোনভাবেই ছোঁয়াছুয়ির বা বাছ-বিচারের কথা ওঠেনি। এমন কি আমরা তাদের রান্নাঘরেও যেতে পারতাম। আমার বন্ধুর মা আমার স্ত্রীকে তাঁর নিজের মেয়ের মতো করে নিয়েছিলেন, আর আমরা তাদের সঙ্গে এমন মিলে মিশে গিয়েছিলাম যে মনে হচ্ছিল আমরা যেন তাদের পরিবারেরই মানুষ। এই ব্রাহ্মণ পরিবারে এমন স্বাধীন চিন্তা এবং সহনশীলতা কোথা থেকে এল? এ কথা ঠিক যে আমার বন্ধুর বাবা গান্ধীজীর পুরনো বন্ধুদের একজন। বছর কুড়ি আগে তিনি দেড়-দু হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে সমাজ-সংস্কারের কাজে নামেন। তখন থেকেই এই পরিবার জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারিতে আছে। কিন্তু এই উদারতা এবং প্রগতিশীলতার ভিত্তি শুধুমাত্র জাতীয় চেতনার ওপর নির্ভর করে ছিল না। এঁরা বিগত তিরিশ বছর ধরে দিল্লী কলকাতা জামশেদপুর এলাহাবাদ আলমোরা ওয়ার্ধা বোম্বাই আর না জানি কত জায়গায় ছিলেন। ওঁদের মাতৃভাষা তামিল, কিন্তু আমার বন্ধুর মা তাঁর অল্প বয়স থেকেই মালাবারে ছিলেন, তাই তিনি মালয়ালমও বলতে পারতেন। কয়েক বছর ইউ. পি.-তে থাকার জন্যে বাড়ির সবাই পরিষ্কার হিন্দি বলতেন, আর বাংলা তো বাঙালীদের মতোই বলতেন। এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এক বাঙালী ফিল্ম ডাইরেক্টরের সঙ্গে। আর-এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল এক বাঙালী সাংবাদিকের সঙ্গে। মেয়েদের বাচ্ছাকাচ্ছারা যারা বোম্বাইতে থাকে তারা তামিল, বাংলা, হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি এবং ইংরেজি—এই ছ ভাষা মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি করে কথা বলত, আর বাড়িতে যে রান্না হত তাও পাঁচ-মিশেলি। এই

পরিবার অবশ্যই দাবি করতে পারে, 'হিন্দি আমাদের ভাষা আর হিন্দুস্তান আমাদের দেশ।'

মা-ই ছিলেন এই পরিবারের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এক কালে, আজ থেকে বছর তিরিশেক আগে এই রমণী কলেজে পড়াশোনা করেছেন, দেখতেও ছিলেন পরমা সুন্দরী। বিদেশী ইংরেজি ভাষা শুধু অনর্গল বলতেই পারেন না, লিখতেও পারেন সুন্দর করে; ইংরেজিতে অনেক প্রবন্ধ কবিতা লিখেও ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর যোগ্য স্বামী এক সময় আঠারো শো টাকা মাইনের চাকরি করতেন। জাঁকজমকের বাংলোয় থাকা, ফার্স্ট ক্লাশে ভ্রমণ তো ছিলোই। আর আজ? আজ তিনি একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে গোটা পরিবারটা নিয়ে মাথা গুঁজে আছেন। পরনে খদ্দরের শাড়ি, পায়ে ছেঁড়া চটি। নিজের হাতেই রান্নাবান্না করছেন। বাড়ির সবাইকে, আর অতিথি অভ্যাগতদের খাইয়ে তবে নিজে দুটি খাবার মুখে তোলেন। গেরস্থালিতে ব্যস্ত থাকলেও, মগজে তালাচাবি আঁটেন নি। ইংরেজি তামিল হিন্দি সব ভাষার নানা পত্র-পত্রিকা, বই প্রায় রোজই পড়তেন তিনি। দেশ-বিদেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা সমালোচনা, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনে যোগদান, শিল্প সংগীত বিষয়ে কৌতূহল, সবকিছুতে তার একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। দুটি মেয়েকে তিনি ক্লাসিক্যাল নাচ গান শিখিয়েছিলেন। ফিল্মও দেখতেন তিনি; আর প্রয়োজনে তীব্র সমালোচনা করতেও ছাড়তেন না। জাতীয় আন্দোলনের টানে মোটা মাইনের বিলাস-সুখের জীবনটা ছেড়ে এই স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে এসে ছিলেন। দেশভক্তদের মধ্যে সাধারণত যে ধরনের একটা অসহিষ্ণুতা এবং রূঢ়তা থাকে, ত্যাগের বড়াই থাকে, হামবড়া একটা ভাব থাকে, এই দেশপ্রেমী দম্পতির মধ্যে তার বিন্দুমাত্র ছিলো না। এই মহিলা, তাঁর স্বামী, তাঁদের ছেলে বেশ কয়েকবার কারাবরণ করেছেন; তবু কোথাও তাঁরা সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করেন নি। প্রতিদিনের জীবনে অভাব ছিলো, অনটন ছিলো—কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে ওঁদের মুখে থাকতো অমলিন হাসি। শুধু হাসতেন আর হাসতেন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণভরে উপভোগ করতেন। এই মহিলার বয়েস ষাটের কাছাকাছি, চুলে পাক ধরেছে, মুখের ওপর বয়েসের ভাঁজ পড়েছে: কিন্তু তবু তাঁর

মন এখনও তরুণ, সবুজ। সময় এখনও তাঁর মুখের সেই অমল হাসি কেড়ে নিতে পারে নি; যৌবনে ঐ হাসিটাই তো ছিল তাঁর স্বকীয়তা, তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এক দুপুরের কথা আজও আমার মনে আছে। আমরা তাঁর ঘরের মেঝেতে সবাই শুয়ে ছিলাম। গরমের দিন, ঘরে কোন বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। আমি চোখ খুলে দেখলাম, তিনি চশমা পরে একখানা তামিল বই পড়ছেন আর সেই সঙ্গে আমাদের হাওয়া করে চলেছেন। অথচ তাঁর নিজের মুখের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম চকচক করছে। তাঁর মন ছিল বইয়ের মধ্যে আর হৃদয় ছিল সন্তানদের জন্য। নিজের সম্পর্কে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। জানতাম, আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি উঠবেন এবং বই রেখে আমাদের জন্যে চা বানাবেন, বাচ্চাদের স্নান করাবেন। আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম, এত কাজ উনি কিভাবে করেন।

কোনদিন কি তাঁর মনে দ্বন্দ্ব জাগে নি? একদিন কী ঐশ্বর্যময় জীবন ছিল—আজ কী দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট দিনযাপন। কী করে তিনি এর পরেও হাসেন? কী করে অন্যকে হাওয়া করতে করতে বইয়ের মধ্যে মন ডুবিয়ে দেন—রুটি বানাতে বানাতে রাজনীতি নিয়ে যুক্তিতর্কে নামেন?

আমার মনে হল, এ তো 'ভারতমাতা-'র নতুন এক রূপ আর বিস্ময়-কর এক দৃশ্য—এই 'ভারত-মাতা'-র এক হাতে বই অন্য হাতে পাখা, চুলে গোলাপ ফুল আর পায়ে ধুলো, চোখে বাংলার জাদু আর ঠোঁটে মালাবারের হাসি, দেহে রাজস্থানের ছন্দ আর পাঞ্জাবের লালিমা, চেহারায় বয়সের গাম্ভীর্য আর হৃদয়ে তরুণের দুরন্ত সাহস।

শরণার্থী

উনিশ শ সাতচল্লিশ সাল, অগাস্ট-সেপ্টেম্বরের ঝড় প্রায় এক কোটি মানুষকে শুকনো পাতার মতো উড়িয়ে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে ফেলল। পেশোয়ারের মানুষ বোম্বাই, দিল্লীর মানুষ করাচী, করাচীর মানুষ বোম্বাই, লাহোরের মানুষ দিল্লী, রাওয়ালপিণ্ডির মানুষ আগ্রায়,

আগ্রার মানুষ লায়ালপুর আর লায়ালপুরের মানুষ পানিপথে এল। সারা জীবনের বন্ধু, সাথী এবং পাড়াপ্রতিবেশী পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। খানদানী পরিবারগুলো ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে পৃথক হল। যাদের গৃহ ছিল তারা গৃহহীন হলো এবং লাখপতি ভিখিরি হয়ে গেল। চার দেয়ালের মধ্যে লালিত কুমারী যৌবন বিক্রির জন্যে মেয়েরা বাজারে হাজির হল।

এই ঝড় সাতচল্লিশের অক্টোবরে দুটি বৃদ্ধাকে তাদের নিজ নিজ দেশ থেকে সমূলে উঠিয়ে হাজার মাইল দূরের বোম্বাই-এ নিয়ে এসে ফেলল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন আমার মা, অন্যজন আমার এক শিখ বন্ধুর মা। একজন পূর্ব পাঞ্জাব থেকে এসেছিলেন, আর একজন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে। তাঁরা দুজনে খুব সম্ভব একই দিনে বোম্বাইয়ে আসেন। আমার মা পানিপথ থেকে রাতারাতি মিলিটারি ট্রাকে করে দিল্লী আসেন, আর সেখান থেকে প্লেনে করে বোম্বাই; কারণ এই সময়ে রেলে করে আসা ছিল খুব বিপজ্জনক। আর আমার বন্ধুর মা খুব বিপদের মধ্যে দিয়ে পশ্চিম পাঞ্জাবের বীভৎস দাঙ্গা থেকে পালিয়ে রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে অমৃতসরে আসেন, তারপর অমৃতসর থেকে দিল্লী, এবং দিল্লী থেকে বোম্বাই।

আমি আমার মাকে 'আম্মা' বলতাম। আমার শিখ বন্ধু তার মাকে 'মাজী' বলত। আমাদের দুই মা এখানে এলে, আমি বুঝতে পারলাম, এঁদের দুজনের মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র এই একটি।

মাজী রাওয়ালপিণ্ডিতে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। দোতলায় নিজেরা থাকতেন, আর নিচের ঘরগুলো দোকানের জন্য ভাড়া দেওয়া ছিল। ভাড়াটেদের অধিকাংশ মুসলমান। সারা পাড়াটাই ছিল মুসলমানদের। সর্দারজী আর মাজী দুজনেই প্রতিবেশীদের খুব প্রিয় ছিলেন। শৈশব থেকেই সবার সঙ্গে আন্তরিক মেলামেশা করতেন। সবাই মিলে হাসি-তামাশা করতেন। পাড়ার প্রতিটি মুসলমান মহিলা সর্দারনীকে 'বহেনজী' বলত, আর মেয়েরা 'মাজী' কিংবা 'কাকি' বলে ডাকত।

রাওয়ালপিণ্ডিই ছিল মাজীর দুনিয়া; কোন দিন তিনি রাওয়ালপিণ্ডির বাইরে যাননি। তাঁর ছেলে প্রথমে লাহোর তারপর কলকাতা আর তার পরে বোম্বাইয়ে চাকরির জন্য এসেছিল, কিন্তু মাজীর কাছে এই

সব শহর ছিল আর-এক দুনিয়া। ক্ষমতা থাকলে ছেলেকে অন্য কোথাও যেতে দিতেন না, নিজের কাছে রাওয়ালপিণ্ডিতেই রাখতেন। তিনি হামেশাই ভাবতেন, 'টাকা রোজগার করে কী লাভ, যদি খাঁটি ঘি, খাঁটি দুধ, খুবানি, বগু গোশে সেব আর আঙুর না পাওয়া যায়।' বাড়িতে মোষ ছিল। মোষ পাক্কা দশ সের দুধ দিত। দই পাততেন, মাখন বের করার পর সব সারা পাড়ায় বিলি করতেন, আর সবাই সর্দারনীকে দোয়া করত কিন্তু ছেলে বোম্বাইতে ঠিকমতো খাবার দাবার পাচ্ছে কিনা মনে পড়তেই মাজীর কান্না পেয়ে যেত।

রাওয়ালপিণ্ডির কাছেই তাঁর বেশ কিছু পৈতৃক জমি-জমা ছিল। খেত থেকে অনেক ফসল পেতেন। দুধ ঘি দই তো বাড়িতেই ছিল। দোকানগুলো থেকে আসত বেশ কিছু। আর ছেলেও যাহোক্ কিছু টাকা পাঠাত। জুন মাসে যখন দেশভাগ এবং পাকিস্তান হওয়ার খবর বেরুল, তখনও মাজী এতটুকু ভয় পাননি। রাজনৈতিক গণ্ডগোলে তাঁর কী আসে-যায়? হিন্দুস্থানই হোক আর পাকিস্তানই হোক, তাঁর প্রয়োজন তো কেবল পাড়াপ্রতিবেশীদের সঙ্গে। আর প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব তো বরাবরই ছিল। লক্ষ বার সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল হয়েছে, মাজী বা তাঁর বাড়ির লোকজনদের তা স্পর্শও করেনি। কিন্তু এবার আগুন ভয়ানকভাবে জ্বলে উঠল। রাওয়ালপিণ্ডিতে হিন্দু এবং শিখরা পড়ল দারুণ বিপদে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাজী শান্ত ছিলেন। ছেলে তাঁকে তাড়াতাড়ি বোম্বাই চলে যাবার জন্যে চিঠি লিখল, কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়তে তিনি রাজি হলেন না। তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিত মানুষ পূর্ব পাঞ্জাব এবং দিল্লীতে চলে এল, কিন্তু মাজী তাঁর বাড়ি থেকে নড়লেন না। কেউ যদি তাঁকে বলত এখানে থাকা বিপজ্জনক, হিন্দুস্থানে চলে যাও, তিনি বলতেন, কে মারবে? এই পাড়ার চারদিকে তো আমার ছেলেরাই থাকে!

কিন্তু পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান শরণার্থীরা আসার পর রাওয়ালপিণ্ডির অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে উঠল। মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যে দু-চার জন তাঁকে বলল, আপনি কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যান, না হলে প্রাণের ভয় আছে। আবার কেউ কেউ তাঁকে বলল, ঘাবড়াবেন না, আমাদের প্রাণ দিয়েও আপনাকে বাঁচাব। তাঁর ভাড়াটে এক

মুসলমান দর্জি—সর্দারজীর ওখানে তার যাওয়া-আসা ছিল, বেচারী কান্নাকাটি অনুনয় করে বলল, "আপনারা যাবেন না।"

পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিপদে পড়ে যারা এখানে এসেছে, তাদের মধ্যে অনেকেই মাজীর বাড়ির কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের খারাপ অবস্থা দেখে মাজী আর ঠিক থাকতে পারলেন না ; রাতে গায়ে দেয়ার জন্যে লেপ ইত্যাদি পাঠালেন। তাঁর কখনও মনে হয়নি এরা মুসলমান, এরা শিখদের দুশমন বলে মনে করে, এদের সাহায্য করা উচিত নয়। আর কখনও তিনি ভাবতেই পারেননি, দু-চার দিন পরে তাঁরও এই একই হাল হবে।

সেই দিনই ঠিক তাঁর বাড়ির সামনে একদল হাঙ্গামা বাজ মুসলমান এক হিন্দু টাঙ্গাওয়ালাকে ছুরি চালিয়ে মেরে ফেলল। এই ঘটনার বর্ণনা আমি মাজীর কাছ থেকে শুনেছি,—"বাবা, টাঙ্গাওয়ালা তো হিন্দু ছিল ঠিকই, কিন্তু ঘোড়ার তো কোন ধর্ম বা জাত ছিল না। কিন্তু ওরা ঐ হতভাগা জানোয়ারটাকেও ছাড়েনি। ছোরা চালিয়ে ওটাকেও মেরে ফেলল। মনে হচ্ছিল ওদের মাথায় রক্ত চড়ে গেছে, ওরা যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।" এরপর তিনি ঠিক করলেন এখানে আর থাকা নয় —থাকা মানেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়া।

তারপর তিনি রাওয়ালপিণ্ডির বাড়ি, সমস্ত জিনিসপত্র ছেড়ে চলে আসেন—বাড়িতে শুধুমাত্র একটা তালা লাগিয়ে দিয়েছিলেন। ভাবতে পারেননি চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে আসছেন ; আশা ছিল এই পাগলামো একদিন না একদিন কমে যাবে, তখন ফিরে যাবেন। কিন্তু দিল্লীতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে তাঁর প্রৌঢ় চোখ বুঝল রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। তিনি যখন বোম্বাই পৌঁছুলেন, তখনও রাওয়ালপিণ্ডির স্মৃতি তাঁর হৃদয়ে এক বেদনার বোঝা হয়ে রয়ে গেছে।

রাওয়ালপিণ্ডিতে উনি বড় বড় দু-কামরার বাড়িতে থাকতেন, আর বোম্বাইতে যে ঘরটায় তিনি আর তাঁর স্বামী ছেলের কাছে থাকতেন —সেখানে তিনটি ঘর ছিল ; তার একটিতে এক ধোপা থাকত, আর-একটা ছিল কয়লার দোকান। পেছনের ছোট ঘরটা একই সঙ্গে রান্না, স্নান এবং ভাঁড়ারের ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হত। আমার বন্ধুটি যখন ওখানে একলা থাকত, ঐ ঘরকে মনে হত একটা ভাঁড়ার ঘর। সেখানে পুরনো

খবরের কাগজ, এঁটো বাসনপত্র এবং ময়লা জামা-কাপড় স্তূপ হয়ে থাকত। আর আজ আপনি সেখানে দেখবেন ঐ ছোট্ট জায়গায় সমস্ত কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো। মেঝে এমন ঝকঝক তকতক করছে যে কোথাও এককণা ধুলো বা মাটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ছেলে আর স্বামীর জন্যে মাজী নিজের হাতে রান্না করতেন, আর কেউ যদি দেখাসাক্ষাৎ করতে আসত তবে তাকে না খাইয়ে তিনি ছাড়তেন না। মাজীর ঘর-বাড়ি আসবাবপত্র চলে গিয়েছিল, জমি আর বাড়ির মালিক থেকে আজ তিনি এক শরণার্থী ; কিন্তু তাঁর আতিথেয়তা নষ্ট হয়ে যায়নি।

মাজীর গায়ের রঙ ছিল ফর্সা, দেখতে ছোটখাটো, আর আগে তাঁর মাথার চুল ছিল আধ-পাকা-আধ-কাঁচা, কিন্তু রাওয়ালপিণ্ডি ছাড়ার পর থেকে তাঁর চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন, কিন্তু কখনও কাজ ছাড়া থাকতে পারতেন না। কখনও ছেলের জন্যে খাবার তৈরি করছেন, স্বামীর কাপড়ে তালি লাগাচ্ছেন, কখনও বা অতিথিদের জন্যে চা বা লস্যি বানাচ্ছেন—সমস্ত কাজই তিনি নিজের হাতে করতেন। তাঁকে দেখে কারুর কখনই মনে হত না যে তিনি এত বিপদ-আপদ পার হয়ে আসা এক শরণার্থী। তিনি কোন দিন বলেননি মুসলমানরা খারাপ, অথচ মুসলমানদের জন্যই তিনি গৃহহারা হয়েছেন। আর তাঁর প্রতিবেশী মুসলমানদের কথা তিনি আজও খুব মমতার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি তাদের কাছে চিঠি লেখেন আর চিঠির উত্তর এলে খুব খুশি হন। যেদিন আমার মার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হল সেদিন দুজন দুজনের গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং কোন কথা বলার আগেই দু জনে কয়েক মিনিট ধরে নিজের নিজের দেশের কথা স্মরণ করে কাঁদতে লাগলেন। আর তাঁরা পরস্পরকে এমন সান্ত্বনা দিতে লাগলেন যেন তাঁরা দু জনে দুই বোন। একজন শিখ আর একজন মুসলমান মহিলার মিলিত কান্না দেখে আমার মনে হল মুসলমান আর শিখের মধ্যে আজ তিন বছর যে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ জমে আছে তা বুঝি চোখের জলে ধুয়েমুছে গেল।

শরণার্থী হওয়া সত্ত্বেও মাজী তাঁর দুঃখ এবং ক্ষতির কথা বলতেন না। হাঁ, কখনও কখনও এক আলতো ঠাণ্ডা শ্বাস নিয়ে বলতেন, "বাবা, তোমার বোম্বাই বিরাট শহর, কিন্তু আমি তো কোন দিন রাওয়ালপিণ্ডি

ভুলতে পারব না। সেই খুবানি, সেই বগ্‌ও গোশে···।”

বলতে বলতে উনি চুপ হয়ে যেতেন আর তাঁর বসে-যাওয়া ফ্যাটফেটে চোখ দুটি জলে ভরে উঠত। মনে হত এই শরণার্থী-ভারতমাতার হৃদয়ে ক্রোধ এবং ঘৃণার এতটুকু স্থান নেই—আছে শুধু পুরনো স্মৃতি, যে স্মৃতি মিশে আছে তাঁর হারিয়ে-যাওয়া জন্মভূমির সঙ্গে; এ স্মৃতি যেন বগুগোশের মতো মসৃণ আর তুলতুলে এবং খুবানির মতো সুন্দর।

ঘৃণার মৃত্যু

প্রতিটি মানুষের কাছেই তার আপন মা-ই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে মহীয়ান এবং প্রিয়। তাই এই ভারতমাতাদের মধ্যে আমার স্বর্গীয়া মাকে যদি আমি স্থান দিই তবে তা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার হবে না। আমি না হয়ে আমার জায়গায় অন্য কেউ হলেও এ ব্যাপারে তার নিজের মার কথা বলত এবং মাকে ভারতমাতার স্থান দিত। কারণ আমার মার মুখাবয়বের মধ্যেই আমি প্রথম ভারতমাতার ঔজ্জ্বল্য দেখেছি, এবং ভারতমাতার যত স্বতন্ত্র রূপ আছে তার প্রতিটি সুন্দর, প্রিয় পরিচিত রূপ নিজের মার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি।

আমার বলার কথা হচ্ছে, মার জীবনের অন্তিম দিনগুলির মধ্যেই আমি আমার মার সবচেয়ে সুন্দর এবং ভালো দিকগুলো লক্ষ্য করেছি। তার পূর্বে তিনি শুধুমাত্র আমার মা-ই ছিলেন, কিন্তু সাতচল্লিশের ভয়ানক ঘটনার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমি আমার মার মধ্যে ভারত-মাতার রূপ এবং শক্তি অনুভব করতে শিখেছি।

হিন্দু শরণার্থীরা যখন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে পানিপথে চলে এল সেখানে মুসলমানদের থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। তারাও পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। তখন আমার মাকেও আত্মীয়স্বজনরা তাদের সঙ্গে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার জন্যে চাপ দিল এবং আমাকেও চিঠিতে বোম্বাই থেকে করাচী চলে আসতে লিখল। কিন্তু মা তাদের সোজাসুজি না করে দিয়ে বললেন, “আমি আমার দেশ ছাড়ব কেন? আমার ছেলে হিন্দুস্থানেই থাকবে বলে ঠিক করে

নিয়েছে। তার এই ফয়সালায় আমার মত আছে।" গণ্ডগোল শুরু হওয়ার বিশ-বাইশ দিন পর্যন্ত তিনি পানিপথেই ছিলেন। সাত দিন ধরে কার্ফু ছিল, শুকনো রুটি আর চাটনি খেয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে। দিনের পর দিন বাচ্চাদের দুধ পাওয়া যায়নি, নিজের প্রিয় পান পাননি—বাজার থেকে পান উধাও হয়ে গিয়েছিল। পান ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে প্রিয় জিনিস। যদি বা পানপাতা জুটত তার দাম পড়ত প্রতিটা একটাকার মতো। উনি সেই পাতাটা ছোট ছোট টুকরো করে সারা দিন চালাতেন।

পরিবারের কোন পুরুষ মানুষ সেই সময় পানিপথে ছিল না। আমি বোম্বাইতে ছিলাম, খুড়ততো ভাইদের একজন ছিল পুনায় আর একজন দিল্লীতে। সেই সময় দিল্লী থেকে পানিপথ—এই পঞ্চাশ মাইল যাওয়া আসা ছিল খুব মুশকিলের। চিঠি এবং টেলিগ্রাফ-যোগাযোগও বন্ধ ছিল। কিন্তু তবুও মা অটল রইলেন, তিনি হিন্দুস্থানে থাকবেন।

আমাদের যেসব আত্মীয়স্বজন পাকিস্তানে যেতে রাজি হননি তাঁদের বের করে আনার জন্যে জওহরলাল নেহরুর দয়ায় একটা মিলিটারি ট্রাক রাতারাতি পানিপথে পাঠানো হল। জিনিসপত্র বাঁধা ইত্যাদির জন্যে মাত্র এক ঘণ্টা সময় পাওয়া গিয়েছিল। বোরখা-পরা মহিলারা যে যা পেরেছেন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন কিন্তু আসার সময় আমার মা বুঝতেই পারেননি যে চিরদিনের জন্যে তাঁকে তাঁর দেশ আর বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হচ্ছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অবস্থা ঠিক হয়ে গেলেই তিনি আবার ফিরতে পারবেন। তাই তিনি দরজায় একটা তালা লাগিয়ে তাতে বোর্ড ঝুলিয়ে দিলেন— "এই বাড়ির লোক পাকিস্তানে যাচ্ছে না, বোম্বাইয়ে তাঁর আত্মীয়ের কাছে যাচ্ছে এবং হিন্দুস্থানেই থাকবে।"

তাঁরা কুড়ি দিন দিল্লীতে থাকলেন। তিরিশ জন মানুষ একটি ঘরে বদ্ধ অবস্থায় রইলেন। বিমান বন্দরে পৌঁছনোও অসম্ভব ছিল, আর রেলপথ ছিল আরও বিপজ্জনক। এই সময় খবর এল পানিপথে আমাদের বাড়ি লুট হয়ে গিয়েছে এবং শরণার্থীরা তা দখল করে নিয়েছে। প্রাণের ভয়ে দিনের পর দিন উপবাস আর এক ঘরে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হল। সবার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বাচ্চাদের

মুখ একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল। অবশেষে বিমানের রাস্তা খুলল, আর জীবনে এই প্রথম আমার মা বোরখা ছাড়াই সফর করতে পা বাড়ালেন।

যেদিন তাঁর বোম্বাই আসার কথা, তার আগের দিন রাতটা আমি দুশ্চিন্তায় জেগে কাটালাম—না জানি এইসব ভয়ানক ঘটনা মার শরীরকে কী করে দিয়েছে—তিনিও কি ঘৃণা আর বিদ্বেষ, রাগ আর সাম্প্রদায়িকতার জোয়ারে ভেসে গিয়েছেন, সেই সময় সারা হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানে ঐ বিষস্রোতই তো ছড়িয়ে পড়েছিল? মানুষের প্রতি তাঁর সর্বদা যে ভ্রাতৃত্ব, করুণা এবং ভালোবাসা, তা কি এই খুনের সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে? তাঁর যে ভালোবাসার হৃদয় এবং হাসিখুশি মুখ তা কি চিরদিনের জন্যে বিষাদ আর নিরাশার মেঘে ছেয়ে গেছে? আমি আমার মার শরীরের কথা ভালোভাবে জানি। পনের বছর ধরে তাঁর হাঁপানি ছিল। হিস্টিরিয়া তাঁর পুরনো রোগ। বাবা এবং ছোট বোনের মৃত্যু তাঁর হৃদয়কে দুর্বল করে দিয়েছিল। ষাট বছর বয়সে তাঁকে আশী বছরের বৃদ্ধা বলে ভুল হত। দু পা জোরে চলাও তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। এত বিপদ আপদ পেরিয়েও তিনি কি বেঁচে থাকবেন? যদি বেঁচেও থাকেন তবে কি জীবনের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ থাকবে? বিমানযাত্রাতেও না জানি কত কষ্ট পেয়েছেন তিনি···

বিমান মাটিকে স্পর্শ করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত এইসব প্রশ্ন আমার মনকে বিচলিত এবং চিন্তান্বিত করে রেখেছিল। আমি দেখলাম বিনা বোরখায় একখানা চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে মা বোনকে ভর করে বিমান থেকে নামছেন। এই দৃশ্য দেখে আমার চোখ জলে ভরে উঠল। যিনি এত পর্দানশীন ছিলেন—এই পর্দাপ্রথা নিয়ে মা আমার সঙ্গে কত না তর্ক করেছেন—আজ তিনিই নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে পর্দা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁকে পর্দা ছাড়ানোর জন্যে আমি সারা জীবন চেষ্টা করেছি, আজ তাঁকে বিনা বোরখায় আসতে দেখে আমি এতটুকু খুশী হলাম না। বরং ভয় পেয়ে গেলাম, বোধ হয় এ জন্যেই তাঁর দেহ শ্রান্তিতে ভেঙে পড়েছে। দেখে মনে হল, যে জীবন তাঁর প্রিয় বিশ্বাসকে ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে সেই জীবনকে তিনি যেন ধিক্কার দিচ্ছেন।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমি তাঁকে ধরে গাড়ির কাছে নিয়ে গেলাম। হাঁপানির টানের জন্যে তিনি কিছুক্ষণ পর্যন্ত কোন কথা বলতে পারলেন না, কিন্তু টান সামলে নিয়ে তিনি যা বললেন তা আমি আজও ভুলতে পারি নি—"আমি এখন হামেশা বিমানে সফর করব, কী আরামের সফর।" জীবন সম্পর্কে তাঁর কী অটল বিশ্বাস!

সেই দিন রাতে পানিপথ আর দিল্লীর কথা শোনাতে গিয়ে তিনি আমার অন্য সব সন্দেহকেও দূর করে দিলেন। তিনি বলছিলেন, "না এ ভালো, না ও ভালো। না মুসলমানরা ছেড়েছে, না হিন্দু বা শিখরা ছেড়েছে। সবার মাথায় খুন চেপেছে। যেহেতু আমি মুসলমান, তাই মুসলমানদেরই আমি বেশী দোষ দেব, কারণ তারা এইসব কাজ করে ইসলামের নামই ডুবিয়েছে।"

বোম্বাইতেও সেই সময় দাঙ্গা চলছিল। আমার মা জানতেন, আমরা যেখানে থাকতাম সেই শিবাজী পার্ক হিন্দু এলাকা—সেখানে বড় জোর দু-চার ঘরের বেশি মুসলমান নেই। কিন্তু তিনি পরের দিনই বোরখা পরে দুটো বাচ্চার আঙুল ধরে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেরুলেন এবং ওদের জন্যে ঝিনুক কুড়োতে লাগলেন। আমি নিচু গলায় তাঁকে নিষেধ করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। বললেন, "আরে আমাকে কে মারবে?" তিনি বিনা দ্বিধায় আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন আর আমি দুশ্চিন্তা নিয়ে উঠোনের চৌকাঠে বসে দূর থেকে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলাম। নিজেকে আমার ভীরু মনে হল। মনে হল তাঁর যে সাহস এবং মানবতা, তা আমার বিশ্বাসের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দৃঢ়।

আমার এক পাঞ্জাবী হিন্দু শরণার্থী বন্ধু সেই সময় আমার ওখানে ছিল। আমার মা যখন শুনলেন, তার শহর শেখুপুরাতে বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে, এবং আমার বন্ধুর বাড়ির লোকজন নিজেদের প্রাণ নিয়ে কোনমতে রাতারাতি সেখান থেকে পালিয়ে হিন্দুস্থানে কোন শরণার্থী ক্যাম্পে চলে এসেছে', তখন তিনি অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলেন। আমাকে একা ডেকে নিয়ে বললেন, "দেখ, এই ছেলে আজ থেকে তোর ভাই, সব সময় একে দেখবি। এভাবেই আমরা আমাদের যে পাপ আমাদের ধর্ম-ভাইরা করেছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারি।"

প্রতিদিন নমাজের পর তিনি প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ্, সমস্ত গৃহহীন হিন্দু মুসলমান শিখ যেন তাদের নিজ নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারে।" যে দিন গান্ধীজী শহীদ হলেন, সেদিন আমাদের বাড়িতে মনে হল, যেন আমাদের কোন নিকটতম আত্মীয় মারা গেছেন। সেদিন রাতে মা কিছু মুখে দিলেন না। পরের দিন ভোর থেকেই তিনি রেডিওর কাছে বসে গান্ধীজীর মরদেহের মিছিলের 'কমেণ্টারি' শুনতে শুনতে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল মুছতে লাগলেন, আর বারবার ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস টেনে বলতে লাগলেন, "হায়, এখন হিন্দুস্থানের কী হবে ?"

ভাগ্যের কী অদৃশ্য খেলা দেখুন, যার নিজের স্বদেশের প্রতি এত ভালোবাসা, মৃত্যুর পরে হিন্দুস্থানের মাটি তাঁর কপালে লেখা ছিল না। করাচীতে তাঁর ছোট মেয়ের কাছে গিয়েছিলেন, সেখানেই তাঁর পুরনো অসুখ এমন ভয়ানক মারাত্মক হয়ে উঠল, তিনি আর বাঁচলেন না। কিন্তু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর দেশের প্রতি আগের মতোই বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর ছেলে জাতীয় আদর্শের জন্যে পাকিস্তানে আসা পছন্দ করবে না। তিনি ঠিকই জানতেন, তাঁর শেষ সময়ের সংবাদ যদি আমি পেতাম—আমি নিশ্চয়ই ছুটে যেতাম। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও তিনি আমাকে আসার জন্যে চিঠি লেখেননি। বোনকে বলেছিলেন, এমন কোন চিঠি লিখিস না, যাতে ও বিচলিত হয়ে চলে আসে। তিনি হিন্দুস্থানে মরতে চেয়েছিলেন। যখন একটু সুস্থ হয়ে ওঠলেন তখন 'পারমিট' করার জন্যে আমাকে চিঠি লেখান। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে ভারতীয় হাইকমিশনারের অফিস তাঁকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে হিন্দুস্থানে বসবাস করার জন্যে অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু স্বদেশে ফেরার স্বপ্ন নিয়েই তিনি এই দুনিয় থেকে বিদায় নিলেন।

মার কবর করাচীর গোরস্তানে আছে, কিন্তু তাঁর আত্মা তাঁর স্মৃতি তাঁর জীবনাদর্শ এই হিন্দুস্থানে, আমার কাছে রয়েছে। পানিপথে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি লুট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমি তাঁর কাছ থেকে য পেয়েছিলাম, তা ঐ বাড়ি বা অলংকার থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

আর পাকিস্তানের ছ ফুট জমি চিরদিনের জন্যে ভারতবর্ষের মাটি হয়ে থাকবে। কারণ সেখানে এক 'ভারতমাতা'কে দফন করা হয়েছে।

কিশোর সাহু

ওস্তাদের কসম

কিশোর শাহু চলচ্চিত্র-অভিনেতা। অভিনয়জগতে আসার আগেই সাহিত্যজগতে তাঁর প্রবেশ। গল্পকার হিসেবে হিন্দি-সাহিত্যে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রকাশিত হয়। 'বীর কুণাল' তাঁর বহুপ্রশংসিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। গল্পসংগ্রহগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'নাগিনী আউর বুলবুলে', 'টেসু কে ফুল'। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর আত্মিক সম্পর্ক। সাধারণ মানুষের জীবন এবং নৈতিকতার প্রতি ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তাঁর সৃজনে উপলব্ধ এবং প্রতিফলিত।

হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গার চতুর্থ দিন। লাঠি, ইঁট-পাটকেল এবং সোডার বোতল দিলদরিয়ার মতো ব্যবহার হচ্ছিল। বাছ-বিচার ছাড়াই মেয়েদের ইজ্জতের ওপর হাত পড়ছিল। পটকার মতো দুম ফটাস শব্দ করে মানুষের মাথার খুলি ফাটছিল। শহরের সব পানওয়ালার দোকানে পর্দার নাচনেওয়ালীর ছবির বদলে যখন পালোয়ানদের ছবি ঝুলত সেই সময়েই কিন্তু এই লঙ্কাকাণ্ড। দেকুন, পানওয়ালা শম্ভুর দোকানে এখনও কাল্লু ওস্তাদ আর তার সাকরেদ দীনার ছবি ঝুলছে। একসময় সারা শহরে কাল্লু আর দীনার খুব নামডাক ছিল।

কাল্লু ওস্তাদ তার আখড়ার সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, তারা যেন দাঙ্গায় না মাতে। বেচারাদের দেহের শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু ওস্তাদের আদেশ কী করে অমান্য করে!

দীনা তার বাড়ির বারান্দায় বৈঠকী দিচ্ছিল। ঘামে তার ঘাড় ছুটো চকমক করছে! ভেতর-বাড়ি থেকে ফুটন্ত দুধের একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আর সেই মিষ্টি গন্ধ তার খিদের জ্বালাকে দাউ দাউ করে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু পুরো এক হাজার বৈঠক না করে তো যাওয়া যায় না। এখনও দু-শ বাকী। দ্রুত নিঃশ্বাস টানতে টানতে সে বৈঠক

ভাঁজতে লাগল। শরীর থেকে তার ঘাম টপটপ করে মাটিতে পড়ে জায়গাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছিল। দীনা গুনে চলেছে, "আটশ বারো, তেরো চোদ্দ।..."

ঠিক এই সময় তার পড়শী চন্দ্রর স্ত্রী গঙ্গা চীৎকার আর চেঁচামেচি করতে করতে ছুটে এল, "হায়রে হায়, আমার ইজ্জত নিয়ে নিলো......তোর বৈঠকীতে আগুন লাগুক......ভগবান ওদের তুমি ধ্বংস কর।" বলতে বলতে সে দীনার দেউড়িতে ধপাস করে পড়ে গেল।

বৈঠক করতে করতে দীনা উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কপালের ঘাম আঙুল দিয়ে মুছে চন্দ্রের স্ত্রীর দিকে এগিয়ে এল। দেখল, রক্তে তার সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে। দীনা তাকে জিজ্ঞেস করল, "গঙ্গা বৌদি, তোমার এ কী অবস্থা!"

দীনার স্ত্রী ঘটি করে গরম দুধ নিয়ে বাইরের বারান্দায় এল। গঙ্গার অবস্থা দেখে সে চমকে উঠল। গঙ্গা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল।

"আরে কী হয়েছে তোমার, বলবে তো? কে তোমার গায়ে হাত দিয়েছে?"

গঙ্গার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল, "পাষণ্ডগুলোর মাথায় বাজ ভেঙে পড়ুক। মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না!'

দীনার স্ত্রী বুঝতে পারে কী ঘটেছে। সে তার স্বামীকে বলল, "মনে হচ্ছে মুসলমানরা মেরেছে।"

গঙ্গাকে ঝাঁকি দিয়ে দীনা চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় মেরেছে, দেখাও দেখি।...কেন তুমি মরার জন্যে বাইরে বেরিয়েছিলে? জানো না দাঙ্গা চলছে!"

দীনার কথা শুনে গঙ্গা ঐ অবস্থাতেও আরো গর্জে উঠল। "চুড়ি পর্, চুড়ি। ঘরে বসে বড় বড় কথা বলতে লজ্জা করে না।"

"আরে বলবে তো তোমার কোথায় লেগেছে, না শুধু বকবক করে মরবে।"

"দেখতে চাস? তবে ছাখ" বলে গঙ্গা বুকের আঁচল সরিয়ে তার স্তন দেখাল। তার স্তন চিরে দিয়েছে। "চোখ মেলে ভালো করে ছাখ। যা, বৌয়ের কাপড়ের তলায় লুকো গিয়ে।"

গঙ্গা আর বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ব্যথায় আর জ্বালায়

তার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল। একটা থাম ধরে সে সেখানেই বসে পড়ল এবং একটু বাদেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

দীনার চোখ ক্রোধে জ্বলে উঠল। এক অবলা নারী আজ তার শক্তিকে ধিক্কার দিচ্ছে। তার দু বাহুর পেশী থরথর করে কাঁপতে লাগল। ঝড়ের মতো একলাফে সে ঘরের কোণ থেকে তুলে নিল লাঠিটা।

দীনাকে আগলে ধরে তার স্ত্রী বলল, "এ কী করছ তুমি!"

"আমার সামনে থেকে হটে যা" বলেই দীনা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। দুধের ঘটি গড়িয়ে গিয়ে রাস্তায় পড়ল। "ওস্তাদের নামে কসম খেয়ে বলছি, আজ এ রাস্তা দিয়ে কোন মুসলমানকে জিন্দা যেতে দেব না। ওদের লাস দিয়ে এ রাস্তায় আজ পাহাড় বানাব।"

শন শন করে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে দীনা রাস্তায় বেরিয়ে এল। ভয়ে মুসলমানদের হৃদয় কেঁপে উঠল। এ রাস্তা দিয়ে আর একপা এগুতে তাদের কারো সাহসে কুলোল না।

এদিকে কাল্লু ওস্তাদ সবে দলাই-মলাই শেষ করে উঠেছে। এমন সময় সে দেখল, একটা ছোট্ট হিন্দু ছেলেকে মুসলমানরা ঘিরে ধরেছে। ছ মাসও হয়নি তার একমাত্র শিশুসন্তানটি মারা গেছে। ছেলেটাকে এ রকম বিপদে পড়তে দেখে তার পিতৃ-হৃদয় আকুল হয়ে উঠল—তার পৌরুষ দারুণভাবে আঘাত খেল। দৌড়ে সে ভিড়ের মধ্যে ছুটে গেল। হিন্দু ছেলেটাকে মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে বলল, "তোমাদের লজ্জা করে না, একটা কচি নিরাপরাধ শিশুর ওপর তোমরা বীরত্ব ফলাচ্ছ।"

একজন মুসলমান সামনে এগিয়ে গিয়ে কাল্লুর কাছ থেকে বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে করতে বলল, "ওস্তাদ, তুমি মাঝখান থেকে সরে যাও বলছি, ফল ভালো হবে না।"

কাল্লু ওস্তাদ তাকে জোরে এক ঘুসি লাগাল। লোকটি ছিটকে পড়ে গিয়ে লাঠির দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু কাল্লু ওস্তাদ তার আগেই একটা লাঠি ছিনিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভিড়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে দৃঢ় স্বরে বলল, "তোমরা সামনে থেকে সরে যাও। তা না হলে লাশ পড়বে।

ওস্তাদের নামে কসম খেয়ে বলছি, এ বাচ্চাকে আমি ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবই। দেখি কার সাধ্যি আমাকে রোখে।"

সবাই জানে কাল্লু ওস্তাদ দু কথা বলে না। সে ওস্তাদের কসম খেয়েছে। তাকে মোকাবিলা করার মতো সাহস বা শক্তি কারো ছিল না। লাঠি হাতে তুলতে না তুলতেই ভিড় নিমিষে উধাও হয়ে গেল।

কাল্লু ওস্তাদ এক হাতে ছেলেটাকে আর অন্য হাতে লাঠি ধরে হনুমান গলির দিকে এগিয়ে চলল। মুসলমান মহল্লার মানুষরা কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো তার পিছু নিল। কারণ সবাই জানে 'হনুমান গলি'র মুখ আটকে দীনু দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুরা যখন দেখল কাল্লু ওস্তাদ এক হিন্দু ছেলেকে সুরক্ষিতভাবে নিয়ে আসছে, তখন তারা জোরে জোরে হাততালি দিয়ে চারদিক মুখরিত করে তুলল।

এদিকে দীনা তার বাড়ির সামনের রাস্তা আটকে বসেছিল। কাল্লু ওস্তাদকে এগিয়ে আসতে দেখে দূর থেকেই সে চীৎকার করে উঠল, "ওস্তাদ, আর এগিও না। ঐখানেই থামো।"

কাল্লু ওস্তাদ কিছু বুঝে উঠতে পারল না। এগিয়ে আসতে লাগল।

—"ওস্তাদ, আবার বলছি, ভাল চাও তো এ রাস্তায় আজ এসো না ...ওস্তাদ, ওস্তাদ।"

কাল্লু ওস্তাদ হাসতে হাসতেই বলল, "দীনা, এ কী আবোল তাবোল বকছিস! আমি যে কসম খেয়েছি, এ বাচ্চাকে আজ ওর বাড়িতে পৌঁছে দেবই—আমাকে যেতে হবেই।"

দীনা তাকে অনুনয় করে বলল, "এই কথা ওস্তাদ? বেশ, আমিই ওকে বাড়িতে পৌঁছে দেব। কিন্তু আজকে তুমি এ রাস্তায় পা বাড়িও না।"

কাল্লু ওস্তাদও দৃঢ়কণ্ঠে দীনাকে বলল, "আমি কোল খালি করে ফিরতে পারব না। আমি আমার ওস্তাদের কসম খেয়েছি।"

দীনা রাগে ফুঁসে উঠল, "কিন্তু আমিও যে ওস্তাদের কসম খেয়েছি আজকে কোন মুসলমানকে এ রাস্তা পার হতে দেব না।"

দীনার কথা শুনে কাল্লু ওস্তাদ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "যে ওস্তাদের নাম কসম খেয়েছিস, সেও যেতে পারবে না।"

—"না, সেও না"।

কাল্লু ওস্তাদ মুচকি হাসল। হেসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে

লাঠি পাকড়িয়ে বলল; "সাবাস বেটা, এ রকম সাকরেদই চাই। আয়, এদিকে আয়। তুই তোর কসম রাখ আর আমি আমার কসম রাখি।" বলতে বলতে কাল্লু ওস্তাদ তার লাঠি তুলে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল।

দীনা পিছু হটতে হটতে কাল্লু ওস্তাদকে অনুনয় বিনয় করে বলতে লাগল, "ওস্তাদ শোনো···ওস্তাদ, আমার কথা শোনো।" কিন্তু কাল্লু তার কোন কথাই শুনতে পেল না। মুহূর্তের জন্যে দীনা থমকে গেল। তারপর তার লাঠিতে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কাল্লু ওস্তাদের লাঠিও শূন্যে শনশন করে উঠল। দুই পালোয়ানের দুই লাঠি মেঘের মতো গর্জন করতে করতে পরস্পরের ওপর শপাশপ পড়তে লাগল।

ওস্তাদ আর সাকরেদের এই লড়াইয়ের খবর দেখতে দেখতে সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। লড়াই দেখার জন্যে 'হনুমান গলিতে' হিন্দু আর মুসলমানের ভিড় উপছে পড়ল।

দুজনের লাঠির খটাখট আওয়াজ ক্রমশ বেড়েই চলল। দুজনের শরীরেই বিদ্যুৎ খেলছিল। লাঠির ঘায়ে রাস্তার তখন করুণ দশা। দুজনের দেহই রক্তে ভেসে যাচ্ছিল।

পুরো আধ ঘণ্টা ধরে জোর লড়াইয়ের পর দুজনেই রক্তে রাঙা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। জটলা তাদের দিকে এগিয়ে এল। দেহের সমস্ত শক্তি হাতে এনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল দীনা। তার পর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে কাল্লু ওস্তাদের আধমরা দেহের কাছে এগিয়ে গেল। ওস্তাদের পায়ে মাথা রেখে বলল, "ওস্তাদ ··আমাকে···মাফ···করে···দিও···"

কাল্লু ওস্তাদও দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে উঠে বসল। দীনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সাবাস বেটা, তুই আমার গর্ব।"

দীনার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। পাশে কাল্লু ওস্তাদও ঢলে পড়ল। জটলার সমস্ত মানুষ কান্নায় ভেঙে পড়ল। দু হাতে পরস্পরের জড়ানো মরদেহ দুটিকে তারা পৃথক করল। তারপর ব্যাণ্ড বাজিয়ে খুব ঘটা করে হিন্দু আর মুসলমান মিলিত ভাবে 'হনুমান গলি' থেকে কাল্লু ওস্তাদের জানাজা আর দীনার শবযাত্রা বের করল।

সেদিনের রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর আর কোন দিন সেখানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়নি।

অ জ্ঞে য়

রমন্তে তত্র দেবতা

সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎসায়ন 'অজ্ঞেয়' মূলত কবি। চিন্তাধারায় বুর্জোয়া মানবতাবাদী। এককালে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবাধ-বিচরণ। কবিতা থেকে গল্প, গল্প থেকে স্মৃতিচারণ, সর্বত্র তিনি তাঁর বলিষ্ঠ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'এ তেরে প্রতিরূপ', 'ছোঁড়া হুয়া রাস্তা' 'অপনে অপনে অজনবি' তে তাঁর দক্ষতার পরিচয় যায়। তাঁর ভাষা যেমন সচ্ছন্দ তেমনি কাব্যিক লাবণ্যে মণ্ডিত।

অক্টোবর, উনিশশ ছেচল্লিশের কলকাতা। তখন আমরা দাঙ্গায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, যখন তখন খুন-লুটতরাজের খবর পড়ে আর শিউরে উঠি না, মনেই হত না তাতে শহরের শান্তি এতটুকু বিঘ্নিত হচ্ছে। শহরের বিভিন্ন এলাকা খুদে খুদে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানে বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছিল, আর এই সীমান্ত রক্ষার জন্যে কোন শান্ত্রী ছিল না। উভয় পক্ষই জানত কোনটা কার সীমান্ত। সর্দি বসে গেলে মানুষের একটা নাক বন্ধ হয়ে যায়, অন্য নাক দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়—তাতে কষ্ট হয় সত্যি, কিন্তু মৃত্যু হয় না; ঠিক সেই রকম বসে-যাওয়া সর্দির শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো নাগরিক জীবনও বাঁটোয়ারা হয়ে গিয়েছে বলে কী এসে গিয়েছে। শুধু একটি নাকই নয়—একটি হৃদ্‌যন্ত্রও যদি বন্ধ হয়ে যেত এবং তার গলিত দুর্গন্ধ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ত আর একটি হৃদ্‌যন্ত্রকেও আক্রান্ত করত—যাক, রূপককে এতদূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার কী এমন প্রয়োজন আছে?

মাঝে মাঝে এ মহল্লায় বা অন্য মহল্লায় বিস্ফোরণ হত। আর তখন ক্ষণিকের জন্যে সেই মহল্লায় এবং আশপাশের মহল্লার জীবন স্তব্ধ হয়ে যেত, আর চালু ব্যবস্থা ভেঙে যেত এবং সেখানকার বুকের ওপর এক

আতঙ্ক চেপে বসত। কখনও কখনও দু-একদিন ধরে খারাপ অবস্থা থাকত, এ কান সে কান হয়ে কথা ছড়িয়ে পড়ত—"ও পাড়া ভালো না।" আর তখন অন্য পাড়ার লোক দু-একদিনের জন্যে সে পাড়ার দিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিত। আবার একদিন অবস্থা পাল্টে যেত—গাড়ি চলাচল শুরু হত।

হঠাৎ একদিন বেশ কয়েকটা পাড়া জুড়ে আতঙ্ক ছেয়ে গেল। এই পাড়াগুলো এমন যে, এখানে হিন্দুস্থান আর পাকিস্তানের সীমারেখা টানা সম্ভব ছিল না। পেঁয়াজের খোসার মতো প্রতিটি পরতে পরতে হিন্দু আর মুসলমান জমাট বেঁধে ছিল। ফলে আশপাশ অঞ্চলে কোন গণ্ডগোল বা গণ্ডগোলের কোন গুজব হোক,—তার উদ্ভব বা কারণ হিন্দু বা মুসলমান যেই শুনুক না কেন—তারা তাদের জানলা-দরজা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে বন্দী থাকত; যারা বাইরে থাকত তারা বাড়িতে না ফিরে বাইরেই রাত কাটিয়ে দিত। আর দু-তিন দিন ধরে বাড়ির লোক জানতে পারত না সে স্বেচ্ছায় কোথাও থেকে গিয়েছে, না রাস্তায় মারা পড়েছে···

সেই সময় আমি বালীগঞ্জের দিকে থাকতাম। এখানে শান্তি ছিল, আর কদাচিৎ তা নষ্ট হত। সব খবরই এখানে পাওয়া যেত, এমন কি ভবিষ্যতের প্রোগ্রামের কিছু কিছু পূর্বাভাসও। মন্ত্রণা এখানে হত, শরণার্থীরা এখানে আসত, আর যারা সহানুভূতির অভিলাষী তারা তাদের গল্প শুনিয়ে যেত···

সেদিন ছিল আতঙ্কের দ্বিতীয় দিন। বেলা তিনটে নাগাদ সামনের বারান্দায় একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে পথের মানুষের চলাচল দেখছিলাম। মানুষের এই চলাচলও অধ্যয়নের বিষয় হতে পারে—আর বিশেষ করে এই রকম এক আতঙ্কের সময় তা তো আরও বেশীই হবে। ঠিক এই সময় দেখলাম, আমার এক প্রতিবেশী শিখ সর্দারজী সঙ্গে তিন-চারজন শিখকে নিয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছেন। সর্দারজীর সঙ্গের এই শিখদের এর আগে কোন দিন আমি দেখিনি, তাই কৌতূহল ছিল স্বাভাবিক। তাছাড়া সর্দারজীর সঙ্গে এক দীর্ঘ কৃপাণ দেখে আরও আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। সর্দার বিশন সিং শিখ হওয়া সত্ত্বেও খুব বিনীত, শান্তিপ্রিয় এবং মুক্ত চিন্তাধারার লোক,—প্রতীক হিসেবে কৃপাণ

রাখা দরকার, তাই তিনি রাখতেন ; কিন্তু এমন উদ্ধত ঢঙে কোটের ওপর কোমরবন্ধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে কোন দিন দেখিনি।

বেশ খানিকটা পাঞ্জাবী বুলি মিশিয়ে আমি বললাম, "সর্দারজী, অজ্জ কিদ্দর ফৌজ্জা চল্লিয়াঁ নে ?" [সর্দারজী, আপনার ফৌজ নিয়ে কোথায় চললেন ?]

বিশন সিং ব্যস্ত-সমস্ত চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকালেন। যেন তিনি বলছিলেন, "জানি, তুমি যে ঢঙে কথা বলছ, তাতে মুচকি হেসে তোমার আনন্দে আমার অংশ গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছো, আমি কেমন ফেঁসে গিয়েছি······" তিনি শুধু বললেন, "পরে আসব।"

দঙ্গলটি সামনে এগিয়ে গেল।

যারা আরাম-কেদারায় বসে পথের চলাচল দেখে, প্রথমত, তারা বসে বসেই অনেক কিছু দেখতে পায় ; আর দ্বিতীয়, তারা যা কিছু দেখে তার সঙ্গে তাদের সামান্যতম গাঢ় অনুভূতিরও সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না, যে অনুভূতি মনের মধ্যে ছাপ ফেলবে। রাত্রে তিনি যখন আমার এখানে এলেন, তখন আমি বিকেলের ঘটনাটা প্রায় ভুলেই বসেছিলাম। তাই নিজের বিষয়কে চেপে রেখে বললাম, "আসুন, বসুন, খুব খুশী হলাম।"

তিনি বসে পড়লেন। খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "আজকে মনটা খুব খারাপ।"

আমি পাঞ্জাবী বুলি ছেড়ে বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, "কেন, কী হয়েছে সর্দারজী ? শরীর ভালো তো ?"

সবই ভালো এই দুর্ভাগা দেশে। ভাই সাহাব, আর কী বলব। এখানে দাঙ্গা আর খুন-খারাপ হবে না তো আর কোথায় হবে, যেখানে প্রতিদিন নতুন নতুন জায়গায় দাঙ্গা আর খুনের শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছি, আর তাতে সিঞ্চন করছি···অবাক লাগে আমাদের জাতি কিভাবে আজ বেঁচে আছে ?

তাঁর কথার মধ্যে একটা তীব্র বেদনাবোধ ছিল। ভাবলাম, যে কথা বলার জন্যে তিনি এই ভূমিকার অবতারণা করছেন, তা বলতে না

দিলে তিনি কিছুই বলতে পারবেন না। তাই তাঁর কথা চুপচাপ শুনতে লাগলাম। তিনি বলতে লাগলেন, সমস্ত মুসলমানই আরব পারস্য এবং তাতার থেকে আসেনি। শতকরা একজনকে আমরা আজকে আরব, পারস্য এবং তাতারদের বংশধর বলতে পারি। আমার ধারণা,—ধারণা না বলে আমার অভিজ্ঞতা বলতে পারেন, আরব আর ইরানীরা খুব মিশুকে এবং শান্তিপ্রিয়। তাতারদের সঙ্গে আমাদের কোন রকম সম্পর্ক সৃষ্টি হয়নি। আর বাদবাকী সমস্ত মুসলমান কারা? তারা আমাদের ভাই, আমাদের দ্বারা অত্যাচারিত নিপীড়িত, যাদের মুখ আমরা হাজার হাজার বছর ধরে মাটির ওপর ঠেসে ঘসটে দিচ্ছি। সেই—সেই মুখই আজ ওপরে উঠে আমাদের ওপর থুথু ফেলছে, তাই আমাদের খারাপ লাগছে। তারা যেহেতু মুসলমান, তাই আমরা ঘৃণায় নিজেদের ভাইদের মুখ মাটির সঙ্গে ঘসটে দিচ্ছি! শুধু ভাইদেরই বা কেন, বোনদেরও পায়ের নীচে ফেলে দলছি-পিষছি ; তাদের টুঁ শব্দটিও করতে দিইনি। কারণ টুঁ শব্দ করলে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে…"

আবেশে সর্দারজীর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, "বাবু সাহাব, আপনি হয়তো ভাবছেন, এ শিখ হয়ে মুসলমানদের পক্ষ নিচ্ছে। হ্যাঁ, মুসলমানদের সঙ্গে যদি কারো কোন শত্রুতা থেকে থাকে তা আমাদের সঙ্গেই আছে। আপনিই বলুন, মুসলমান কারা? অত্যাচারিত হিন্দুরাই তো মুসলমান। যাদের আমরা বেইজ্জত করছি, তারা যদি আমাদের ঘৃণা করে তাহলে কি খুব অন্যায় হবে? পাওনা থাকলে আমরা উসুল করে নিই না? আমার এ কথা যদি ঠিক নাও হয় তো খুঁত বের করার আমি কে? মানুষের উচিত প্রথমে তার নিজের দোষ দেখা, তার পরেই তার অন্য কিছু বলার অধিকার আসে। এ কথা কি আপনি স্বীকার করেন না?

আমি বললাম, "আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু মানুষ তো শেষ অবধি মানুষই—দেবতা নয়।"

তিনি খুব উত্তেজিত ভাবে বললেন, "দেবতা? আপনি বলছেন দেবতা? দেবতা যদি মানুষ বা দুর্দান্ত শয়তানও হতে পারত তবে বুঝতাম। শয়তানেরও একটা নিয়ম-কানুন আছে। আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি, আপনি আজকের ঘটনাটি শুনুন।"

বললাম, "বলুন, আমি শুনছি।"

"আপনি তো জানেন আমার বাড়ির পাশেই গুরুদ্বার। সেখানে সব সময়েই কিছু না কিছু লোক আশ্রয় পেয়েছে, আর আমিও সেখানে কখনও কখনও পাহারা দিয়েছি। এ কোন তারিফের ব্যাপার নয়, গুরুদ্বারকে সেবা করার নিয়ম আছে, তাই। আশ্রয় দেওয়ারও একটা রীতি চলে আসছে। তাই এই রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমরা মনুষত্বের কোন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করিনি। যাহোক, কালকে আমি শ্যামবাজার থেকে ফিরছিলাম, সেই সময় দেখলাম হঠাৎই রাস্তায় কেমন একটা নিস্তব্ধতা ঘনিয়ে আসছে। দু-একজন আমাকেও ডেকে বলল, 'বাড়িতে যাও,' দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছে।' কিন্তু তারা বলতে পারল না দাঙ্গাটা কোথায় হয়েছে। ট্রাম তো বন্ধই ছিল।

"ধর্মতলার কাছে দেখলাম, একজন মহিলা ঘাবড়ে সামনের দিকে ছুটছে। তার এক হাতে ছোট্ট একটা প্যাকেট আর অন্য হাতে ছোট্ট একটা মানিব্যাগ চেপে ধরা। সে কাঁদছিল। দেখে কোন ভদ্রঘরের মহিলা বলে মনে হল। এক মুহূর্ত ভাবলাম, তারপর ছুট দিলাম, ভয়ও একটু পেয়েছিলাম,—এই রকম একটা সময়ে একলা যাওয়াটা কি ঠিক—তাও আবার একজন বাঙালী মহিলা। ঠিক হবে না, কিন্তু তবুও তার কাছে পৌঁছে গেলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মা, তুমি কোথায় যাবে?' প্রশ্ন শুনে সে প্রথমে খুব ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু যখন দেখল আমি মুসলমান নই, একজন শিখ, তখন সে নিজেকে একটু সামলিয়ে নিল। জানতে পারলাম উত্তর কলকাতা থেকে সে আর তার স্বামী ধর্মতলায় এসেছিল। ঠিক করেছিল, দুজনে আলাদা-আলাদা ভাবে মার্কেট করে কে. সি. দাসের দোকানের সামনে সময়মতো দেখা করবে এবং তারপর বাড়িতে ফিরবে। এরই মধ্যে এই ঘটনা ঘটে গেল। নিস্তব্ধতা দেখে ভয়ে সে বাড়ি পালাচ্ছে—দাসের দোকানে আর যায় নি। রাস্তায় চাঁদনী পড়ে, শুনেছে চাঁদনী হচ্ছে মুসলমানদের এক দুর্গ।

"আমি তাকে বললাম, ভয় পেও না। আমার সঙ্গে ধর্মতলাটুকু পার হও, কে. সি. দাসের দোকানে যদি তার স্বামীকে পাওয়া যায় তো ভালো, তা না হলে সেখান থেকে নিশ্চয়ই বালীগঞ্জের ট্রাম পাওয়া যাবে। ট্রামে করে গিয়ে গুরুদ্বারে রাতে থেকে যেও। ভোরে তোমাকে

বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল, রাস্তাঘাটে বৈদ্যুতিক আলো নেই বললেই চলে, এমন অবস্থায় পাঁচ-ছ মাইল দাঙ্গার এলাকা হেঁটে পার হওয়া ঠিক হবে না।" এইটুকু বলে সর্দার বিশন সিং কয়েক মুহূর্তের জন্যে থামলেন, তারপর আমার দিকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন, আমি কি বেঠিক কিছু বলছি ? আমিই বা আর কী করতে পারতাম ?"

"ঠিক বলেছেন, আর যাওয়ার রাস্তাই বা কোথায় ছিল ?"

"না, আপনি ঠিক বললেন না। পরে বুঝতে পারলাম তাকে একলা ছুটতে দেওয়াই ঠিক ছিল।"

"কেন ?" আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"তবে শুনুন।" সর্দারজী দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বলতে লাগলেন, "কে. সি. দাসের দোকান বন্ধ ছিল। তার স্বামীর কোন নাম-নিশানাই নেই। আমি সেই মহিলাটিকে ট্রামে করে এখানে নিয়ে এলাম। আমি যে একলা মানুষ, তা তো আপনি জানেন। আমার বোন তাকে গুরুদ্বারে খাবার এবং বিছানা-পত্র দিয়ে আসে। ভোরে একজন শিখ ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে ট্যাক্সি ঠিক করি এবং তাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাই। দরজা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়তে একজন অলস প্রকৃতির ভদ্রলোক—ওর স্বামী—দরজা খুলল।"

"আপনাদের দেখে সে নিশ্চয়ই আনন্দে নেচে উঠেছিল ?"

"হ্যাঁ, নেচে তো উঠেছিলই। বৌকে দেখে নয়, আমাকে দেখে।" তারপর সে আবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিল। "ভদ্রলোক তো কে. সি. দাসের দোকানের সামনে দাঁড়ায়নি, দাঙ্গার খবর শুনে কোন বন্ধুর বাড়িতে চলে যায়। রাত্রে সেখানেই থাকে, আমরা সেখানে পৌঁছনোর কিছু আগে সে ফিরেছিল। চোখ ফোলা-ফোলা। দরজা খুলে আমাকে দেখে সে চমকে ওঠে, আর আমার পেছনে তার স্ত্রীকে দেখে মুহূর্তের জন্যে সে থমকে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

বললাম, "আগে তো এঁকে ভিতরে যেতে দিন, পরে আপনাকে সব বলছি। মহিলাটি প্রথম থেকেই শঙ্কায় মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার সে ঘোমটা সামনে টেনে দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।"

বিশন সিং আবার থামল, আমিও চুপ করে রইলাম।

তার স্বামী জিজ্ঞেস করল, "রাত্রে এ আপনার ওখানে ছিল?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমাদের গুরুদ্বারে ছিল। রাত্রে এখানে আসা সম্ভব ছিল না তাই।" সে আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আছে?" বললাম, "না, আমার বিধবা বোন আমার সঙ্গে থাকে, কিন্তু এসবে আপনার কী দরকার?"

সে আমার কথার কোন জবাব দিল না। সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার স্ত্রীকে বাংলায় জিজ্ঞেস করল, "জানি না, রাত্রে তুমি কোথায় থেকেছ, সকালে এখানে আসতে তোমার লজ্জা করল না?" সর্দার বিশন সিং বলতে বলতে থেমে গিয়ে আমার দিকে তাকালেন।

আমি বললাম, "নীচ কোথাকার!"

বিশন সিং-এর মুখের ওপর এক দরদভরা হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। বললেন, "না জানি সেই লোকটিকে আমি করতাম—আর ভাবছিলাম, না জানি মহিলাটি কী জবাব দেয়। কিন্তু মেয়েদের এই জবাব না দেওয়াটাই যে কত বড় জবাব আজকালকার মানুষ তা কী করে বুঝবে? পেছনে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম— দেখলাম মহিলাটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে তোলার জন্যে ঝুঁকলাম, কিন্তু সেই লোকটি আমাকে এমন এক থাপ্পড় দিল যে, আমার হাত নিশ্চল হয়ে গেল। আমি শুধু তাকে বললাম, 'ওকে ওঠাও, জলের ছিটে দাও…' সে একটুও নড়ল না, তার ডাগর ডাগর চোখ ছোট হতে হতে শুকনো কাঠের মতো হয়ে গেল। তারপর সে ধীরে ধীরে দরজা বন্ধ করে দিল।"

আমি স্তব্ধ হয়ে শুনছিলাম। বলার কিছুই খুঁজে পেলাম না।

"লোকজন জমতে লাগল। মহিলাটির কথা চিন্তা করে বেশী ভিড়ভাট্টা যাতে না হয় তাই আমি চাইছিলাম। ড্রাইভারের সাহায্যে আমি মহিলাটিকে ট্যাক্সিতে তুলে বাড়িতে নিয়ে এলাম। বোনকে মহিলাটির দেখাশোনার ভার দিয়ে বাবা বচিতর সিং-এর কাছে গেলাম—তিনি বয়োবৃদ্ধ এবং গুরুদ্বারের ট্রাস্টি। সেখানে আমরা সবাই মিটিং করে পরামর্শ করলাম কী করা যায়। কেউ কেউ বলল, ঐ লোকটিকে শেষ করে দাও, কিন্তু তাতে বিধবাটির কোন সুরাহা হবে না। তারপর

ঠিক হল গুরুদ্বারের পক্ষ থেকে পাঁচজনের একটি দল মহিলাটিকে নিয়ে সেই লোকটির কাছে যাবে। এবং তাকে বলবে একে ঘরে না তুললে মনে করা হবে তুমি গুরুদ্বারকে বেইজ্জত করছ—তোমাকে কেটে ফেলা হবে।"

"তাই কালকে বেলা তিনটের সময় আপনারা ওখান থেকে ফিরছিলেন।..."

"হ্যাঁ, আপনি জানেন তো, আমি কখনও অমন ভাবে কৃপাণ ঝোলাই না। কোন এক যুগে যে কারণে গুরুরা কৃপাণ ঝোলানোকেই ধর্ম বলে ফতোয়া জারি করেছিলেন, আজকে হলে তাঁরা হয়তো রাইফেল ছাড়া আর কিছু ঝোলাতে বলতেন না। শুধু প্রতীকের এই মোহ নিজের দুর্বল হৃদয়কে লুকনো ছাড়া আর কী হতে পারে। যাক, আমরা তো মহিলাটিকে নিয়ে গেলাম। আমাকে দেখে প্রথমে কিছু লোকের ভিড় জমে গেল, তারপর পুরো দঙ্গলটা দেখে সেই লোকটির বুদ্ধি খেলে গেল। সে আমাকে বলল, "ঠিক আছে, সব আপনাদের মেহেরবানি।" তারপর সে মহিলাটিকে বলল, "চলো, ভিতরে গিয়ে বসো।" আমাদের ভিতরে যেতে বা বসতে বলল না...বললেও কি আমরা ঐ শয়তানের ঘরে বসতাম।"

"মেয়েটি ভিতরে চলে গেল? কোন কিছু বলল না?"

"কী আর বলবে? জ্ঞান ফেরার পর থেকে তার মুখে কোন শব্দ ছিল না। তার চোখ দুটো যেন কেমন ভাবহীন হয়ে গিয়েছিল। সেই চোখের কাছে চোখ নিয়ে দেখলে শুধুমাত্র একটা প্রাচীর ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। আমি আর তার কাছে দাঁড়াতে পারছিলাম না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। আমরা যখন তাকে বললাম, 'যাও মা, ঘরে যাও...' তখন সে যন্ত্রচালিতের মতো দু-এক কদম এগুলো। সে তার স্বামীর রাগে ফুলে ওঠা-নামা-করা নাকের দিকে একবারের জন্যেও তাকাল না, না তাকিয়ে সে মাথা নীচু করে এক পা-এক পা করে এগুতে লাগল আর ক্রমশ দুমড়ে-মুচড়ে যেতে লাগল। দেউড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই সে টলতে টলতে বসে পড়ল। ভাবলাম, সে মাথা ঘুরে পড়ে যাবে; বসতে না বসতেই চৌকাঠের সঙ্গে তার মাথা ঠুকে গেল, কোনমতে সে নিজেকে সামলে নিল। সে বসে পড়ল, আমরা

তাকে ঐখানে ঐভাবে ছেড়েই চলে এলাম।"

আমরা দুজনেই অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না।

খানিকক্ষণ বাদে সর্দার বিশন সিং বলল, "ভাই সাহাব, কিছু বলুন।"

আমি বললাম, "ছেড়ে দিন, ব্যাপারটা তো কোন রকমে শেষ হয়ে গিয়েছে। লোকটা তো তাকে ঘরে তুলে নিয়েছে..."

বিশন সিং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল। "বাবু সাহাব, আপনি সত্যি সত্যি বলছেন?"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কেন? এতে মিথ্যের কি আছে?"

"আপনি কি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন ব্যাপারটা এখানেই শেষ হয়ে গিয়েছে?"

আমি তোতলাতে তোতলাতে বললাম, "না, ঠিক তা মনে করি না। আমাদের জন্যে ভালোয় ভালোয় শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ওর জন্যে নয়।"

"আমাদের পক্ষেই বা কী এমন ভালো? ছেড়ে দিন এখন। বলুন, ঐ ম'হলার কী হবে?"

আমি প্রতিটি কথা মেপে মেপে বললাম, "বাঙলা দেশে প্রায় রোজই খবরের কাগজে দেখা যায়, ননদ আর শ্বাশুড়ীর অত্যাচারে বৌ আত্মহত্যা করেছে, বিষ খেয়েছে বা কুয়োয় ঝাঁপ দিয়েছে। আর... কখনও কখনও বা বউয়ের কাপড়ে আগুন লেগে অ্যাকসিডেন্ট হয়—শুধু আগুন কেরোসিন তেলে..."

"মাফ করবেন, তা হয়তো হতে পারে। আমি একটু কটু কথা বলতে পছন্দ করি। আপনি হিন্দু বলেই বলছি, আপনি যদি কিছু মনে না করেন। আপনি হিন্দু, তাই আপনি এভাবে ভাবছেন। ওরা মারা যাবে, না হয় পালাবে। হিন্দু ধর্ম উদার, না? এ ধর্ম মারে না, মরার জন্যে সমস্ত রকম সুবন্দোবস্ত করে দেয়। এতে দু ধরনের লাভ আছে—এক, কখনও ভুলভ্রান্তি হয় না, আর দ্বিতীয়, দয়ারও পথ আছে। কিন্তু আপনি আমাকে বলুন, পুরুষ যদি পশু হয়, তবে নারী কিভাবে দেবী হয়? 'দেবতা' শব্দটি আমি ভেবেচিন্তেই বলছি। কারণ মানুষের ন্যায়-বিচার তো দেবতাদের চেয়ে অনেক অনেক ওপরে স্থান

পেতে পারে। দেবতারা সুদ নেয় না সত্য কিন্তু পাই-পয়সা উসুল করে নেয়।…বলুন, নেয় কি না?"

আমি বললাম, "সর্দারজী, আপনি আঘাত পেয়েছেন বলে এই ধরনের কড়া কড়া কথা বলছেন। ঐ লোকটি ভালো এ কথা আমি বলছি না। বলছি একজন লোককে দেখে গোটা হিন্দুদের ওপর অপবাদ দিচ্ছেন।"

"এ কি শুধু একজন মানুষের ব্যাপার? যখন ভাবি, ঐ লোকটির মধ্যে কি কোন ন্যায়বোধ আছে, তখন দেখি সেই মহিলাটি পরিত্যক্তা হয়ে মুসলমান হয়েছে। মুসলমান হয়ে সে এমন মুসলমানের জন্ম দেয় যে হাজার হাজার হিন্দুকে মারার জন্যে কসম খায়। আপনি তো সাইকোলজি পড়েছেন, সুতরাং আপনি বুঝবেন, হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে সত্যি সত্যি তাই-ই করা হয়—যে মিথ্যা অপবাদ তার মার ওপরে দেওয়া হয়েছে! দেবতাদের ন্যায়বিচার চিরদিন ধরে তো এভাবেই চলে আসছে—নিপীড়নের এক-একটি বীজ চিরদিনের জন্যে হাজার হাজার বিষাক্ত গাছের জন্ম দিয়েছে। তা না হলে এই জঙ্গল এখানে কিভাবে জন্মেছে—যে জঙ্গলে আজ আমি আপনি সবাই হারিয়ে গিয়েছি। জানি না এখান থেকে আর বেরুতে পারব কি না। আমরা প্রতিদিন কয়েক-বার করে নিপীড়নের নতুন বীজ বপন করছি—আর তা থেকে যখন চারা হচ্ছে, তখন আমরা চীৎকার করে বলছি : মাটি আমাদের সঙ্গে বেইমানি করেছে।"

আমি অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে রইলাম। সর্দার বিশন সিং-এর কথাগুলি যেন চামড়ার নীচে কাঁকর হয়ে দলাই মলাই করতে লাগল। পরিবেশ কেমন থমথমে হয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁকে হাল্কা করার জন্যে বললাম, "শিখ কমিউনিটির শিভ্যালরি বিখ্যাত। বুঝতে পারছি, এই হতভাগিনীর দুঃখ আপনার শিভ্যালরিকে আঘাত করেছে।"

উঠতে উঠতে তিনি বললেন, "আমার শিভ্যালরি!" কিছুক্ষণ পরে তিনি এমন এক স্বরে কথাটি বললেন—যে স্বরে ছিল এক অদ্ভুত ধরনের গোঙানি "ভাই সাহাব, আমার শিভ্যালরি!"

তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কিন্তু আমি দেখতে পেলাম, তাঁর ঠোঁট ব্যথায় থরথর করে কাঁপছে।

রাঙ্গেয় রাঘো

ঘরের খোঁজে

রাঙ্গেয় রাঘো হিন্দি সাহিত্যের অন্যতম কথাশিল্পী। নবীন এবং প্রবীণের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক যোগসূত্র রচনা করে চলেছেন। এক সময় তিনি প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। লিখেছেন অসংখ্য উপন্যাস এবং ছোটগল্প। এবং আজও দাপটের সঙ্গে লিখে চলেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনায় মধ্যে জনমানস-বিশেষ করে নীচুতলার মানুষ বারবার উঠে এসেছে। দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক শোষণ এবং উৎপীড়ন। 'কব তক পুকারু' এমনই এক উপন্যাস। 'রাই আউর পর্বত'-এ এ'নেছেন এক নতুন মূল্যবোধ। দক্ষিণ ভারতের মানুষ হয়েও তিনি হিন্দি ভাষাকেই তাঁর সাহিত্য প্রতিভার মাধ্যম করে নিয়েছেন।

যখন কোনখানে একটা ঘরের সন্ধান মিলল না, তখন আমরা কোন উপায় না দেখে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "সত্যি খোঁজ করেছিলে?"

আমি রাগে ঠোঁট কামড়িয়ে বললাম, "গিয়েছিলাম, চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু কেউ-ই কথায় কোন কান দেয় না। এরা আবার নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়!"

বোন জিজ্ঞেস করল, "এখন তবে কী করা যাবে?"

আমি রাগে জ্বলে উঠলাম, "বিষ খেয়ে নে।"

তারপর স্টেশনের সামনে যে গাছ, সেই গাছের ছায়ার নীচে আমরা আশ্রয় নিলাম। এখানে আমরা ঘুমনোর কোন ব্যবস্থা করলাম না, বলা যায় পড়ে রইলাম।

অনেক, অনেক দিন হয়ে গেল। সব কিছুই আমি ভুলে যেতে চাইলাম। যার কাছেই যাই, সেই-ই টালবাহানা করে। যাদের শক্তি-সামর্থ্য এবং টাকা-পয়সা আছে, তাদের কোন হৃদয়ের বালাই নেই। আর যাদের হৃদয় আছে এবং আমাদের মতো শরণার্থী নয়, তাদের কোন শক্তি নেই।

ঘরের জন্যে উদ্বিগ্নতা ক্রমেই বেড়ে চলল। কতোদিন আর এই গাছের নীচে দিন গুজরানো যায়! যারা যাযাবর তাদের অন্তত মাথা গুঁজবার মতো একটা তাঁবুটাবু আছে, আমাদের তাও নেই। বাচ্ছাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। লিভার বড় হয়ে গিয়েছে। ওর মা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু কাঁদে। গোটা কয়েক ইট-পাথর জোগাড় করে উনুন বানিয়ে নিয়েছি। সেই উনুনে খোকার মা খাবার বানায়। আর আমি দিনমজুরি করি। দিনমজুরি করে যা পাই তাতেই কোন রকমে চালিয়ে নিই।

নোংরা মজুররা ক্লান্ত হয়ে যেখানে বসে বিশ্রাম নেয়, আমিও সেখানে বসি। শহরের অবস্থা ভালো নয়। হিন্দু এবং মুসলমানরা দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়েছে। হামিদ আমাকে প্রতিদিন জিজ্ঞেস করে, "বলো তো কোথায় যাওয়া যায়?"

"পাকিস্তানে যাও, পাকিস্তানে।"

"পাকিস্তানে গেলে কী পাব?"

বলেছিলাম, "আমি এখানে যা পেয়েছি, তাই-ই পাবে।"

আমাকে আর একটি কথাও জিজ্ঞেস না করে হামিদ চলে গেল। ভাবতে লাগলাম, আমি কি ঠিক-ঠিক জবাব দিইনি। এরপর আমি আর বিশেষভাবে কিছু ভাবতে বা চিন্তা করতে পারলাম না।

একটা ঘর………।

মাথার ওপর আচ্ছাদন……।

একটা আশ্রয়……।

বাচ্ছাটা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। বজ্জাতটা কিছুই বোঝে না। ওর মা ওকে চুপ করায়—সান্ত্বনা দেয়। অবশেষে ও ঘুমিয়ে পড়ে।

আমি বললাম, "পাগড়ি (সেলামি) চায়। সবার মাথা নাঙ্গা হয়ে গিয়েছে কিনা!"

"কত চায়?"

"তিনশ—পাঁচশ এরকম।"

বোন কোন কথা বলল না। স্ত্রী বলল, "বেশী ভাড়া দিলে দেবে না?"

"এমন দরদী মানুষ কোথায় পাবে?"

বোন বলল, "গাছের নীচেই কাটিয়ে দেব।"

স্ত্রী প্রতিবাদ করে বলল, "শীতের সময় কী হবে।"

বাচ্ছাটা আবার কেঁদে উঠল। আমি বিরক্তিতে খিঁচিয়ে উঠলাম। "না, ও আমার মরণ না দেখে কান্না থামাবে না দেখছি।"

বোন ওর কান্না থামায়। আমরা আবার কথা বলতে শুরু করি।

"আগে জানলে কি আর এখানে পড়ে মরতে আসি ?"

আমি কম্পিত কণ্ঠে বললাম, "এখন তো আর ফিরে যাওয়া যায় না।"

বোন বলল, "মানুষ আর মানুষ নেই। কোন শরণার্থীকেই না হয় বলো না।"

"তারা তো যে যার বোঝাতেই পিষে মরছে।"

"নতুন নতুন বাড়ি নাকি তৈরি হচ্চে ?"

"হ্যাঁ।"

তারপর আবার রাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এল। স্ত্রী হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্ছাকে বুকের দুধ দিতে লাগল। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা যন্ত্রণায় চিবোতে শুরু করল।

স্ত্রী বোন বাচ্ছা—সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আকাশে অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে। শহরের সমস্ত আলো নিভে গিয়েছে। কোথাও কোথাও দু-একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠছে। আমি ঘুমে ঢুলছিলাম।

পাশ ফিরে শুতে গিয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উনুন থেকে গল-গল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভোর হয়ে গিয়েছে। রেললাইনের ধারে স্তূপাকার গুঁড়ো কয়লা আর সেই কয়লার ধোঁয়ার মধ্যে মানুষদের অস্পষ্ট ধোঁয়াটে চেহারা ভেসে উঠেছে। কোদাল দিয়ে তারা কী যেন খুঁড়ছিল।

উঠে আমি পুলের নীচে গিয়ে বসলাম। এক্কা আর টাঙ্গা এপথ দিয়েই সবসময় যাওয়া-আসা করে। পুলের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড দুম-দড়াম শব্দ করতে করতে রেলগাড়ি যায়। কংক্রিটের তৈরি পুল। পুলের দু-ধারের প্রাচীর থেকে ফলওয়ালা আর চাটওয়ালারা বসে ফেরি করে। ওদের গলাফাটা চীৎকারে মনে হয় যেন এটা কোন রেল-স্টেশন। এই প্রাচীরের সামনেই একফালি জায়গা পড়ে রয়েছে। জায়গাটা ভিখি-

রিতে গিজগিজ করছে। নোংরা শতচ্ছিন্ন ভিখিরির দঙ্গল দেখে আমার মনটা বেদনায় হাহাকার করে ওঠে। দারিদ্র. নগ্নতা এবং পরাজয়ের ভারে এরা নুয়ে পড়েছে। এদের তুলনায় আমি তো অনেক—অনেক ভালো আছি। এরা হাত প্রসারিত করেই রয়েছে। আর পথচারীদের পেছনে পেছনে ছুটছে। ভিখিরিদের এই দঙ্গলে একজন যাযাবরী আছে রাত্রে সে ওদের সঙ্গে ঐখানেই ঘুমোয়। এক সাধুবাবা তার খাবার থেকে ওকে ভাগ দেয়। সবাই সাধুবাবার পেছনে লাগে। কিন্তু সে টু শব্দটিও করে না। আমিও তাকে ঘৃণা করতাম। কারণ বেশ কিছুদিন হল সাধু-বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ফলে সে খুব চীৎকার করে। এখন কেউ-ই তার দিকে ফিরে তাকায় না।

এইভাবে ধীরে ধীরে আমি আমার দুঃখবোধকে যখন সয়ে নিতে পেরেছি সেই সময় এক প্যাঁড়াওয়ালা অ'মাকে বলল, "তোমার কাছে কি কোন টাকা-কড়ি নেই? তবে কংগ্রেসে নাম লেখাচ্ছ না কেন?"

"হাঁ যাব, গেলে কি পাওয়া যাবে?"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর সে আমাকে দেয় না। হঠাৎ-ই আমার মনে হয়, 'শরণার্থী কমিটি'র একজন সেক্রেটারি আছে। জানি না সে কে। আমি বিরাট এক জুতোর দোকানের এক কংগ্রেসী নেতার সঙ্গে দেখা করি। সে আমাকে বলে, "তুমি তো শরণার্থী নও, পুরুপার্থী।"

"যার মাথার ওপর এক টুকরো চাল নেই, সে আবার পুরুপার্থী!"

"ও তুমি"—একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম।—"ভেবেছ, এখানে কোন ভরসা আদায় করবে! না ভাই, না, কাজকর্ম করে খাও। অসু-বিধায় কে না পড়েছে।"

একজন ব্যঙ্গ করে বলল, "তোমারও নিশ্চয়ই গোটা কুড়ি বাড়ি ছিল? সমস্ত পাঞ্জাবী শরণার্থীই দেখছি লাখোপতি। খুঁজলে একজন গরিবকেও পাওয়া যাবে না।"

"ঠিক বলেছ ভাই, ঠিক বলেছ। আমরা তো ভাই এখানেও গরিব ছিলাম। এখানে বসে মনে যা আসে বলে নাও। তাতে কী যাবে আসবে? তোমাদের ওপর যদি বিপত্তি নেমে আসত তবে বুঝতে পারতে।" বলে এক পাঞ্জাবী ঠেলাওয়ালা জোরে হেসে উঠল। ওর কণ্ঠে এক তীক্ষ্ণ ক্রোধের জ্বালা ছিল।

কমলাওয়ালা বলল, "তবে আর কী, ঐখানে যেমন ছিলে এখানেও তেমনিভাবে থাকো। আমরাই বা এমন কী ভালো আছি। জিনিসপত্রের দামে পিষে যাচ্ছি। আমাদের মনই জানে আমাদের অবস্থা। বাচ্চা-কাচ্চারা কিছু চাইলে দিতে পারি না।"

হতাশায় মাথা কাত করে সে আবার বলল, "ভাই, গরিবরা চিরকাল গরিবই থাকবে।"

পাঞ্জাবী ঠেলাওয়ালা ঠেলাটা একটু ঠেলে হেসে উঠে বলল, "গরিবরা তবে মরবে?"

আমি ওদের কথা শুনছিলাম।

আর একজন হেসে বলল, "এখন মেহনত করে খাওয়ার দিন নয়, ব্ল্যাকমার্কেটের দিন।"

"শেঠদের দিন এসেছে। ওরা আজাদ হয়ে গিয়েছে।"

আমি শুনছিলাম। কণ্ঠে কেমন একটা আক্রোশ—কেমন একটা ক্ষুব্ধতা।

"শালারা কী রকম হু হু করে মুটিয়ে গিয়েছে। পুলিশও ওদের সঙ্গে রয়েছে।..."

"সবই টাকার জোর ভাই।"

"এই হচ্ছে স্বাধীনতা।" বলতে বলতে পাঞ্জাবী ঠেলাওয়ালা জোর এক ধাক্কা দিয়ে ঠেলা এগিয়ে নিয়ে গেল। শুধু চাটওয়ালার গলার আওয়াজ চারদিক গমগম করছে। হয়তো এতক্ষণে রুটি তৈরি হয়ে গিয়েছে। আমার বেশ খিদে পেয়েছিল।

একটি কথারও জবাব না দিয়ে আমি চুপচাপ ফিরে এলাম।

খেতে শুরু করলাম। বোন বলল, "দাদা, আর কতোদিন এভাবে চলবে।"

"তোরা কি ভেবেছিস আমি বাড়ি খুঁজছি না?"

'তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন?'

"ঢাক পেটালেই কি বাড়ি পাওয়া যাবে?"

মনে মনে ঠিক করলাম, কাল থেকে আমিও ঠেলা ঠেলব।

খাবার-দাবার খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, "তুমি আবার বেরুচ্ছ?"

"একটা কিছু কাজের খোঁজ করি।"

ভীত-সন্ত্রস্ত কণ্ঠে সে বলল, "আজকের দিনটা ভালো মনে হচ্ছে না, দাঙ্গা হতে পারে।"

আমি কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, "আর হতে কী বাকী রয়েছে।"

ও আর একটা কথাও বলল না। আমি বেরিয়ে পড়লাম।

সারা শহর তেরঙা ঝাণ্ডাতে ছেয়ে গিয়েছে। চারদিকে সুন্দর সুন্দর পতাকা পতপত করে উড়ছে। কোথাও কোন রেষারেষি বা ভেদাভেদ নেই। পনেরোই আগস্ট এসেছে। সবাই পালাচ্ছে। হিন্দুদের একটা দল মুসলমানদের ওপর হামলা করছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হামলা দেখছে। ইচ্ছে করছিল এই লুটে আমিও সামিল হয়ে যাই। কিন্তু লুট করতে গিয়ে যদি মারা যাই? মারা গেলে ছেলে স্ত্রী বোনের কী হবে! লড়াইটা আগে শেষ হয়ে যাক। লড়াই শেষ হয়ে গেলে যা পড়ে থাকবে তাই নিয়ে পালাব।

একটা মিছিল বেরিয়েছে। সাদা-টুপি-পরা অজস্র মানুষ সেই মিছিলে সামিল হয়েছে। অধিকাংশই ভুঁড়িওয়ালা দোকানদার। এদের গর্দান গর্বে কেমন একটু বেঁকে গিয়েছে। দেখে গা ঘিনঘিন করছিল। অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড়ে নিজেকে বেশ কুণ্ঠিত মনে হচ্ছিল। শহরে লুট-তরাজ চলছে। আমিও পালালাম। দৌড়তে দৌড়তে থমকে দাঁড়ালাম। গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। গুলির ঠাস ঠাস আওয়াজ। আর তার সঙ্গে চলেছে হৈ হৈ শব্দ।

আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এলাম। আমাকে আবার গুলি করে মেরে না ফেলে। গুলি চলছিল। কেন গুলি চলছিল? আজ স্বাধীনতা দিবস না?

মুসলমানরা ভয়ে বিহ্বল। কোথায় পালাবে? কী করবে?

আমি যখন মুসলমানপাড়ার কাছে এসে হাজির হলাম, তখন সেখানে কোন সাড়াশব্দ নেই—কেমন একটা নিস্তব্ধতা। রাস্তায় মিলিটারি টহল দিচ্ছে। তাদের ভারি বুটের ঠকঠক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। বন্দুকের নল ঝকমক করছে।

দুর্গের বাইরে সার্কাসের অনেকগুলো তাঁবু খাটানো হয়েছিল।

সার্কাসের একটা মুসলমান মেয়েকে দাঙ্গাবাজরা জবরদস্তি করে টেনে নিয়ে গেল। কারণ মেয়েটি মুসলমান। মেয়ে হয়ে জন্মে ও অপরাধ করেছে। বাঘের পিঠের ওপর মেয়েটি দাঁড়াত, হাতির পিঠে চড়ে নাচত। শুনলাম ওরা ওর ইজ্জত নেবার পরে হত্যা করেছে। আমার কোন খারাপ লাগেনি। কিন্তু ওর কথা ভেবে আমি এত কাঁপছি কেন? কেন আমি ভয় পাচ্ছি?

হাঁফাতে হাঁফাতে আমি যখন গাছের কাছে এলাম, দেখলাম, আমার স্ত্রী ভয়েতে এবং চারপাশের নিস্তব্ধতায় কেমন শিঁটিয়ে গিয়েছে। আমার বোন বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। দূর থেকে দেখলাম, সার্কাসের ম্যানেজার—যে কিনা হিন্দু, অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে বাঁচাতে পারল না। ওখানে তখন যেন লুট-তরাজের তাণ্ডব চলছে। চারদিকে শনশন করে হাওয়া বইছে—ধ্বংসের হাওয়া।

বোন জিজ্ঞেস করল, "কোথায় গিয়েছিলে?"

বললাম, "লুট করতে গিয়েছিলাম।"

"কী নিয়ে এসেছ?"

"ঐখানে গুলি চলছে।"

আমাদের কথায় স্ত্রীর কান খাড়া হয়ে গেল।

আমি তখনও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। ও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আমাকে বলল, "তুমি গুণ্ডা!"

আমি ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম। "কী, আমাকে বলছ!"

"হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। লুট-তরাজ কারা করে?" বলতে বলতে ও আমার পাশে এসে দাঁড়াল। আমাকে দু হাত দিয়ে ধরে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল, "জানো, আজকে তোমার বোনকে হিন্দুরা উঠিয়ে নিয়ে যেত!"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন?"

"ওরা ওকে মুসলমান বলে মনে করেছিল। পাজামা পরেছিল, তাই। দেখে, আমি চীৎকার করতে লাগলাম। তখন একজন বলল, আরে ছেড়ে দাও, এ তো সিন্ধি শরণার্থী।"

এমন সময় একজন পুলিস এল। দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। ওকে দেখে কেমন কুঁকড়িয়ে গেলাম। পুলিস দেখে একজন লোক আমাদের দিকে

এগিয়ে এল। সে পুলিসকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার জমাদার সাহেব?"

সিপাইটি হাসতে হাসতে বলল, "শালাকে দেখ, তামাম জায়গায় কার্ফু লেগে গিয়েছে, আর এ ব্যাটা মেয়েছেলে নিয়ে এখানে গেড়ে বসে আছে।"

আমি গলা ছেড়ে চীৎকার করে বললাম, "মাথা গুঁজবার কোন জায়গা পাচ্ছি না, কী করব।"

সেই চর্বিওয়ালা লোকটি বলল, "কী করবে, বেচারা শরণার্থী। গরিব বলে মনে হচ্ছে।"

"আরে বাবা, ও কথা বলবে না, সবার কাছেই মালকড়ি আছে। ওপার থেকে নিয়ে এসেছে।"

"জমাদার সাহেব, এ ঠিক নয়। হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই-ই নিয়ে চলে এসেছে।" বলতে বলতে সেই লোকটি আমার পরিবারের ওপর এক নজর বুলিয়ে নিল। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, "এই-ই তোমার পরিবার? আর কেউ নেই?"

আমার স্ত্রী বলল, "না বাবু, আর কেউ নেই। তুমি আমাদের একটু সাহায্য করো না, ভগবান তোমার ভালো করবেন।"

"আরে, কাঁদছ কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। এ তো তোমাদের নিজেদের রাজ। ভয় পাচ্ছ কেন?"

লোকটির কথায় একটা সমবেদনা ছিল। ও বলে চলেছিল, "এতদিন ধরে যত শরণার্থী এসেছে, তাদের কোন না কোন একটা ব্যবস্থা হয়েই গিয়েছে। চিরদিন কি আর আপদ-বিপদ থাকে। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।" বলতে বলতে লোকটি আমার বোনের ওপর চোখ বুলোচ্ছিল। ওর তাকানোর ধরন দেখে আমার বোন লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। ওর চোখে লালসার বিষ ছিল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এ কেমনতর মানুষ যে লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসে আছে। দেখলাম, বোন ভয়ে কেমন গুটিয়ে গিয়েছে। লোকটি আবার বলল, "তা জমাদার সাহেব, ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপার হচ্ছে, কার্ফু লেগে গেছে। রাতে যদি কেউ দু-টুকরো করে রেখে যায়? বেটা দু-টুকরো হয়েই খোয়াব দেখবে। এখানে এমন

ভাবে আস্তানা গেড়েছে, যেন নিজের বাড়ি।" জমাদারের কথা শুনে লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। সিপাইটি আবার বলল, "ওঠো, ওঠো এখান থেকে। ভাগো।"

আমার স্ত্রী চীৎকার করে বলে উঠল, "কিন্তু যাব কোথায় ?"

সিপাইটি অশ্লীল একটা গালি দিল। গালি শুনে আমার দেহের রক্ত রাগে আর ঘেন্নায় চনমন করে উঠল।

"এ কী ! এভাবে খিস্তি করবে না বলে দিচ্চি।"

সিপাইটি বলল, "শালা বেশী কথা বলবি তো ছাল-চামড়া টেনে ছিঁড়ে নেব। এই কুত্তিকে এখান থেকে নিয়ে যা বলছি। আজকাল কুত্তার সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে…।"

জমাদারের কথা শুনে লোকটি খিকখিক করে হেসে উঠল। "চল, চল, আমার সঙ্গে চল।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং সেই লোকটার পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম। ইচ্ছে করছিল একটা পাথর ছুঁড়ে সিপাইটির মাথা থেতলিয়ে দিই। কিন্তু স্ত্রী বোন আর বাচ্চাটির কথা মনে করে…

লোকটি বলে চলেছে, "পুলিস এমনই হয়। ব্যাপার কী জানো, সরকার এদের লাগাম ছেড়ে দিয়ে রেখেছে। আর লাগাম ছেড়ে দিতেও হয়, নইলে লোকে মানবে কেন ? ওর কথায় কিছু মনে কোরো না।"

আমি চুপচাপ হেঁটে চলেছি। কথা বলতে বলতে ও চুপ হয়ে গেল। আমরা এ-গলি সে-গলি ধরে এগিয়ে চললাম।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "অমন মুখ গোমড়া করে আছ কেন ?"

আমার সঙ্গে সেই লোকটি বেশ দরদভরা কণ্ঠে জবাব দিল, "বেচারা বিপদে পড়েছে…।"

একটি সরু গলিতে এনে লোকটি আমাকে হাজির করল। গলির একদিকে বাড়িগুলোর উঁচু উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের ওপর তেরঙা ঝাণ্ডা পতপত করে উড়ছে। তেরঙা পতাকা পতপত করে উড়তে দেখে আমার চোখে-মুখে খুশির ঝিলিক খেলা উচিত ছিল। কিন্তু আমার মধ্যে কোন আবেশই সৃষ্টি হল না।

আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "এই—এই তোমার ঘর ?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ ভাই, এইটিই আমার ঘর। এই দেখো রাস্তার

ওপর জলের কল আছে। এখান থেকে জল নেবে।" তারপর সে আমার বোনের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলল, "অন্দরে যে জলের কল আছে, তুমি সেখানে যেতে পার। আমি ব্যবস্থা করে দেব। ভেতরে আমিই থাকি। গুদাম আছে কিনা। ঐখান থেকেই জল নিও, ভিড়ভারাক্কা ধাক্কাধাক্কি নেই।"

আমার স্ত্রী আনন্দে চীৎকার করে উঠল। ওর চোখ দুটি খুশিতে ঝকমক করছিল। ঘরের সন্ধান পাওয়ায় ও কী খুশীই না হয়েছে। ওরা যদি না থাকত তবে আমার কোন চিন্তা-ভাবনাই ছিল না। যেখানে সেখানে দিন গুজরিয়ে দিতাম। ওরা দুজন আমাকে কেমন নিস্তেজ আর দুর্বল করে দিয়েছে। কোন উপায়ও নেই। এমন কেউ নেই যে পাশে এসে দাঁড়াবে।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার স্ত্রী সেই লোকটিকে বলল, "ভাই, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তোমার উপকার আমরা কোন দিন ভুলব না।"

লোকটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, "শেঠজীর কাছে কাজ করবে?"

বিস্ময়ে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ওকে বললাম, "না, আমি ঠেলা চালাব।"

আমার উত্তর শুনে মুহূর্তে লোকটির গলার স্বর পালটিয়ে গেল। ও ঘরটার দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, "কত টাকা দেবে?"

"কত টাকা মানে? ভাড়ার কথা জিজ্ঞেস করছ?"

লোকটি মিচকি হেসে বলল, "শেঠজীর সেলামি আর আমার মেহনতের দাম।"

ওর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম। বললাম, "তুমি না হিন্দু!"

"কেন পাকিস্তানে কি এসব চলে না! মুসলমানরা তো সেখান থেকেও পালিয়ে এদিকে আবার আসছে।" হাসতে হাসতে কথাগুলো ও আমাকেই বলছিল। কিন্তু বারবার ঘুরে ঘুরে বোনের দিকে তাকাচ্ছিল। এমন কুৎসিত ভাবে তাকাচ্ছিল, যেন ওকে খেয়ে ফেলবে। বোন মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি বললাম, "আরে, আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলো।"

কিন্তু লোলুপ দৃষ্টিতে ঐভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, "এতটুকু

ক্ষমতা নেই যখন শেঠজীর সেলামি দেবে কিভাবে? পাঁচশ টাকা লাগবে। বুঝেছ?" লোকটি বেশ কঠোর হয়ে উঠেছিল। আবার বলল, "পাঁচশ লাগবে। গতকালই একজন সাড়ে চারশ বলে গিয়েছে। ওর বোন নেই বলে ওকে দিইনি।" মনে হচ্ছিল ও খুব কিছু সাংঘাতিক কথা বলছে না। আমার দিকে ঘুরে বলল, "এতে এমন কী হয়েছে? কেউ জানতে পারবে না।"

আমি দু হাতে মাথা ধরে বসে পড়লাম। আমার চোখের সামনে স্ত্রী বাচ্চা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। এমন গল্প যে শুনিনি তা নয়, মাথা গোঁজার ঠাঁই দেওয়ার পরে বিভিন্ন উপায়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে কাজ হাসিল করেছে। আর এ জানোয়ার তো দেখছি সোজাসুজি মুখের ওপর বলছে। আমার সাদাসিধে আর পবিত্র বোন সম্পর্কে এমন কথা বলার সাহস পাচ্ছে।

সে কথা কিনা আমাকেই বলছে! বলতে পারছে তার কারণ আজ আমি নিরুপায়।

আমার রাগ যতই চড়ে যাচ্ছিল আমার হাতের শক্তি ততই যেন লোপ পাচ্ছিল। সমস্ত শরীর যেন ঝিমঝিম করছিল। মনে হচ্ছিল হাতের সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে। আমি যেন স্থির পাথরের চোখ দিয়ে দেখছিলাম।

বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। বোন নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। ওর দুচোখ যেন কান্নায় ফেটে পড়তে চাইছিল। কিন্তু চোখে একফোঁটাও জল ছিল না। শুধু জ্বলছিল। লোকটি তখনও বেপরোয়া ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে—যেন দুচোখ দিয়ে ওকে গিলে চলেছে।

আমার স্ত্রী একবার লোকটির দিকে তাকাচ্ছে, আর একবার বোনের দিকে। আর সেই সঙ্গে এক-একবার ঘরটির ওপর চোখ গিয়ে থমকে যাচ্ছে। ঘৃণা সংশয় ভয় ওর চোখে কাঁপতে কাঁপতে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘরের ওপর চোখ পড়তেই ওর চোখ দুটি ঝিলিক দিয়ে উঠতে লাগল। তারপর ও আমার বোনের দিকে এক বিবশ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইল, যেন ওর কাছে কিছু ভিক্ষে চাইছে। বোনও যেন ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারল। মুহূর্তে সে চোখ নামিয়ে নিল। আমার

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে ওর আর সাহস হল না। কিন্তু ওরা দুজনে একফোঁটাও কাঁদল না। কারণ এ তো মৃত্যু নয়—অন্য কিছু। কিন্তু সেই অন্য কিছু কী ?

আমি চীৎকার করে উঠলাম, "না, ও না।" নিজের অজান্তেই আমার চোখ দুটি আমার বোনের ওপর থেকে সরে স্ত্রীর ওপর গিয়ে থমকে গেল। যেন আমি একজনের পরিবর্তে আর-একজনকে পেশ করছি। কারণ আমি জানি আমার স্ত্রী তো আমারই। ওর ওপর আমার হক আছে। ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই-ই হল। স্ত্রী আমার কথার কোন প্রতিবাদ করল না। শুধু আমার দিকে একবার তাকাল। তারপর বাচ্চার দিকে।

গোটা পৃথিবীটা যেন এক লহমায় থমকে দাঁড়ায়। মন বিদ্রোহ করে উঠল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে আমি যেন বসুমতীকে দুভাগ করে দিতে পারি। আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি !

ধীরে ধীরে আমার সম্বিৎ ফিরে এল।

আমার স্ত্রী হঠাৎ লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি একাই, না…"

"হ্যাঁ, আমি একাই।"

"এখানেই থাকব, ভাড়া বলো।"

"পনেরো টাকা ভাড়া তুমি কিভাবে দেবে ? সাড়ে সাত টাকা দিও। এর কম হবে না। পয়সা-কড়ি তো তোমাদের কাছেও আছে।"

অন্যান্য শরণার্থীরা পয়সা-কড়ি নিয়ে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু আমরা তো পাকিস্তানেও গরিব ছিলাম। এখানেও গরিব। তবে কেন পালিয়ে এলাম ?

এ আমি কী দেখছি। আমার স্ত্রীর চোখে মুখে কোন ভয়-ডরের চিহ্ন নেই। ও নিজেকে এর মধ্যে সামলিয়ে নিয়েছে। বোনকেও তেমনি মনে হল। চোখের ইশারায় সে যেন কোন কিছু বোঝাতে চাইছে।

ও যেন নিজের বক্তব্য, বাস্তব অবস্থা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। কী কষ্টই না ওকে সহ্য করতে হয়েছে। আর সেই কষ্ট সহ্য করতে করতে আজ ও একখণ্ড শিলাতে পরিণত হয়েছে। নিজেকে এমন করে বলি দেবে ? মৃত্যু অত সহজ নয়। ও কেন মরবে ?

মৃত্যুই যদি ও সত্যি সত্যি চাইত তবে ঘর ছেড়ে কি পালাতে পারত না? শৈশব যেখানে কেটেছে, সেখানকার প্রতিটি রাস্তাঘাট ওর জানা। আর এখানে আমরা মানুষের মতো দেখতে জানোয়ারদের মধ্যে বিচরণ করছি। এরা কেউ আমাদের আপনার লোক নয়।

আর ঐ লোকটি হেসেই চলেছে। মনে হচ্ছিল ওকে খুন করে দিই। গলা টিপে হত্যা করি। ওর চোখদুটো আঙুল দিয়ে উপড়ে ফেলি—চোখ তো নয়, যেন এক বিরাট পাপ দাউদাউ করে জ্বলছে। আর চোখের দুই কোটর মাটি দিয়ে ভরাট করে দিই। মনে হচ্ছিল ওর বুক ফেড়ে ফেলে দিয়ে রক্ত চুষি। না, আমি কিছুতেই সায় দিতে পারছি না। এ আমি কোন দিনই সহ্য করতে পারব না। এতদিন যেভাবে যাযাবরের মতো ঘুরেছি, তেমনি ভাবে যাযাবর জীবন কাটাতে পারব।

কাল থেকেই আমি ঠেলা চালাব। ঠেলার ওপরই শোব। ঠেলার নীচে ঘর-সংসার পাতব। কিন্তু ঠেলা রাখব কোথায়? বিশেষ করে এই কার্ফুর দিনগুলোতে…?

কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তারা বড় বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। কাশ্মীরে লড়াই চলছে। জিজ্ঞেস করেছি, "বাবু, জিনিস-পত্রের দামে যে পিষে যাচ্ছি।"

উত্তরে সে আমাকে বলেছিল, "পরে আবার এসো।"

আমি ফিরে এলাম।

লোকটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বোন ফিসফিস করে তাকে কী যেন বলছে। জানি না, বোন তাকে কী বলছে। লোকটি চলে গেল। চলে যাওয়ার সময় ওকে খুব গদগদ মনে হল। ওর চোখ দুটি ঝিলিক দিচ্ছিল। শুনতে পেলাম, এই ঘর দেওয়ার জন্যে শেঠজী ওর ওপর খুব তম্বি করবে। কখনও সখনও পুলিসের ভয়ে বা কনট্রোলের সময় এই ঘরে গমের বস্তা লুকিয়ে রাখা হয়। এখন সেই ভয় নেই। তবু তো এই জায়গাটা ওদের কাজের। ইচ্ছে করলে এই ঘরের জন্যে ও হাজার টাকা চাইতে পারত।

এর পরে আর কিছু না বললেও আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ঘরের জন্যে তো বোনেরও একটা দায়িত্ববোধ আছে। বোন হঠাৎ বলে উঠল, "সেলামি দিতে হবে না।"

"কে জানে?" আমার স্ত্রী ভয়ে ভয়ে বলল, যাতে আমি ব্যাপারটা খারাপভাবে না নিই। তারপর সে গলা নামিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত মাথা গোঁজার অন্তত একটা ঠাঁই হল। সরকারের কাছ থেকে তুমি এ জায়গাটা লিখে নিও।"

আমার স্ত্রী একেবারে ছেলেমানুষ। লিখে নেওয়া কি এত সহজ! এ শেঠজীর বাড়ি।

আমি গলির বাইরে পা বাড়ালাম। তিনজন কথা বলছিল। আমি তাদের আলোচনা শুনছিলাম। খুব সম্ভব আশপাশের বাড়ির চাকর।

"কজন মারা গিয়েছে?"

মোটা গলায় একজন বলল, "কে আর গুনেছে!"

"হিন্দু একজনও মরেনি।"

"কিন্তু দাঙ্গা তো মুসলমানরাই শুরু করেছিল।"

"এ দাঙ্গা রোখার মতো শক্তি কারো নেই।"

এরপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ নেই; সবারই মুখের কথা ফুরিয়ে গিয়েছিল।

"তুমি শরণার্থী?"

বললাম, "হাঁ।"

"ভাই, গমের কনট্রোল হবে।"

একজন মহিলা বলল, "সত্যি?"

"গলির ভেতর যাও, গলির ভেতর। অবস্থা খুব খারাপ। কখন কী হয়ে যায় কে জানে।"

"কেন, কী হয়েছে?

"যে যার বাড়িতে যাও, পুলিস এসে পড়ল বলে।"

ঠিক সেই সময় কয়েকজন চীৎকার করতে করতে ছুটে পালাল। "বাড়িতে ঢুকে পড়ো, পুলিস আসছে। সঙ্গে মিলিটারি। গুলি চালাবার হুকুম হয়ে গিয়েছে। ওরে বাবারে।"

আমি বিবশ হয়ে গেলাম। আজ আজাদির দিন। যারাই হাঙ্গামা করুক না কেন, আমাকেই মুশকিলে পড়তে হবে। চারদিকে তাকালাম। ফটাফট সব দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ পালাচ্ছে। চারদিক অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছে।

কী করব, আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ঘরের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন আমারও ঘর ছিল।

বড় বড় ট্রাকগুলো শহরে এসে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছে। চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজে চারদিক থরথর করে কাঁপছে। ট্রাক-ভর্তি খাঁকি উর্দি-পরা সৈনিকরা উদ্গ্রীব হয়ে আছে। এরা গুর্খা সৈনিক। কোন দয়া-মায়া নেই। হাতে বন্দুক। আমি জানি, এরা না আমার কথা বুঝবে, না আমার হৃদয়। গুলি চালাতে এদের মতো নিষ্ঠুর আর নেই। মগজ বলতে কোন পদার্থ নেই।

বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন স্লোগান দিচ্ছিল, "স্বাধীন হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ।"

আমি পালালাম। অন্ধকার নেমে আসছে। একটা অস্পষ্ট কুয়াশা-কুয়াশা ভাব থিরথির করে কাঁপছে। রাস্তাঘাট নিস্তব্ধ। কোথাও কোন টুঁ শব্দটিও নেই। তেরঙা ঝাণ্ডা গর্বে মাথা উঁচু করে আছে। আমার মধ্যে আবার আশা এবং বিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আসছিল। আশ-পাশের কোন মহল্লা থেকে গুলির শব্দ ভেসে আসছে।

সামনেই আমার ঘর দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে গিয়ে অন্ধকারে একটা কিসের সঙ্গে যেন আমি ধাক্কা খেলাম। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম। যার সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল সেও পড়ে গেল। যে পড়ে গিয়েছিল তার মুখ থেকে একটা যন্ত্রণার শব্দ বেরিয়ে এল। আমি ধীরে ধীরে উঠে তাকালাম, তাকে টেনে তুললাম। সে উঠল। উঠে আমাকে বলল, "তোমার লাগেনি তো! এত তাড়াতাড়ি কেন এলে?"

"না, পালিয়ে এলাম।"

যার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে আমার স্ত্রী। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কেন, কী হয়েছে?"

"কার্ফু শুরু হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ করে দাও।"

"এখন না, একটু দাঁড়াও। এখানে পুলিস কিছু বলবে না। একটু পরেই দরজা বন্ধ করে দেব।"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, "কেন? ঘরের মধ্যে অন্ধকার কেন?"

ও বিব্রত বোধ করল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, "চুপ করো, শেঠজীর লোক আছে। ওর কাছে কার্ফু'র পাস রয়েছে।"

সব বুঝতে পারলাম। আমি ঘুমিয়ে আছি, না ছিটকে পড়েছি। আমার স্ত্রী বলে চলেছে, "জানি, তুমি সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু… আমাকে ওর পছন্দ নয়।…

ও যা বলছিল, তা নিজের কান দিয়েই শুনছিলাম। আমার রক্ত জল হয়ে গেল।

আমার স্ত্রী বলে চলেছে, "কে আর জানবে? থাকার জায়গা একটা হয়ে যাবে।" তারপর সে যেন আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "সেলামি আর দিতে হবে না। বিদেশ-বিভুঁয়ে আমাদের আর কি ইজ্জত আছে।"

সাদাত হোসেন মণ্টো

গুরমুখ সিং-এর উইল

সাদাত হোসেন মণ্টোর জন্ম, অমৃতসরের সোমরালা গ্রামে ১৯১২, ১২মে। তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে হিন্দু-মহাসভা কলেজে ভর্তি হন। এই সময়েই সমাজবাদী লেখক বারী আলিগের সঙ্গে পরিচয় হয় এবং তাঁর বিপ্লবী আদর্শে প্রভাবিত হন। বারী সাহেবের সম্পাদিত 'খুলুক'-এ তাঁর প্রথম গল্প 'তামাশা' প্রকাশিত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড নিয়ে এ গল্প লেখা। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি বেশ কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। ১৯৪১, এ অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে চাকরি নেন। পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্রে কাহিনীকার হিসেবে যোগ দেন। 'গানজে ফারিশতা' তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র। 'আটদিন' ছবিতে তিনি নিজে অভিনয়ও করেন। দেশ বিভাগের পর লাহোর চলে যান। ১৯৫৫, ১৫ জানুয়ারী মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে এই দুর্ধর্ষ কথাশিল্পীর মৃত্যু হয়।

প্রথমে টুকটাক চাকু-চালাচালি, তারপর দু-তরফের জোর লড়াইয়ের খবর আসতে লাগল। এই লড়াইয়ে চাকু, কৃপাণ, তলোয়ার এবং বন্দুক বেপরোয়া চলল। কখনও কখনও বা দেশী বোমা ফাটার খবরও আসতে লাগল।

অমৃতসরের অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা ছিল এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেশী দিন স্থায়ী হবে না। আপাতত উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, এই উৎসাহ উদ্দীপনা মিইয়ে গেলেই অবস্থা আপসে-আপ ঠিক হয়ে যাবে। এর আগেও এরকম দাঙ্গা অমৃতসরে বার কয়েক হয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা বেশী দিন চলেনি। খুব বেশী হলেও মেরেকেটে দশ-পনেরো দিন, তারপর অবস্থা শান্ত হয়ে থিতিয়ে পড়েছে। এর আগে যে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তার সঙ্গে তুলনা করে লোকে মনে করেছে কিছুদিনের মধ্যেই দাঙ্গা থিতিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু তা না হয়ে অবস্থা দিন দিন আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল।

হিন্দুপাড়ায় যেসব মুসলমান থাকত, তারা পাড়া ছেড়ে পালাতে লাগল। আর মুসলমানপাড়ায় যেসব হিন্দু থাকত, তারা তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে সুরক্ষিত জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে শুরু করল। কিন্তু

এ ব্যবস্থা যে অস্থায়ী তা বুঝতে কারো অসুবিধা হল না। কারণ দাঙ্গার এই যে বিষক্রিয়া—এই বিষক্রিয়াতে সব-কিছু জ্বলেপুড়ে খাক না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত শান্তি আসবে না।

মিঞা আবদুল হাই একজন রিটায়ার্ড সাব-জজ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে। আর তাই তিনি খুব একটা উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেননি। তাঁর এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলের বয়স বছর এগারো আর মেয়ের সতেরো। আর ছিল বহু পুরনো এক চাকর। বয়স প্রায় সত্তরের কাছাকাছি। খুবই ছোট্ট পরিবার। দাঙ্গা শুরু হওয়ার পর মিঞা সাহেব ঘরে বেশ কিছু রেশন মজুত করলেন। ঘরে খাবার মজুত থাকায়—তিনি অন্তত এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। খোদা না করে, অবস্থা খারাপের দিকে গেলে—দোকান-পাট যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তাঁকে কোন মুসিবতে পড়তে হবে না। কিন্তু তাঁর ভরা-যুবতী মেয়ে সুগরা খুবই চিন্তিত। তাঁর তেতলা বাড়ি। অন্যান্য বাড়ির চেয়ে বেশ উঁচু। চিলে-কোঠা থেকে শহরের তিন-চতুর্থাংশ বেশ ভালোভাবেই নজরে আসে। আজ কয় দিন ধরে সুগরা দেখছে আশপাশে কোথাও না কোথাও আগুন জ্বলছে। প্রথম প্রথম ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টার ঠনঠন শব্দ শোনা যেত। এখন আর তাও শোনা যায় না। আর তাই আগুন বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে ক্রমশ।

রাতের দৃশ্যগুলো একটু ভিন্ন ধরনের। ঘুটঘুটে অন্ধকারে আগুনের বিরাট বিরাট হলকা চোখে পড়ে। মনে হয় যেন কোন দেবতার মুখ দিয়ে আগুনের ফোয়ারা ছুটছে। আর কিম্ভুত কিম্ভুত আওয়াজ শোনা যায়—'হর হর মহাদেও' আর 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনি মিলে মিশে এক ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে।

সুগরা ভয়ে শিটকিয়ে এ ঘটনা আর তার বাবার কানে তোলেনি। তোলেনি, কারণ এর আগেও সে বলেছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, ভয়ের কোন কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। মিঞা সাহেবের বলার ধরনই এমন—যেন কিছুই হয়নি। বাবার এইরকম কথা বলার ধরনে তার মধ্যেও কিছুটা ভরসা আসত। কিন্তু যখন বৈদ্যুতিক তার কেটে দিল এবং জল বন্ধ হয়ে গেল তখন সুগরা মিঞা সাহেবকে তার উদ্বেগের

কারণ জানাল। ভয়ে সন্ত্রস্ত সুগরা বলল অন্তত কিছু দিনের জন্যে হলেও শরিফপুরে চলে যেতে। কারণ শরিফপুরেই প্রতিবেশী মুসলমানরা যাচ্ছে। মিঞা সাহেব তাঁর যে রায় সেই রায়েই অটল রইলেন। বললেন, "মিছিমিছি তুই ভয় পাচ্ছিস কেন? অবস্থা খুব তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে।"

কিন্তু অবস্থা ঠিক না হয়ে বরং আরও খারাপের দিকে গেল। যে পাড়ায় মিঞা আবদুল হাই থাকতেন, সেই পাড়ার মুসলমানরা পাড়া উজাড় করে পালিয়ে গেল। আর এদিকে ভগবানের অসীম কৃপায় এক দিন মিঞা সাহেব পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। ছেলে বশরত আগে একা-একাই গোটা বাড়িতে উপরে নীচে ছোটাছুটি এবং নানারকম খেলা খেলত। কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সে বাবার খাটিয়ার ধরে বসে পড়ল এবং অবস্থার গতি অনুভব করার চেষ্টা করতে লাগল।

তাদের বাড়ির লাগোয়া বাজার। সেই বাজার একেবারে নিস্তব্ধ। ডাক্তার গুলাম মোস্তাফার ডিসপেন্সারি বহুদিন থেকে বন্ধ পড়ে রয়েছে। গুলাম মোস্তাফার ডিসপেন্সারি ছাড়িয়ে ডাঃ গুরাদিত্তার ডাক্তারখানা। ঝুল বারান্দা থেকেই সুগরা দেখল, তাঁর ডিসপেন্সারিতেও তালা ঝুলছে। এদিকে মিঞা সাহেবের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক। কী করবে সুগরা কিছুই বুঝতে পারল না। কিছুই সে চিন্তা করতে পারছিল না। বশরতকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে সে বলল, "খোদার দিব্যি দিয়ে বলছি, বশরত, এখন তুমিই কিছু একটা উপায় করো। জানি এখন বাইরে বেরোলে খুব বিপদ। কিন্তু তোমাকেই যেতে হবে—কাউকে ডেকে আনো। আব্বার অবস্থা খুবই খারাপ।"

বশরত বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু বেরুতে না বেরুতেই সে আবার ছুটে ফিরে এল। ওর মুখ কেমন হলুদের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। চকে রক্তে লতপত একটা লাশ সে দেখতে পায়। আর সেই লাশের কাছেই এক দঙ্গল মানুষ একটা দোকান লুট করছে। সুগরা ভয়ে জড়সড় তার ভাইকে দু হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। এবং অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে। আর এদিকে বাবার যে অবস্থা তাও সে আর সহ্য করতে পারছিল না। মিঞা সাহেবের বাঁ অঙ্গে কোন অনুভবশক্তি

ছিল না। যেন তাতে প্রাণের কোন চিহ্নমাত্র নেই। কথাও কেমন জড়িয়ে গিয়েছিল। বেশীর ভাগ সময়েই তিনি ইশারায় কথা বলতেন। ইশারায় তিনি যেন বলতেন, সুগরা, ভয়ের কোন কারণ নেই। খোদার মেহেরবানিতে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই ঠিক হল না। রোজার মাস শেষ হয়ে আসছিল। আর মাত্র দুদিন বাকী। মিঞা সাহেবের ভরসা ছিল, ঈদের আগেই অবস্থা বিলকুল ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মনে হচ্ছিল, ঈদের দিনই যেন কেয়ামতের দিন আসছে। কারণ চিলেকোঠা থেকে শহরের প্রায় সব জায়গায় ধোঁয়া—কেবল ধোঁয়া দেখা যেত। রাত্রে বোমা ফাটার এমন বিকট আওয়াজ শোনা যেত যে সারা রাত্রি একদণ্ডের জন্যেও সুগরা আর বশরত দুচোখ এক করতে পারত না। এমনি বাবার সেবাশুশ্রূষার জন্যে সুগরাকে রাত জাগতে হত। কিন্তু এখন এই বোমা ফাটার বিকট আওয়াজ যেন তার মগজে গেঁথে বসে গিয়েছে। একবার সে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার দিকে তাকাত, আর একবার ভীত-সন্ত্রস্ত তার ভায়ের দিকে। আর সত্তর বছরের বুড়ো চাকর আকবর—সে বাড়িতে থাকা আর না-থাকা দুই-ই সমান। সারা দিন-রাত নিজের ঘরে পড়ে খকখক কেশেই চলেছে আর গাদায় গাদায় কফ ফেলছে।

একদিন সুগরা রাগে দিশেহারা হয়ে তাকে গালিগালাজ করে বলল, "তুমি কোন কম্মের নও। দেখতে পাচ্ছ না মিঞা সাহেবের কী অবস্থা। তুমি হচ্ছ এক নম্বরের নিমকহারাম। এখন যখন মিঞা সাহেবের জন্যে কিছু করা দরকার তখন তুমি কাশতে কাশতে দম বন্ধ হওয়ার ভড়ং দেখাচ্ছ। যারা সত্যিকার নোকর তারা প্রভুর জন্যে নিজেকে বলি দিতেও দ্বিধা করে না।"

সুগরা গালিগালাজ দিয়ে তার মনটাকে কিছুটা হালকা করে চলে গেল। কিন্তু পরে তার খুব অনুতাপ হল। কী প্রয়োজন ছিল এই গরিব বেচারাকে গালিগালাজ করার। রাত্রে আকবরের জন্যে একটা থালাতে খাবার বেড়ে সে যখন তার ঘরে গেল, দেখল আকবরের ঘর খালি। বশরত সমস্ত ঘর তোলপাড় করে খুঁজল। কিন্তু আকবরকে পাওয়া গেল না। সদর দরজার খিল খোলা। সুগরা বুঝতে পারল, মিঞা সাহেবের জন্যে সে বাইরে গিয়েছে। সুগরা খোদার কাছে মোনাজাত করল, খোদা

ওর যেন কিছু না হয়। দুদিন পেরিয়ে গেল। কিন্তু আকবর আর ফিরে এল না।

সন্ধ্যার সময়। এমন অনেক সন্ধ্যা সুগরা আর বশরত দেখেছে। যে সন্ধ্যায় ঈদের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। আকাশে একচিলতে চাঁদ দেখার জন্যে তারা কত উৎসাহ আর আকুতি নিয়েই না তাকিয়ে থাকত। পরের দিন ঈদ। আজকে শুধু চাঁদকে প্রার্থনা করার দিন। এই চাঁদকে এক ঝলক দেখার জন্যে তারা দুজনেই কত উতলা থাকত। আকাশে যেখানে চাঁদ ওঠে সেখানে যদি ঘন মেঘ দিয়ে ঢেকে যেত, তবে কী রাগই না তাদের হত। কিন্তু আজকে সারা আকাশ ধোঁয়ার মেঘে ঢেকে গিয়েছে। সুগরা আর বশরত দুজনে চিলেকোঠায় চড়ল। দূরে কোন কোন বাড়িতে অন্ধকারের মধ্যে মানুষজনের আবছা মূর্তি দেখা যাচ্ছিল। বোঝা যাচ্ছিল না তারা চাঁদ দেখছে, না, ধিকধিক আগুন দেখছে।

আজ যেন চাঁদও বেশ কুশলী হয়ে উঠেছে। ধোঁয়ার যে পুরু পর্দা তার ফাঁক দিয়ে সে মুখ বাড়াল। সুগরা দু' করতল তুলে প্রার্থনা করল, খোদা, তুমি মেহেরবানি করে আমার আব্বাজানকে সুস্থ করে দাও। আর বশরতের এমন রাগ হচ্ছিল যে, কী এক হাঙ্গামা এসে ঈদের এই সুন্দর দিনটাকেই মাটি করে দিয়ে গেল।

দিন তখনও পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েনি। সন্ধ্যার যে অন্ধকার তা তখনও তেমন গাঢ় হয়নি। জল-ছিটানো উঠনে মিঞা সাহেবের চারপাই পেতে দেওয়া হয়েছিল। চারপাইয়ের ওপর তিনি নিস্পন্দের মতো শুয়ে ছিলেন: তাঁর চোখ দুটি আকাশের দিকে স্থির নিবদ্ধ। কী যেন ভাবছিলেন। ঈদের চাঁদ দেখে এসে সুগরা তাঁকে সেলাম করল। উনি ইশারাতে সুগরাকে উত্তর দিলেন। সুগরা মাথা ঝোঁকালে, যে হাতে বল আছে সে হাত তুলে তিনি ওর মাথায় স্নেহে হাত বুলাতে লাগলেন। সুগরার দু-চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। মিঞা সাহেবেরও দু-চোখ জলে ভরে উঠল। তিনি সুগরাকে সাহস দেওয়ার জন্যে অনেক কষ্টে জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "আল্লাহ-তআলা সব ঠিক করে দেবে।"

ঠিক এই সময় সদর দরজায় কেউ ঠকঠক করল। মিঞা সাহেব সুগরাকে বললেন, "দেখ তো, কে এসেছে।"

সুগরা ভাবল, হয়তো আকবর ফিরে এসেছে। তার দু চোখ আনন্দে চকমক করে উঠল। বশরতের হাত ধরে বলল, "মনে হচ্ছে আকবর এসেছে। একবার গিয়ে দেখে এসো।"

সুগরার কথা শুনে মিঞা সাহেব মাথা নাড়িয়ে যেন বললেন, 'না, না, আকবর নয়, অন্য কেউ।'

সুগরা তার বাবাকে বলল, 'আকবর না হলে আর কে হতে পারে আব্বা ?'

মিঞা আবদুল হাই তাঁর কণ্ঠের সমস্ত শক্তি দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি কিছু বলার আগেই বশরত ফিরে এল। ভয়ে সে কাঁপছিল। বড় বড় নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। বশরত সুগরাকে এক ধাক্কা দিয়ে চারপাই থেকে সরিয়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "একজন শিখ এসেছে।"

সুগরা ভয়ে চীৎকার করে উঠল : "শিখ ! কী বলছিস ?"

বশরত বলল, "দরজা খুলতে বলছে।"

সুগরা এক ঝটকায় বশরতকে টেনে জড়িয়ে ধরল। বাবাকেও চারপাইয়ের ওপর এক লহমায় তুলে বসিয়ে দিল। এবং ভাবলেশহীন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ মিঞা সাহেবের পাতলা দুই ঠোঁটের ওপর এক অদ্ভুত মিষ্টি হাসি খেলে গেল। বললেন, "যাও, দরজা খুলে দাও···গুরমুখ সিং এসেছে।"

বশরত প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, "না, গুরমুখ সিং নয়, অন্য কেউ।"

মিঞা সাহেব নিশ্চিত ভাবে আবার বললেন, "সুগরা, দরজা খুলে দাও, গুরমুখই এসেছে।"

সুগরা উঠে দাঁড়াল। গুরমুখ সিংকে সে চেনে। পেনসন নেওয়ার আগে তার বাবা এই শিখের একটা কাজ করে দেন। ব্যাপারটা কী ঘটেছিল তা সুগরার অত ভালোভাবে মনে নেই। বোধ হয় তাকে এক মিথ্যে মামলা থেকে তার বাবা বাঁচিয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রতিটি রমজানের ঈদের আগের দিন সে রুমালী সেওই-এর এক থলি নিয়ে তাদের বাড়িতে আসে। তার বাবা বহুবার তাকে বলেছেন, "সর্দারজী, আপনি কেন মিছিমিছি এই কষ্ট করেন ?' হাত জোড় করে সে বলত,

"মিঞা সাহেব, বাহে গুরুজীর কৃপায় আপনার সব কিছুই আছে। এ এক সামান্য উপহার। আমি জনাবের খিদমতের জন্যে এর বেশী আর কী করতে পারি। আপনি আমার জন্যে যা করেছেন, আমার একশ পুরুষও সে ঋণ শোধ করতে পারবে না। ভগবান আপনার ভালো করুন।"

প্রতি বছর ঈদের আগের দিন গুরমুখ সিং সেওই-এর থলে নিয়ে আসত। তার এই আসা সুগরার এত পরিচিত যে, আজকে সে কেন তার ঠকঠক শব্দ শুনেও বুঝতে পারল না। বশরতও দশ বছর ধরে তাকে দেখে আসছে। ও কেন বলল, গুরমুখ সিং নয়; অন্য কেউ এসেছে। আর কেই-ই বা হতে পারে। ভাবতে ভাবতে সুগরা সদর দরজার কাছে গেল। দরজা খুলবে, না এখান থেকে জিজ্ঞেস করবে, 'কে'। এমন সময় আবার দরজায় ঠকঠক আওয়াজ হল। সুগরার বুক ভয়ে জোরে জোরে ওঠা-নামা করতে লাগল। কোনরকমে সে গলা দিয়ে আওয়াজ বের করে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

বাইরে থেকে আওয়াজ এল, "আজ্ঞে···আজ্ঞে···আমি···আমি সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে···সন্তোখ।"

সুগরার সাহস কিছুটা ফিরে এল। বেশ নম্রতা এবং ভদ্রতার সঙ্গে সে বলল, "আপনি কিভাবে এলেন?"

বাইরে থেকে জবাব এল, "সাহেব কোথায়?"

সুগরা বলল, "তিনি অসুস্থ।"

সর্দার সন্তোখ সিং ব্যথিত হয়ে বলল, "ওহ্···" তারপর সে কাগজের ঠোঙায় একটা খরখর শব্দ করে বলল, "সেওই নিয়ে এসেছি···সর্দারজী পরলোক গমন করেছেন···মারা গিয়েছেন।"

সুগরা জিজ্ঞেস করল, "মারা গিয়েছে?"

বাইরে থেকে জবাব এল, "আজ্ঞে হাঁ···গত এক মাস হল মারা গিয়েছেন···মারা যাওয়ার আগে বলে গেছেন, 'দেখ, জজ সাহেবের জন্যে দশ বছর ধরে রমজানের ঈদে সেওই নিয়ে যাই। আমার মৃত্যুর পর এ কাজ তোমাকে করতে হবে।' আমি তাকে ওয়াদা দিয়েছি···ওয়াদা রাখতে এসেছি···সেওইটা নিন।"

সন্তোখ সিং-এর কথা শুনে সুগরার দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে

পড়তে লাগল। দরজাটা সে একটু ফাঁক করল। সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে সেওই-এর ঠোঙাটা সামনে এগিয়ে ধরল। সুগরা ঠোঙাটা এক হাতে নিয়ে বলল, "খোদা, সর্দারজীকে দীর্ঘায়ু করুন।"

গুরমুখ সিং-এর ছেলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, "জজ সাহেব কি অসুস্থ ?"

সুগরা বলল, "জী, হাঁ।"

"কি অসুখ হয়েছে ?"

"পক্ষাঘাত।"

"ইস,...সর্দারজী যদি বেঁচে থাকতেন, শুনলে খুব দুঃখ পেতেন... মৃত্যুর আগেও জজ সাহেবের কথা বলেছেন। বলতেন, জজ সাহেব মানুষ নন, দেবতা।...ভগবান যেন তাঁর আয়ু দেন।...ওঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।"

সন্তোখ সিং এই দু-চারটি কথা বলে উঠোন থেকে আবার রাস্তায় নামল।...সুগরা একবার মনে মনে ভাবল, ওকে বলে—জজ সাহেবের জন্যে একজন ডাক্তার ডেকে দিতে।

সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে সন্তোখ সিং জজ সাহেবের বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা এগুতেই চারজন লোক তাকে ঘিরে ধরল।

দুজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। আর দুজনের হাতে কেরোসিনের টিন এবং আগুন লাগানোর অন্যান্য জিনিস।

তাদের একজন সন্তোখ সিংকে জিজ্ঞেস করল, "কী সর্দারজী, তোমার কাজ হয়ে গিয়েছে তো ?

সন্তোখ মাথা কাত করে বলল, "হাঁ, হয়ে গিয়েছে।"

লোকটি বেশ দেমাকের সঙ্গে হেসে জিজ্ঞেস করল, "তবে এখন জজ সাহেবের মামলা ঠাণ্ডা করে দিই।"

"হাঁ...তোমাদের যা মর্জি কর," বলে সর্দার গুরমুখ সিং-এর ছেলে হাঁটতে শুরু করল।

রমেশচন্দ্র সেন

সাদা ঘোড়া

রমেশচন্দ্র সেনের জন্ম অধুনা বাংলা দেশের বরিশাল জেলায়। ছাত্র জীবন শুরু হয় টোলে। প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পাশ করেন। কিছু দিন কলেজে পড়েন। উত্তরাধিকার সূত্রে কবিরাজী ব্যবসা শুরু করেন। এই বৃত্তির জন্যে তাঁকে গ্রাম-গঞ্জে ঘুরতে হয়। আর আসেন অজস্র মানুষের সংস্পর্শে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শতাব্দী'। 'শতাব্দী' নিয়েই তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। এপিকের সমস্ত গুণাবলীই 'শতাব্দী'তে আছে। 'কাজল'—তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, 'ইয়ামা দি পিটের' সমতুল্য। 'সাদা ঘোড়া', 'কোষ্টা কি পাশা,' বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ সংযোজন। এমন দরদী—হৃদয়বান লেখক বাংলা সাহিত্যে আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ।

দাঙ্গার সময়ের একটি ঘটনা।

ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন রক্তস্নানের পর কলিকাতার অবস্থা একটু শান্ত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ পল্লীতে কিছুটা নিঃসংকোচে বাহির হয়। কিন্তু কেমন যেন থমথমে ভাব।

একদিন বৈকালে শূন্য ঠিকাগাড়ির স্ট্যাণ্ডে সাদা একটি ঘোড়া দেখা গেল। ধবধবে সাদা, শরীরের কোথাও একটা দাগ পর্যন্ত নাই। চামরের মতন তার সুন্দর ল্যাজের গোছার উপর রোদ ঝলমল করে।

প্রাণীটি যেন পথভোলা এক পথিক। এ পাড়ায় আগে কেহই তাকে দেখে নাই। আশ্রয় হারাইয়া, আশ্রয়দাতাকে হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষুধার জ্বালায় খালি রাস্তা শোঁকে। তার নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে পথের ধুলা ওড়ে। কিন্তু বেচারী কোথাও কিছু পায় না। শুধু আবর্জনার দুর্গন্ধময় স্তূপ শুঁকিয়া শুঁকিয়া মুখ ফিরাইয়া নেয়।

জানালা দিয়া দেখিয়া শীলার মা বলিলেন, আহা বেচারী হয়তো কিছুই খেতে পায় না। সইস কোচোয়ান ফেলে পালিয়েছে।

তাঁর নববিবাহিতা মেয়ে শীলা কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল, কেউ হয়তো তাদের মেরে ফেলেছে।

অ্যা—শীলার মার মুখখানা একেবারে কালো হইয়া যায়।

এই মহিলা কয়দিনে একটা মৃত্যুও দেখেন নাই। কিন্তু নিজের চোখে দু-একটা নৃশংস ব্যাপার ঘটিতে দেখিয়াছেন। আর হত্যার কাহিনী শুনিয়াছেন অজস্র, হত্যা এবং হত্যার চেয়েও নির্মম।

শুনিয়া শুনিয়া গা ঘিনঘিন করে, অরুচি হয়। আসে অনিদ্রা। তবুও মানুষ যে এত নৃশংস হইতে পারে তিনি তাহা বিশ্বাস করিতে চান না। বলেন, সইস কোচোয়ান বেঁচে থাকতেও তো পারে।

দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পল্লীতে সাদা এই জানোয়ারটা যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করিল। তাকে লইয়া ছেলের দল মাতিয়া উঠিল।

একেবারে ছোটরা দূর হইতে দেখিয়াই খুশি হয়। বড়রা তার গায়ে হাত বুলায়। ঘাড়ে হাত দিলে ঘোড়াটাও আনন্দে চিঁহি চিঁহি করে।

তাকে লইয়া জল্পনা চলে নানা রকম। প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করে, কোন রাজার কিংবা জমিদারের ঘোড়া হইবে। তারপরই ওঠে খাদ্যের কথা, বড়লোকের ঘোড়া কী খায়, খায় কতটা পরিমাণ। একজন বলে, জানিস, ওরা মদ খায়, বিলিতী মদ।

নন্তে মন্তব্য করে, মদ না খেলে আর অত তেজী হয়?

একটি ছেলের দুর্বুদ্ধি হইয়াছিল। সে বলিল, ঘোড়াটা সম্ভবত ছেকরা গাড়ির।

সঙ্গে সঙ্গেই হাসির রোল ওঠে। নন্তে বলে, কত ঘোড়াই না তুই দেখেছিস। তোদের বিলেন দেশে জুড়ি-চৌঘুড়ি চলে কিনা।

এই আলোচনার মধ্যেই ঘোড়ার মুখে দড়ির লাগাম পরাইয়া যমুনা-প্রসাদ তার পিঠে চাপিয়া বসিল। হাতে নিল একখানা ছোট্ট ছড়ি।

ছেলেটির বয়স বাইস-তেইশ, কালো রং। ছিপছিপে গড়ন। গায়ে একটা গেঞ্জি। সে বায়স্কোপের টিকিট কিনিয়া বুকিং ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া চড়া দামে সেই টিকিট বেচে। ফুটপাতের উপর জুয়া খেলিয়া আধ ঘণ্টার মধ্যে লাভের কড়ি উড়াইয়া দেয়। কিছু অবশিষ্ট থাকিলে খাঁটি খাইয়া চিল্লাচিল্লি করে।

কিন্তু দাঙ্গার এই কয়দিনে সে বেশ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।

যখনই পল্লী বা নিকটের দেবমন্দির আক্রান্ত হয় তখনই সর্বাগ্রে শোনা যায় যমুনার কণ্ঠস্বর। সে সকলের আগে আগে ছুটিয়া চলে।

গোরা সৈন্যদের চা ও সিগ্রেট খাওয়াইয়া যমুনা তাদের সঙ্গেও বেশ ভাব করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা তাকে ডাকে—মিলিটারি টি ক্যান্টিন।

কিন্তু এই দুই দিন আর কিছু করার তার অবকাশ হয় নাই। প্রায় সব সময়ই ঘোড়ার উপর থাকে। বলে, হাম সার্জিন বন গিয়া।

ছেলের দল তার পিছন পিছন ছোটে। দু-একবার কেহ হয়তো বলে, তুমি নেমে পড় যমুনা, এবার আমরা উঠি।

যমুনা কোন জবাব দেয় না, ভ্রূক্ষেপ করে না। শুধু তালুতে জিভ ঠেকাইয়া শব্দ করে, টক্ টক্।

হাবুল বলিল, বাঃ রে, তুমি ঘোড়ায় চড়বে আর আমরা বসে বসে দেখবো? তা হবে না।

যমুনা বলে, যা, মোড়ের দুকানসে পান ঔর সিগ্রেট লিয়ে আয়, তারপর চড়বি।

পয়সা?

হামার নাম করবি। বলবি যোমনা পারসাদ মাংছে।

মিনিট দুই-তিন পরে হাবুল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিলে না। বললে, পৈসা লে আও।

শালা ভেড়ীকা বাচ্চা। শালার দুকান বাঁচিয়েছিলাম, জুয়াসে ভি কত পৈসা নাফা করল। আভি পানকো ওয়াস্তে দোঠো পয়সা মাংছে—বলিয়া যমুনা পানের দোকানের দিকে ঘোড়াটা চালাইয়া দিল। হাবুলের আর ঘোড়ায় চড়া হইল না।

অন্যবার এই সময়ে ছেলেরা সার্বজনীন পূজামণ্ডপে ভিড় করে। পটুয়া খড় দিয়া কাঠামো গড়ে, মাটি ছানে, কাঠামোয় মাটি দেয়। ছেলের দল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখে। টুকিটাকি জিনিসপত্র আগাইয়া দিয়া পটুয়াকে সাহায্য করিয়া কতই না আনন্দ পায়।

এবার এখনও মণ্ডপ ওঠে নাই, ছেলেরা সারাদিন ঘোড়াটাকে লইয়া ব্যস্ত। তারা তার নাম দিয়াছে চাঁদ।

চাঁদের রঙের ঔজ্জ্বল্য ও কান্তি দিনের পর দিন ম্লান হয়। সে পা টানিয়া টানিয়া চলে। পিছনের বাঁ পায়ে ছোট্ট কিন্তু দগদগে একটা ঘা।

শীলার বাবা হৃষীকেশবাবু পাড়ার প্রবীণ লোক, ছেলেদের মুরুব্বী স্থানীয়। তিনি হাবুলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘোড়াটাকে খেতে দিস্ তো রে?

হাবুল বলিল, নন্তেদা দিয়েছে বোধ হয়।

নন্তেকে প্রশ্ন করিলে সে কহিল, আমি তো জানি না। যমুনা বলতে পারে।

স্বামীর নিকট ব্যাপার শুনিয়া শীলার মা ছেলে সন্তুকে দিয়া বাড়ির নিচের দোকান হইতে কিছু ভুষি কিনিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ঘোড়াটা অল্প একটু মুখে তুলিয়াই আর খাইল না। সন্তুর বন্ধু খোকন বলিল, চাঁদের গলায় আটকে গেছে, আয় জল নিয়ে আসি।

দুইজনেই জল আনিল, কিন্তু একজনের ভাঁড়ের মুখ ছোট হওয়ায় এবং অপরের মগের তলায় ছেঁদা থাকায় ঘোড়াটার আর জল খাওয়া হইল না।

হাতের কাছে অন্য পাত্র না পাইয়া বালক দুটি পাশের চায়ের দোকান হইতে একখানা ভাঙা ডিশে খানিকটা চা আনিয়া বলিল, খা, চাঁদু খা। গোকুলের চা খুব ভাল, খেয়ে দেখ।

কিন্তু গোকুলের চায়ের মাহাত্ম্য চাঁদকে মোটেই আকৃষ্ট করিতে পারিল না। দু-একবার ডিশ শুঁকিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া নিল।

ঘোড়াটা আরও রোগা হইয়া গিয়াছে, কেমন যেন জবুথবু ভাব! ঘায়ের অবস্থাও আগের চেয়ে খারাপ। কিন্তু যমুনার চড়ার বিরাম নাই। হৃষীকেশ তাকে কহিলেন, ঘোড়াটাকে একটু রেহাই দিও যমুনা, নইলে যে মরে যাবে।

যমুনা মদ খাইয়া বুঁদ হইয়াছিল। সে আধা-হিন্দী আধা-বাংলায় যাহা বলিল তার সারাংশ এই—যেখানে হাজার হাজার মানুষ মরিল সেখানে সামান্য একটা জানোয়ারের জন্য আর দুঃখ করা কেন?—বলিয়াই হাসিল, শাণিত ছুরির ফলার মতন তীক্ষ্ণ ক্রূর হাসি।

সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সাহায্যে হৃষীকেশ ঘোড়াটাকে সামনের ফাঁকা গ্যারেজে তুলিয়া দিলেন, সঙ্গে দিলেন এক বালতি জল আর কিছু বিচালি। সবেমাত্র তাঁরা বাহিরে আসিয়াছেন এমন সময় চলমান লরি হইতে শান্তি-রক্ষীর দল ফুকারিয়া গেল, ভিতরে যাও, ভিতরে যাও।

পরদিন সকালে দেখা যায়, গ্যারেজে তালা লাগানো, দরজার পাশেই হৃষীকেশের বালতি, অদূরে ঘোড়াটা নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া। চোখে একটু দীপ্তি নাই, লেজ নাড়াইয়া মাছি 'তাড়াইবারও শক্তি নাই। মনে হয় এখনই পড়িয়া যাইবে।

সন্তু তাড়াতাড়ি চারটি ছোলা আনিয়া দিল। চাঁদ তাহা মুখে তুলিল না। নন্তে বলিল, দে তো সন্তু, দেখি আমার হাতে খায় কি না। অনেক ঘোড়াকে আমি খাইয়েছি। জানিস, আমাদের ঘোড়ার গাড়ি ছিল?

কিন্তু মূক প্রাণীটি তার এই আত্মবিশ্বাসেও আঘাত করিল! নন্তে বলিল, রোগটার সিরিয়সিটি দেখছি খুবই।

শীলার মা দুঃখ করিতে লাগিলেন, আহা বেচারার দেখছি দাঁড়াবার ক্ষ্যামতা নেই। কিন্তু একবার শুলে আর উঠবে না।

শীলা জিজ্ঞাসা করে, ঘোড়া নাকি দাঁড়িয়ে ঘুমোয়?

হৃষীকেশ বলিলেন, কে বললে? আট-দশ দিন বাদে ওরাও একবার গড়িয়ে নেয়।

বেলা দশটা। কড়া রোদ যেন গায়ে চাবুক মারে। চাঁদ ছটফট করে, ছেলেরা তাকে ধীরে ধীরে হাঁটাইয়া টেবুদের গাড়িবারান্দার তলায় লইয়া যায়। নন্তে তাদের আশ্বাস দেয়, সাদা জানোয়ারগুলোর রোদ সহ্য হয় না। ওতে ভয়ের কিছু নেই।

এই সময় বড় রাস্তার মোড়ে বেঁটে খাটো একটি মানুষের আবির্ভাব হয়। এদিক ওদিক চাহিয়া লোকটি রাস্তায় ঢোকে। একগাল পাকা গোঁফ-দাঁড়ি, খালি গা, পরনে ময়লা লুঙ্গি, মাথায় ফেজ, হাতে টিনের মগ। মগটা রোদে চকচক করিতেছিল।

এমনিতেই সে দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তার উপর এই সময় এই পাড়ায় তাকে দেখিয়া সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল, হৃষীকেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, ইশ, ও এখন এ পাড়ায় এল কেন?

কিন্তু লোকটির কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। সে কী যেন খোঁজে, দীর্ঘ পথের উপর বার দুই চোখ বুলাইয়া নেয়।

প্রথমে লক্ষ করে নাই, একটু পরে সাদা ঘোড়াটিকে দেখিয়া তার চোখ যেন জ্বলিয়া ওঠে। দ্রুতপদে কাছে যাইয়া তার গায়ে হাত বুলাইতে

বুলাইতে বৃদ্ধ তাদের দেশী ভাষায় বলে, আঃ সুরাব, তোর এমন দশা হয়েছে!

পরিচিত এই স্পর্শে প্রাণীটি চঞ্চল হইয়া ওঠে। সেও চোখ তুলিয়া চায়। মানুষের চাহনির মতন অর্থপূর্ণ সেই দৃষ্টি অনেক কিছুই প্রকাশ করে। ভাষায় হয়তো ততটা বলিতে পারিত না।

বুদো ভাঙা হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল, এর নাম বুঝি সোরাব? আমরা ডাকি চাঁদ।

বৃদ্ধ সহিস কহিল, উ তো একই হ্যায়।

নন্তে জিজ্ঞাসা করিল, ঘোড়াটা তোমার?

না বাবু, ভাড়াগাড়ির ঘোড়া। আমি সইস। সইস কোচোয়ান দুইই।

নন্তে বলিল, তার মানেই তোমার ঘোড়া।

ঠিক হ্যায়—বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসে। তারপর কল হইতে মগটায় জল ভরিয়া আনিয়া ঘোড়ার মুখের কাছে ধরে। ঘোড়াটা জলটুকু নিঃশেষে খাইয়া ফেলিলে ছেলের দল চীৎকার করিয়া ওঠে, জয় হিন্দ!

সইস লুঙ্গির ভিতরে গোঁজা একটা ঠোঙায় ছোলা আনিয়াছিল। সেই ছোলা সে ঘোড়াটাকে হাতে করিয়া খাওয়াইল। ছোলা ফুরাইয়া গেলে ছেলেদের বলিল, ঔর চারঠো দানা মিলেগা বাবু?

জরুর—বলিয়া নন্তে ছুটিল। সঙ্গে ছুটিল হাবুল ও গবার দল। এক-সঙ্গে ছোলা আসিল চার ঠোঙা।

জানোয়ারটা আর-একটু চাঙা হইলে বৃদ্ধ বলিল, বেমার হলে সোরাব আমার হাতে ছাড়া খায় না।

তার মনে পড়িল অনেক কথা, ঘোড়াটাকে কত টাকায় কেনা হইয়াছিল, তার বয়স তখন কত, কয়টা দাঁত উঠিয়াছিল, এইসব।

সোরাবের চলন দেখিয়া লোকে তাকে জিজ্ঞাসা করিত, বাজি জিতিবার এই ঘোড়াটাকে সে ঠিকাগাড়িতে জুড়িয়াছে কেন?

নিজের কপালে হাত ছোঁয়াইয়া সে উত্তর করিত, নসীব! মানুষের মতন জানোয়ারেরও নসীব আছে কিনা।

একটু পরে সে হৃষীকেশকে প্রশ্ন করিল, কব সব ঠাণ্ডা হোবে বড়বাবু? ফিন ঠিকাগাড়ি চালু হোবে? রাস্তামে ডর-উর কুছ থাকবে না?

লোকটি আগের মতন শান্তিপূর্ণ দিনের কথা ভাবিতেছিল। হৃষীকেশ তার প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

হঠাৎ যেন দানবের নিদ্রাভঙ্গ হয়। অদূরে চৌরাস্তার মোড়ে সে আড়মোড়া ভাঙে। ঝঞ্ঝার বেগে খবর ছুটিয়া আসে লালপট্টিতে খুনাখুনি শুরু হইয়াছে। খালের মধ্যে নদীর বেনো জলের মতন বড় রাস্তার জনস্রোতের একটা অংশ হু-হু করিয়া এই রাস্তায় ঢুকিয়া পড়ে। আরম্ভ হয় ছুটাছুটি, কলরব, মার মার শব্দ।

বুড়া সহিস এদিক ওদিক চায়, এক-একবার ছেলেদের মুখের দিকে তাকায়। সোরাবের চোখেও ফুটিয়া ওঠে অপরূপ করুণ দৃষ্টি, হয়তো সে তার পালকের বিপদ বুঝিতে পারে।

নন্তে সহিসকে বলে, কিছু ভয় নেই তোমার।

কিন্তু অপরিচিত শত শত হিংস্র চোখের সামনে সহিস কেমন যেন ভরসাও পায় না।

কয়েকটি লোক আগাইয়া আসে। যমুনা নন্তে হাবুল প্রভৃতি তরুণের দল বৃদ্ধের চারধারে কর্ডন করিয়া দাঁড়ায়। হৃষীকেশ আক্রমণকারীদের শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। বলেন, এ একটা নিরীহ লোক, ওকে মারবেন না।

জনতার মধ্যে হইতে নানা ভাষায় প্রতিবাদ আসে, মানুষ নেই, উ শয়তান আছে।

এর মধ্যে মেটিয়াবুরুজ ভুলে গেলেন মশায়?

টুথ্ ফর এ টুথ্।

হৃষীকেশ বলিলেন, কত জায়গায় ওরা আমাদের বাঁচিয়েছে জানেন?

আমরাও ঢের বাঁচিয়েছি। ওসব ছেঁদো কথা ছেড়ে দিন।

বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা, তর্ক করা শুধু নিরর্থক নয়, ক্ষতিকরও বটে। তাই যমুনা আর নন্তে বলে, "চুপ করুন কাকাবাবু," বলিয়াই দুজনে বুক ফুলাইয়া দাঁড়ায়। যমুনা বলে, "আও, মারনেওয়ালা কোন্ হ্যায়, আও।"

একটি ছোকরা চেঁচাইয়া উঠিল, আমাদের সাদা ঘোড়ার সইসকে, আমাদের চাঁদের সইসকে কেউ মারতে পারবে না।

জনতা একটুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। তারপরই আবার কলরব শুরু হয়। ছেলেদের গায়ে ঢিল পড়ে।

এই সময় মোড়ের চারতলা বাড়ির ছাদে একজন চীৎকার করিয়া ওঠে, মিলিটারি আ গিয়া।

আরম্ভ হয় দৌড় প্রতিযোগিতা। আশেপাশের গলিঘুঁজি, খোলা দরজা যে যেখানে সম্ভব ঢুকিয়া পড়ে। বৃদ্ধ সহিসকে পাঁজাকোলা করিয়া যমুনাপ্রসাদ হৃষীকেশের বাড়ির মধ্যে ছুটিয়া যায়।

গুম গুড়ম গুম্।

গাড়ি হইতে নামিয়া সৈনিকেরা রাজপথে টহল দেয়। তাদের জুতার শব্দ ভিন্ন সারাটা পল্লীতে আর কোনও শব্দ নাই।

সে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, দরজা জানালা বন্ধ। জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়াও কেহ কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে ভরসা পায় না। সবারই মুখে অজানা উদ্বেগের ছাপ।

ঘণ্টাখানেক পরের কথা।

প্রথমে বাহির হয় নন্তে আর যমুনাপ্রসাদ। পিছনে বৃদ্ধ সহিস। দরজা খুলিতেই তাদের চোখে পড়ে রৌদ্রদগ্ধ রাজপথের রিক্ত রূপ, যেন মহাশশ্মান।

বাঁ-দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনজনেই শিহরিয়া উঠে।

এ কী! ঘোড়াটা পথে পড়িয়া আছে। কালো পিচের মধ্যে তার সাদা রঙ আরও খুলিয়াছে। দেহ পথের উপর, মাথাটা ফুটপাথে। ডান কানের পাশে গোল একটা ক্ষতচিহ্ন।

বুড়া সহিস ডাকিল, মেরা সোরাব।

সোরাব কোনও উত্তর করিল না। বৃদ্ধের ডাকে সোরাবের সাড়া না দেওয়া এই প্রথম।

সোরাব তখন আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। হীরকস্বচ্ছ আকাশেরই মতো নির্মল দৃষ্টি ; সে চাহনিতে কোনও বেদনা নাই, গ্লানি নাই। হৃষীকেশও পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঘোড়াটার চোখের দিকে চাহিয়া তিনি একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

একটি তুলসী গাছের কাহিনী

ধনুকের মতো বাঁকা ইট-সিমেন্টের চওড়া পুলটির একশ গজ পরে বাড়িটা। দোতালা, মস্ত ; রাস্তা থেকে খাড়া উঠে গেছে। এদেশে ফুটপাথ নেই, তাই বাড়িটারও একটু জমি ছাড়বার ভদ্রতার বালাই নেই। তবে বাড়িটার পেছনে কিন্তু অনেক জায়গা। গোসলখানা—পাকঘর-পায়খানার মধ্যেকার খোলামেলা স্থানটি ছাড়াও আরো ঢের জায়গা। সেখানে আম-জাম-কাঁঠালের দুর্ভেদ্যপ্রায় জঙ্গল, মোটা ঘাসে আবৃত স্যাঁতসেঁতে মাটিতে ভ্যাপসা গন্ধ, আর প্রখর সূর্যালোকেও সূর্যাস্তের ম্লান অন্ধকার।

অত জায়গা যখন, সামনে খানিকটা ছেড়ে একটা বাগানের মতো করলে কী দোষ হতো ?—সে কথাই এরা ভাবে। মতিন ভাবে, বাগান না থাক, সামনে একটু জমি পেলে ওরা নিজেরাই বাগান করে নিতো, যত্ন করে লাগাতো মরশুমী ফুল, গন্ধরাজ-বকুল-হাস্নাহানা, দু-চারটে গোলাপও। তারপর সন্ধ্যার দিকে আপিস থেকে ফিরে ওখানে বসতো। বসবার জন্য না হয় একটা হাল্কা বেতের চেয়ার, নয় ক্যানভাসের আরাম-কেদারা কিনে নিতো। গল্প করতো বসে-বসে। আমজাদের হুঁকোর অভ্যাস। সে না হয় বাগানের সম্মান বজায় রাখবার মতো মানানসই একটা নলওয়ালা সুদৃশ্য গড়গড়া কিনে নিতো সন্ধ্যার বিশ্রামবিলাসের

জন্য। গল্প-জমিয়ে কাদেরও ছিলো। ফুরফুরে খোলা হাওয়ায় তার গল্পটা কাহিনীময়, হাস্নাহানার গন্ধের সঙ্গে মিশে মধুর হয়ে উঠতো। কিংবা, জ্যোৎস্নারাতে কোন গল্প না করলেই কী এসে যেতো? মুখ-বরাবর আস্তে চাঁদটার পানে চেয়ে চুপচাপ কী বসে থাকা যেতো না?—আপিস থেকে শ্রান্ত হয়ে ফিরে প্রায় রাস্তা থেকে ওঠা দোতলায় যাবার সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে সে কথা আরো বারবার মনে হয়।

এরা দখল করেছে বাড়িটা। অবশ্য দখল করবার সময় লড়াই করতে হয়নি, অথবা তাদের সামরিক শক্তি অনুমান করে কেউ এমনি হার মেনে নেয়নি। দেশ-ভঙ্গের হুজুগে এ শহরে আসা অবধি উদয়াস্ত তারা একটা যেমনতেমন ডেরার সন্ধানে ঘুরছিলো। একদিন দেখলো ওই বাড়িটা, মস্ত বড় বাড়ি জনমানবহীন অবস্থায় খাঁ খাঁ করছে। প্রথমে তারা বিস্মিত হয়েছিলো। পরে সদলবলে এসে দরজার তালা ভেঙে রৈ রৈ আওয়াজ তুলে বাড়িটায় প্রবেশ করে, বৈশাখের আমকুড়ানো ক্ষিপ্র উন্মাদনায় এমন মত্ত হয়ে উঠলো যে, ব্যাপারটা তাদের কাছে দিনদুপুরে ডাকাতির মতো মোটেই মনে হলো না। মনে কোন অপরাধের চেতনা যদি বা ভার হয়ে নামবার প্রয়াস পেতো, সে ভার তুলোধুনো হয়ে উড়ে যেতো তীক্ষ্ণ সে হাসির ঝলকে।

বিকেলের দিকে শহরে যখন খবরটা গেলো, তখন অবাঞ্ছিতদের আগমন শুরু হলো। মাথার উপর একটা ছাদের আশায় তারা দলে দলে আসতে লাগলো। এরা কিন্তু রুখে দাঁড়ালো। ডাকাতি নাকি? যথাসম্ভব মেজাজ ঠাণ্ডা রেখে বললে, জায়গা কোথায়, সব ঘর ভর্তি। বললে, দেখুন সাহেব, এই ছোট অন্ধকার ঘরেও চার-চারটে বিছানা পড়েছে। এখন তো বিছানা পড়ে ছু ফুট বাই তিন ফুটের চারটে চৌকি, খান ছয়েক চেয়ার বা টেবিল এলে ঘরে জায়গা বলে কোন বস্তু থাকবে না। কেউ সমবেদনা করে বললো, আপনাদের তকলিফ বুঝতে পারছি। আমরা কি এ কদিন কম কষ্ট করেছি? তা ভাই, আপনার কপাল মন্দ। যদি চার ঘণ্টা আগে আসতেন। চার ঘণ্টা কেন, ঘণ্টা দুয়েক আগেও তো নীচে কোণের ঘরটা অ্যাকাউণ্টস অফিসের মোটামত একটা লোক এসে দখল করলো। রাস্তার উপর ঘর, তবু মন্দ কী। জানালার কাছেই সরকারী আলো, কোনদিন যদি আলো নিবে যায়, রাস্তার ওই আলোতেই তোফা

চলে যাবে।

দেশময় একটা ঘোর পরিবর্তনের আলোড়ন হয়েছে বটে, তবু কোন প্রান্তে সঠিক মগের মুল্লুক বসেনি। কাজেই পরে এ বে-আইনী কাজের তদারক করতে পুলিস এসেছিলো।

পলাতক গৃহকর্তা যে বাড়ির উদ্ধারের জন্য সরকারের কাছে ধরণা দিয়েছিলেন, তা নয়। দখলের কথা জানলে দিতেনও কিনা সন্দেহ। যিনি প্রাণের ভয়ে এত বড় একটা পরিবার দুদিনের জন্য স্রেফ দেশ থেকে উধাও করে দিতে পারেন, তাঁর সম্পর্কে সেটা আশা করা বাড়াবাড়ি। পুলিসে খবর দিয়েছিলো ওরাই যারা শহরের অন্য কোন প্রান্তে তখন ডাকাতির ফিকিরে ছিলো বলে এখানে চারঘণ্টা আগে বা দু ঘণ্টা আগেও এসে পৌঁছুতে পারেনি। নেহাত কপালের কথা হচ্ছে, এদের কপালও মন্দ হবে না কেন। ভাগ্যের ফলে নিরীহ লোকেরাও আবার রীতিমত লেঠেল হয়ে উঠতে পারে। সত্যি সত্যি লাঠালাঠি না করলেও তার জন্য তৈরী হয়ে থেকে এরা সমগ্র ব্যাপারটা পুলিসকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর দ্বিরুক্তি না করে সদলবলে ফিরে গেলো। রিপোর্ট দেবার কথা। তা এমন ঘোরালো করে রিপোর্ট দিলে যে মর্মার্থ উদ্ধারের ভয়ে তার ওপরতলার কাছে সে রিপোর্ট চাপা দিয়ে রাখাই শ্রেয় মনে হলো। তা ছাড়া, তাড়াতাড়িই বা কী। যারা পালিয়ে গেছে তাদের প্রতি সমবেদনার কোন কথা ওঠে না এবং বাড়ির নিরুদ্দিষ্ট মালিক যদি এসে কিছু না করে তবে কেন অনর্থক মাথাব্যথা। তা ছাড়া, এরা কেরানী হলেও ভদ্রলোকের ছেলে, দখল করে আছে বলে জানালা দরজা ভেঙে ফেলেছে বা ছাদের আস্ত আস্ত বীম সরিয়ে সোজা চোরাবাজারে চালান করে দিচ্ছে, তা নয়।

রাতারাতি সরগরম হয়ে উঠলো বাড়িটা। এদের অনেককেই কলকাতায় ব্লকম্যান লেনে, খালাসীপট্টিতে, বৈঠকখানায় দপ্তরীদের পাড়ায়, সৈয়দ সালেহ লেনে তামাক-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অথবা কমরু খানসামা লেনের অকথ্য দুর্গন্ধ নোংরার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। এ বাড়ির বড় বড় কামরা, নীলকুঠি দালানের ফ্যাশানে দেওয়ালে মস্ত মস্ত জানালা, পেছনে খোলামেলা উঠোন, আরো পেছনে বনজঙ্গলের মতো আম-জাম-কাঁঠালের বাগান এদের কী যে ভালো লেগেছে বলবার

নয়। একেকজন বেলাটের মতো এক-একখানা ঘর দখল করে নেই সত্যি, তবু ঘরে নির্ঝঞ্ঝাট হাওয়া চলাচল এবং আলোর ছড়াছড়ি দেখে অত্যন্ত খুশি। এবার মনে হয় বাঁচল, ফরাগত মত থেকে আলোবাতাস খেয়ে জীবনে এবার সতেজ সবুজ রক্ত ধরবে, হাজার-দু-হাজারওয়ালাদের মতো মুখে জৌলুস আসবে, দেহ ম্যালেরিয়া কালাজ্বরের জীবাণু থেকে মুক্ত হবে।

যেমন ইউনুস থাকতো ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটে। সাহেবী নাম হলে কী হবে, গলিটার এক-এক অংশ যেন সকাল বেলাকার আবর্জনা-ভরা আস্ত ডাস্টবিন। সে গলিতেই নড়বড়ে ধরনের কাঠের দোতালায় কচ্ছদেশীয় চামড়া ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সে থাকতো। কে কবে বলেছিলো চামড়ার গন্ধ নাকি ভালো, যক্ষ্মার জীবাণু ধ্বংস করে। তা ছাড়া, সে উৎকট গন্ধ ড্রেনের পচা ভোসকা গন্ধও বেমালুম ডুবিয়ে দিত ; ঘরের কোণে দশদিন ধরে ইঁদুর কিংবা বিড়াল মরে পচে থাকলেও নাকে টের পাবার জো ছিলো না। ইউনুস ভাবতো, মন্দ কী। অন্ততপক্ষে যক্ষ্মার জীবানু ধ্বংস হবার কথাটা মনে বড় ধরেছিলো। শরীরটা তার ভালো নয় তেমন ; রোগাপটকা দুর্বল মানুষ। এখানে দোতালার দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায় জানালার পাশে শুয়ে সূর্যালোকের সোনালী ঝলকানি ম্যাকলিয়ড স্ট্রিটের আস্তানার কথা মনে করে শিউরে ওঠে। ভাবে, এতদিন কী হয়ে গেছে কে জানে! টাকা থাকলে বুকটা একবার দেখিয়ে আসত ডাক্তারকে। সাবধানের মার নেই।

ভেতরে রান্নাঘরের বাঁ ধারে একটা চৌকোণে আধ হাত উঁচু ইটের মঞ্চের ওপর একটি তুলসীগাছ। একদিন সকালবেলায় নিমের ডাল দিয়ে মেছোয়াক করতে করতে মোদাব্বের উঠোনে পায়চারি করছে, হঠাৎ তার নজরে পড়লো তুলসীগাছটি। মোদাব্বের হুজুগে মানুষ, একটু কিছু হলেই প্রাণ-শীতল-করা রৈ রৈ আওয়াজ উঠিয়ে দেয়। এরা সব উঠে এলো। যতটা আওয়াজ ততটা গুরুতর না হলেও কিছু তো অন্তত ঘটেছে।

এই তুলসীগাছটা। এটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা যখন এসেছি বাড়িতে কোন হিন্দুয়ানী চিহ্ন থাকবে না।

সবাই তাকালো সেদিকে। খয়েরি রঙের আভায় গাঢ় সবুজ

পাতাগুলো কেমন ম্লান হয়ে আছে। নীচে ক-দিনের অযত্নে ঘাস গজিয়ে উঠেছে। আশ্চর্য, এটা এতদিন চোখেই পড়েনি, কেমন যেন লুকিয়ে ছিলো।

ওরা কিন্তু হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। যে বাড়ি এত শূন্য মনে হয়েছে, সিঁড়ির ঘরের দেয়ালে কাঁচা হাতে লেখা কটা নাম থাকলেও এমন বে-ওয়ারিশ ঠেকেছে যে, বাড়ির চেহারা হঠাৎ বদলে গেলো। তুলসীগাছটা আচমকা ধরা পড়ে গিয়ে অনেক কথা যেন বলে উঠলো।

এদের স্তব্ধতা দেখে মোদাব্বের আরেকটা হুঙ্কার ছাড়লো। ভাবছো কী? কথা নেই, উপড়ে ফেলো।

হিন্দু রীতিনীতি এদের ভালো জানা নেই। তবু কোথায় শুনেছে হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রী তুলসীগাছের তলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায়, গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে। ঘাস-গজিয়ে-ওঠা পরিত্যক্ত চেহারার এ তুলসীগাছের তলেও প্রতি সন্ধ্যায় কেউ প্রদীপ দিতো। আকাশে যখন সন্ধ্যাতারাটি বলিষ্ঠ একাকিত্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, ঠিক সেই সময় ঘনায়মান ছায়ার মধ্যে আনত সিঁদুরের নীরব রক্তাক্ত স্পর্শে একটি শান্ত ধীর প্রদীপ জ্বলে উঠতো প্রতিদিন, হয়তো বছরের পর বছর এমনি জ্বলছে। ঘরে দুর্দিনের ঝড় এসেছে, হয়তো কারো জীবনপ্রদীপ নিবে গেছে, তবু হয়তো এ প্রদীপ দেওয়ার অনুষ্ঠান একদিনের জন্যও বন্ধ থাকেনি।

যে গৃহকর্ত্রী বছরের পর বছর এ তুলসীতলে প্রদীপ দিয়েছে, সে আজ কোথায়? কেন চলে গেছে? মতিন এক সময় রেলওয়েতে কাজ করতো। সে ভাবে, হয়তো কলকাতায়, নয় আসানসোলে, নয়তো বৈদ্যবাটি বা হাওড়ায় কোন আত্মীয়ের আস্তানায়। লিলুয়াও বা নয় কেন? বিশাল রেলইয়ার্ডের পাশে মসৃণ একটি চওড়া লালপাড়ের শাড়ি ঝুলছে হয়তো। সেটা এ গৃহকর্ত্রীরই। কিন্তু যেখানেই থাকুন, আকাশে যখন দিনান্তের ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তখন হয়তো প্রতি সন্ধ্যায় এ তুলসীতলার কথা মনে করে গৃহকর্ত্রীর চোখ ছলছল করে।

গতকাল থেকে ইউনুসের সর্দি-সর্দি ভাব। সে কথা বললে, থাক না ওটা। আমরা তো আর পূজা করতে যাচ্ছি না। বরঞ্চ ঘরে একটা তুলসীগাছ থাকলে ভালই। সর্দি-কফে তার পাতার রস উপকারী।

মোদাব্বের এধার ওধার চাইলো। সবার যেন তাই মত। ওদের মধ্যে এনায়েত মৌলভী ধরনের মানুষ। মুখে দাড়ি, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, সকালে নাকি কোরান তালাওয়াতও করে। সে পর্যন্ত চুপ। প্রতি সন্ধ্যায় ছলছল-করে-ওঠা গৃহকর্ত্রীর চোখের কথা কি ওর মনে হলো? অক্ষত দেহে তুলসীগাছটা বিরাজ করতে থাকলো। বাড়িটার আবহাওয়া ভালো। কলকাতায় ঝিমিয়ে-আসা নিস্তেজ ভাবটা যেন কেটে গেছে। আড্ডাও তাই জমে ভালো, দেখতে না দেখতে মুখে-ফেনা-ওঠা তর্ক-বিতর্ক লেগে যায়। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক সবরকম আলোচনা। সাম্প্রদায়িকতার কথাও ওঠে মাঝে মাঝে।

—ওরাই তো মূল, মোদাব্বের বলে।

বলে হিন্দুদের নীচতা ও গোঁড়ামির জন্যই তো আজ দেশটা এমন ভাগ হয়ে গেল।

তারপর তাদের অবিচার-অত্যাচারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেয়। রক্ত গরম হয়ে ওঠে সবার। দলের ভেতর বামপন্থী নামে চালু মক্‌সুদ মিঞা কখনো কখনো প্রতিবাদ করে। বলে, অতটা নয়। এতটা হলেও আমরা কম কী। মোদাব্বের দাঁত খিচিয়ে ওঠে। দেখে তথাকথিত বামপন্থীর কাঁটা নড়ে। সে হাল ছেড়ে দিয়ে ভাবে, কে জানে বাবা আমরাও হলপ করে বলতে পারি দোষটা ওদের, ওরাও শালা তেমনি হলপ করে বলতে পারে দোষটা আমাদের। ব্যাপারটা বড় ঘোরালো, বোঝা মুশকিল। ভাবে, হয়তো আমরাই ঠিক। আমাদের ভুল হবে কেন? আমরা কি জানি না আমাদের?

কাঁটা সংশয়ে দুলে দুলে হঠাৎ ডানে হেলে গিয়ে স্থির হয়ে গেলো। কাঁটাটি কখনো কখনো না বুঝে বাঁয়ে হেলে আসে বলেই ওর বামপন্থীর অপবাদ।

পায়খানার দিকে যেতে যেতে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটি চোখে পড়ে। কে আগাছা সাফ করে দিয়েছে। পাতাগুলো শুকিয়ে উঠে খয়েরী রং ধরেছিল, আবার যেন গাঢ় রঙের মধ্যে কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে। কে তার গোড়ায় পানি দিচ্ছে। অবশ্য খোলাখুলি ভাবে, লোক দেখিয়ে দিচ্ছে না। সমাজে চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে।

ইউনুস ভেবেছিলো ম্যাকলিয়ড স্ট্রীটের চামড়া-ব্যবসায়ীদের নোংরা

আস্তানায় আর কখনো ফিরে যেতে হবে না—এখানে আলো-বাতাসের মাঝে জীবনের জন্য সে বেঁচে গেলো। কিন্তু সে ভুল ভেঙেছিলো। শুধু ইউনুস কেন, সবাই—যারা ভেবেছিলো এ-মন্দার দিনে ভালো করে খেতে না পাক, বাড়িতে প্রয়োজনমত জীবনের দুষ্প্রাপ্য আরামটুকু ভোগ করবে—তারা প্রত্যেকে ভুল করেছিলো। তবু যাহোক সামনে জমি নেই। থাকলে ওরা আজ বাগান করতো এবং সেই সময়ে অন্য কিছু না হোক, গাঁদাফুলের গাছ বড় হয়ে উঠতো। তাহলে কী প্রচণ্ড ভুলই না হতো।

মোদাব্বের হন্তদন্ত হয়ে এসে বললো, পুলিশ এসেছে। কেন? ভাবলো, হয়তো রাস্তা থেকে পালিয়ে একটা ছ্যাঁচড়া চোর বাড়িটায় এসে ঢুকেছে। কিন্তু সেটা খরগোশের মতো কথা হলো। শিকারীর সামনে পালাবার আর পথ না পেয়ে হঠাৎ বসে পড়ে চোখ বুজে খরগোশ ভাবে, কই আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। তারাই তো চোর, কেবল গা ঢাকা দিয়ে না থেকে চোখ বুজে আছে।

পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্টর সাবেকী আমলের হ্যাট বগলে রেখে তখন দাগপড়া কপালের ঘাম মুছছে। কেমন একটা নিরীহ ভাব। পিছনের বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটোকে মস্ত গোঁফ থাকা সত্ত্বেও আরো নিরীহ দেখাচ্ছে। ওরা নিস্তব্ধ ভাবে কড়িকাঠ গুনতে লাগলো। ওপরে ঘুল-ঘুলির খোপে একজোড়া কবুতর বাসা বেঁধেছে। একটা সাদা, আরেকটা ধূসর। তাও দেখতে পারে তারা তাকিয়ে তাকিয়ে। হাতে বন্দুক আছে কিনা।

মতিন সবিনয়ে বললো,—

—আপনার কাকে দরকার?

—আপনাদের সবাইকে। আপনারা বে-আইনী ভাবে এ বাড়ি কবজা করেছেন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের এ বাড়ি খালি করে দিতে হবে—বলে অর্ডার দেখালো।

বাড়ির কর্তা তাহলে ফিরে এসেছে। ট্রেন থেকে নেমে এখানে এসে কাণ্ডটা দেখে সোজা থানায় চলে গেছে। এখন সঙ্গে এসেছে কিনা দেখবার জন্য আফজল একবার গলা উঁচিয়ে দেখলো। কেউ নেই। পেছনে কেবল গোঁফওয়ালা বন্দুকধারী কনস্টেবল দুটো।

—কেন ? বাড়িওয়ালা কি নালিশ করেছে ?

—গভর্নমেন্ট বাড়ি রিকুইজিশন করেছে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকলো তারা। অবশেষে মতিন বললে,—

—আমরা তো গর্ভনমেণ্টেরই লোক।

মাঝে মাঝে মানুষের নির্বুদ্ধিতা দেখে অবাক হতে হয়। কথা শুনে নিস্তব্ধ কনস্টেবল দুটো পর্যন্ত কড়িকাঠ থেকে চোখ নামিয়ে তাকালো তাদের পানে, ভাবাচ্ছন্ন চোখ হঠাৎ কথা কয়ে উঠলো।

বাড়িতে এরপর একটা ছায়া নেমে এলো। ভাবনার অন্ত নেই। কোথায় যাই এই চিন্তা। কেউ কেউ রেগে উঠে বলে, কোথাও যাব না, এইখানেই থাকবো। দেখি কে ওঠায়। কেউ যদি এ বাড়ির চৌকাঠ পেরোয় তবে সে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসবে। (কোথায় ছাত্ররা নাকি এমনি এমনি গায়ের জোরে একটা বাড়ি দখল করে আছে। তাদের ওঠাবার চেষ্টা করে সরকারের উচ্চতম কর্তারা পর্যন্ত নাকি নাস্তা-নাবুদ হয়ে গেছে। সে কথাই স্মরণ হয়।) অবশেষে রক্ত তাদের গরম হয়ে ওঠে। বলে কখ্খনো ছাড়বো না। যে আসে আসুক, কিন্তু সে যেন একথা জেনে রাখে যে, তাকে আমাদের লাশের উপর দিয়ে আসতে হবে।

ক-দিন গরম রক্ত টগবগ করলো। কাজে মন নেই, খাওয়ায় মন নেই। কেবল কথা, তিক্তরসে সিঞ্চিত ঝাঁঝালো কথা। কিন্তু ক্রমশ কথা কমতে লাগলো। এবং এদের কথা থামলে রক্ত ঠাণ্ডা হতে ক-দিন।

এরা তো আর ছাত্র নয়। এরা যে কী, সে কথা দর্প ক'রে সেদিন পুলিশকে নিজেরাই তো বলেছিলো। বাড়ি রিকুইজিশন হবার কথা শুনে কিছুক্ষণ বিমুখ থেকে বলেছিল, কেন, আমরা তো গর্ভনমেণ্টের লোক।

একদিন তারা সদলবলে চলে গেলো। যেন ঝড়ের মতো চলে গেলো, ঘরময় ছিটিয়ে রেখে গেলো পুরোনো খবর কাগজের টুকরো,

কাপড় ঝোলাবার দড়ির একটা দুর্বল অংশ, বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, বা ছেঁড়া জুতোর গোড়ালিটা। নীলকুঠী-বাড়ির ফ্যাশানে তৈরী দরজা-জানালাগুলো খাঁ খাঁ করতে লাগলো। কিন্তু সে আর ক-দিন। রঙ-বেরঙের পর্দা ঝুলবে সেখানে।

পেছনে রান্নাঘরের পাশে তুলসীগাছটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় আবার খয়েরী রঙ ধরেছে। যেদিন পুলিশ এসে বাড়ি ছাড়বার কথা জানিয়ে গেলো সে দিন থেকে তার গোড়ায় কেউ পানি দেয়নি। তুলসীগাছের কথা না হোক, গৃহকর্ত্রীর ছলছল চোখের কথাও কি এদের মনে পড়েনি ?

কেন পড়েনি সে কথা কেবল তুলসীগাছ জানে, যে তুলসীগাছকে মানুষ বাঁচাতে চাইলে বাঁচাতে পারে, ধ্বংস করতে চাইলে এক মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে অর্থাৎ যার বাঁচা বা সমৃদ্ধ হওয়া আপন আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করে না।

সমরেশ বসু

আদাব

সমরেশ বসুর পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলা। পরবর্তী সময়ে নৈহাটিতে আসেন। এখানে থাকাকালীন শুরু হয় তাঁর সাহিত্য জীবন। সাহিত্য জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন। তদানীন্তন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্প 'আদাব'। প্রথম গল্পই বামপন্থী মহলকে আকৃষ্ট করে। 'কিমলিস,' 'পশারিনী' তাঁকে খ্যাতির উচ্চ সীমায় নিয়ে যায়। 'জগদ্দল'-এর মতো উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল তার পটভূমি এবং জীবন সম্পর্কে নতুন মানবীয় মূল্যবোধে। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি প্রগতি আন্দোলনের শুধু পাশা-পাশিই ছিলেন না, ছিলেন তার একনিষ্ঠ কর্মীও।

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারি হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরারা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যুবিভীষিকায় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে আগুন। মৃত্যুকাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিকবিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা

অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লাহ আকবর' কি 'বন্দেমাতরম।'

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে। …নিশ্চল নিস্তব্ধ।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা ……ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা। মানুষ। ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা-ধীর…। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও।—অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে…প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবার অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে,—বাড়ি কোনখানে?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়।—তোমার?

—চাষড়া—নারাইনগঞ্জের কাছে…কী কাম কর?

—নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি।—তুমি ?

—নারাইনগঞ্জের সুতাকালে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। ......হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু-পক্ষেরই উন্মত্ত ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

ধারেকাছেই য্যান লাগছে। —সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

হ, চলো এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। —মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল : আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি ?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোন বদ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল। চোখে চোখ পড়তেই বলল, বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাকো।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্।

ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল, ক্যান্ কী, মরতে যাইবা নাকি তুমি ?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না, কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি ?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবটা তো ভালো মনে হইত্যাছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারনের লেইগা ?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি ? স্থান কাল ভুলে রাগে দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো। মানুষের মন বোঝ না ?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি ?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলে মেয়েদের কথা···তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে···কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে দোকানে এতো হাসাহাসি, কথা কওয়া-কওয়ি—আবার মুহূর্তপরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমন ভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে ? কী অভিশপ্ত জাত !···সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিঃশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা ?—সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খশ খশ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠি ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতি গেছে সেঁতাইয়া।—আর-একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খশ খশ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

সোহান্ আল্লা! —নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি। ······ভূত

দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

তুমি……?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দুজোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট করে উঠে দাঁড়াল। বলল,—হ, আমি মোছলমান। —কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু……

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাদের ঈদের পরব, জানো?

আর কিছু নাই তো? —সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখো। —পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো?

ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি, একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া আপন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুরকে তার জামা কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজন বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগসহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ!

আইচ্ছা……মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পারনি—এই মাইর-দইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি

জিগাই, মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দুগা লোক মরব, আমাগো দুগা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব?

—আরে আমিওতো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলা-মাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর পোলা-মাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কী আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম 'আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেমবায়?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দুহাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন জুটাইব কোন্ সুমুদ্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কী? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়ের মশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান হজরতের হাত, বখশিস্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখা-চোখি করে।

—কী করব? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চলো পালাই। কিন্তুক যামু কোনদিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চলো যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিসের মাইর খামু না ;—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে।

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চলো, কোনগতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুইজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড় ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলভার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকিঝুঁকি মারতে আবার তারা বেরল।

—কিনারে কিনারে চলো। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—খাড়াও। —মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কী হইল?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখো।

মাঝির সঙ্কেতমতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু

বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কী যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে। বারান্দার নীচে ঘোড়ার জিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর-একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে—ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে, হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাটে।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে ?

—তাই কইতেছি তুমি থাকো, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এই হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত যাইব গা।

—আর তুমি ?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে। —আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোন রকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া, কর কী ? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে। —কেমনে যাইবা তুমি, আঁ ? আবেগে উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা আইজ চান্দ্ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপ্‌জানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতাছে। পারুম না ভাই—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে। কামিজ-ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায় ? —ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখানে থাইকো, য্যান উইঠো না। যা…ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার

তোমার লগে মোলাকাত হইব।—আদাব।

আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুকধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবান—মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধনিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলা-মাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করবে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ? —সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হলট্…

ধ্বক করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুটপায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ-আর্তনাদ সে শুনতে পায়।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা, শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

সলিল চৌধুরী
ড্রেসিং টেবিল

সলিল চৌধুরী শুধু একটি নামই নয়—সঙ্গীতময় জীবনও। পথে ঘাটে, কারখানার গেটে—যেখানেই লড়াকু মানুষ সেখানেই ভাঙা হারমনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে সুরে সুরে স্ফুলিঙ্গ জ্বালিয়ে তুলেছেন তিনি। সেই স্ফুলিঙ্গ এক দিন দাবানলে পরিণত হবে—এই আশ্বাস—এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি গণনাট্য সংঘের একজন একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠেন। কর্মী আর স্রষ্টার ঘটে সমন্বয়। শুধু সঙ্গীতের জগতেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি। তু ল নিয়েছেন কলমকেও। 'ড্রেসিং টেবিল', 'গুনময় গু'ই-এর জীবনচরিত' তারই ফসল। লিখেছেন অজস্র কবিতা এবং গান।

বিয়ের পর নন্দা আমাকে যত চিঠি লিখত তার প্রায় প্রত্যেকটাতেই শেষ 'পুঃ' দিয়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা থাকত : "ঘর যখন নেবে আমার জন্য একটা ড্রেসিং টেবিল কিনতে ভুলো না—আর, আর আয়নাটা যেন খুব বড়ো আর ভালো হয়।"

বিয়ের আগে নন্দার বাড়ি যখন যেতুম প্রথমেই নজরে পড়ত দরজার সামনের দেওয়ালে একখানি চটা-ওঠা আয়না। তাতে মুখ দেখলে ওঃ যা দেখাত! নাক থেকে কপাল পর্যন্ত পুরো এক হাত লম্বা, আর ঠোঁট থেকে চিবুক মাত্তর এক ইঞ্চি! আবার একটু নড়লেচড়লেই আয়নায় নানারকম ভঙ্গি করে মুখ ভ্যাংচাত।

রীতিমত মন খারাপ হয়ে যেত আমার, আর নন্দা হাসত, বলত, "তোমার কাছে যখন যাবো তখন ভালো আয়না কিনে দিও!"

পরবর্তী জীবনে নানা সমালোচকের সম্মুখীন হতে হয়েছে—তাঁদের সমালোচনায় নিজের প্রতিবিম্বও দেখছি,—দেখে বেশীর ভাগ সময়েই মনে পড়েছে নন্দার বাড়ির সেই আয়নার কথা। সে কথা থাক—

বিয়ের ঠিক পরে। তখন আমার দু-তিনটে খবরের কাগজে ভালো চাকরি পাওয়ার কথা হচ্ছে, মানে এই হল বলে আর কী!

সেটা না হওয়া পর্যন্ত কটা দিন নন্দা তার বাবার কাছে থাকবে—ঠিক হল। আর চাকরি হলেই ঘরভাড়া নিয়ে নন্দাকে কলকাতায় নিয়ে আসব। কেমন করে ঘর সাজানো হবে, কোন্ জায়গায় কী থাকবে—সেসব প্ল্যান তুজনে মিলে আলোচনা করে পুরোপুরি মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলুম। নন্দা রইল গ্রামে তার বাবার কাছে। এর পরে ছ-মাসের কাহিনী যদি আপনারা শোনেন – থাকগে,—সেসব বলে লাভ নেই, কারণ যে কাহিনী বলতে বসেছি সেটা আমার নিজের কথা নয়। তবু বলে রাখা ভালো যে চাকরি আমি পেয়েছি, নয়তো অনেকে মনে করতে পারেন যে বেকার সমস্যার ওপর আমি কটাক্ষ করছি। অবশ্য যে চাকরিগুলো পাবার কথা ছিল তার একটাও পাইনি, কিন্তু এমন একটা পেয়েছি যা ঘুনাক্ষরে মনের ত্রিসীমানাতেও কোনদিন ঠাঁই পায়নি। এক কথায়, জুতোর দোকানের সেলসম্যান। আর কসবার একেবারে ভেতর দিকে যে এঁদো পুকুরগুলো আছে তারই একটার পাড়ে তু-খানা টিন-দেওয়া ঘর এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে বখরা করে ভাড়া নিয়েছি। নন্দাও চলে এসেছে বাপের বাড়ি থেকে—মানে, বেশ আছি। নন্দার একটা আশ্চর্য প্রতিভা আছে, বোধহয় সব মেয়েদেরই ওটা থাকে ; সেটা হচ্ছে, অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা। একদিনের জন্যেও মুখ শুকনো দেখিনি নন্দার—যেন কসবার টিনের ঘর ভাড়া নেওয়াটাই তার আজীবনের স্বপ্ন। কিন্তু একটা ব্যাপার এ ঘরে আসার পর থেকে একবারের জন্যও নন্দা বলেনি ড্রেসিং টেবিলের কথা। আমিও প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এমন সময় এক শনিবারের তুপুরবেলা একটা ঘটনা ঘটল। নগদ করকরে ষাট টাকা মাইনে গুনে নিয়ে সেদিন বাড়ি ফিরছি পথের তু-দিকে চাইতে চাইতে। ইচ্ছে করলেই কত কী কিনতে পারি, অথচ কিছুই কিনছি না, এটা যেন আমার সম্রাটিক খেয়াল। বেশ লাগে পকেটে টাকা থাকলে। হঠাৎ ঠিক কসবার মোড়ে দেখি এক চমৎকার ড্রেসিং টেবিল রাস্তায় নিলেমে বিক্রি হচ্ছে। আরো কত কী ফার্নিচার আশ্চর্য সস্তায় যাচ্ছে। ড্রেসিং টেবিলটার গ্লাসের একটা কোণ কেবল একটু ফাটা, তা ছাড়া প্রায় নিখুঁত—দাম উঠল মাত্র তিরিশ টাকা—ভাবুন। হুপের মাথায় 'যা থাকে বরাতে' বলে কিনে ফেলে মুটের মাথায় চাপিয়ে সটান বাড়ির

দিকে পা বাড়ালুম। বাড়িভাড়া যাবে ১৫ টাকা, বাকী ১৫টি টাকায় সারা মাস সংসার চালাতে হবে। নন্দার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল—কত আশা কত স্বপ্ন বুকে নিয়ে বেচারী ভালোবাসতে শুরু করেছিল, তার তো কিছুই মিটল না। তিরিশ টাকা যায় যাক, কুছ পরোয়া নেই।

বাড়ি ঢুকতেই নন্দা প্রথমটা অবাক হয়ে গেল—তারপরে কী যেন ভেবে কী ভীষণ খুশি যে হয়ে উঠল কী বলব। অন্য মেয়ে হলে হয়তো টাকার হিসেব করে এতক্ষণে প্যানপ্যান করতে বসত—কিন্তু দরিয়ার মতো দিল আছে নন্দার—কবি না হোক, কবি-স্ত্রী হবার সে নিশ্চয় উপযুক্ত। প্রায় সারাক্ষণ নন্দা আয়নার সামনেই বসে কাটাল, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চুল বাঁধল—কাপড় ছেড়ে কপালে টিপ পরল—মাথায় ঘোমটা টেনে অকারণে দু-একবার হাসল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে খুশিতে যেন আবেশ আসছে—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। বিয়ের আগের দিনগুলো স্বপ্নে ভাসছে—কেমন যেন সার্থক মনে হচ্ছে জীবন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল—নন্দা ডাকছে। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম—নন্দার দু-চোখ ফুলে লাল হয়ে উঠেছে—চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে—সারা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'কী হয়েছে নন্দা? কাঁদছো কেন অত?'

'ও আয়না তুমি ফেরত দিয়ে এসো—ও আমার চাই না' বালিশে মুখ ঢেকে নন্দা কাঁদতে লাগল। হয়তো পুরনো জিনিস বুঝতে পেরে ওর অপমান হয়েছে। কিন্তু নতুনের দাম কত! সে কি আর আমাদের কেনার সাধ্যি। এত অবুঝ হলে কেমন করে চলবে? আর জিনিসটা তো প্রায় নতুনই বলা যেতে পারে।

'ছি! নন্দা শোনো।'

'না, না, না, আমার চাই না। তুমি ফেরত দিয়ে এসো।' স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। কেবল সংকীর্ণ একটা প্রেসটিজ বড় হল নন্দার। আর আমার কোন দামই নেই ওর কাছে?

'বেশ। তাই হবে। ফেরত দিয়ে আসব।'

নন্দা আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল—খানিক পরে ফিরে এল আবার। আমার কোলের ওপর একতাড়া চিঠি ফেলে দিয়ে বলল—

'এইগুলো পড়ে দেখো।' নীল খামে মোড়া পরিষ্কার বাংলায় লেখা চারখানা চিঠি।

'কার চিঠি এ? কোথায় ছিল?'

'আয়নার দেরাজের মধ্যে ছিল।'

চিঠিগুলো নিয়ে বসলুম। খুলে পড়তে শুরু করলুম এক-একখানা করে—হাত কাঁপছে—কী ব্যাপার কে জানে? তারিখ হিসেবে পর পর সাজালে চিঠিগুলো এই :—

[এক]

বাগেরহাট

প্রিয়তমাসু—

আজ রাত বারোটায় এখানে এসে পৌঁছেছি। মনে হচ্ছে কতদিন যেন ছেড়ে এসেছি তোমাকে। ভাবতে অবাক লাগছে কাল এতক্ষণে তুমি কত কাছটিতে ছিলে।

জায়গাটা শহর থেকে কিছুটা দূরে। অমলের কথা মনে আছে তো? সে এখানকার কলেজে প্রোফেসারি করছে। কাল থেকে তার ওখানেই উঠব। শরীর বড়ো ক্লান্ত লাগছে—অবশ্য ট্রেনে বিশেষ কষ্ট হয়নি। ট্রেনে একটা বড়ো মজার ব্যাপার হয়েছে, শোনো: আমার সামনের বেঞ্চেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী, একটি ছোট ছেলে আর দুটি মেয়ে আমার সহযাত্রী। সুন্দর ঝকঝকে একটি পরিবার—ছেলেমেয়ের নিটোল স্বাস্থ্য—প্রৌঢ়ের অমায়িক হাসি-মুখ আর খাঁটি বাংলার মা—ভীষণ ভালো লাগছিল। স্কেচ বইটা বের করে মনে রাখার মতো করে সাজিয়ে নিচ্ছিলাম। একটি মেয়ের নজরে পড়ল যে আমি ছবি আঁকছি—সে তার বোনকে বলল, বোন মাকে বলল—মা বাবাকে বললেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভীষণ উৎসাহে একেবারে ফেটে পড়লেন, "তাই নাকি? দেখি কেমন আঁকলেন আমাদের? আরে! এমন অদ্ভুত মশাই! একেবারে জাদুকর লোক দেখছি আপনি?"

তারপর মহা হৈ চৈ। যাই কেনেন তাই খেতে দেন আমাকে, কিছুতেই ছাড়বেন না।

"আরে মশাই, বাঙালীর এত দুর্দশা কেন জানেন? তারা শিল্পীর কদর জানে না। আমারও ওসব শখ ছিল—এককালে নামও ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে মহলে। নিন ধরুন—লজ্জা কিসের?"

খেতে হল। ভদ্রলোক যখন কথা বলেন উত্তরের প্রত্যাশা করেন না—মনের ভাবটা যেন এই যে তাঁর ওপরে আর কোন কথাই চলতে পারে না।

"বিয়ে-থা করেননি তো? বেশ!! এটি যেন করবেন না—এই দেখুন না আমার—হেঁ হেঁ—সব চুলোয় যাবে তাহলে"—আমি বলতে যাচ্ছিলুম আমি বিয়ে করেছি—ভদ্রলোক মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললেন:

"আমার মেয়েদের ছবি আঁকা শেখান না আপনি? যা লাগে দেব, কলকাতায়ই তো থাকেন—আমার বাড়ি হচ্ছে—বিডন স্ট্রীট। আসবেন নিশ্চই। যাক তাহলে, ঐ কথাই রইল। হাসি, খুশি। তোরা খুশি তো? দেখ, কেমন মাস্টার পেয়ে গেলি—হেঁ হেঁ—হেঁ।"

কোন কথার উত্তর দেবারই অবকাশ নেই আমার। বোন দুটি জিজ্ঞেস করে, "সত্যি আসবেন তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আসব।" উপায় নেই।

ইতিমধ্যে ছোট ভাইটি আমার ব্যাগ হাতড়ে অ্যালবামটা টেনে বের করেছে—আঙুলে থুথু লাগিয়ে ছবি উলটে দেখছে।

মা বললেন, "ছি খোকা, অসভ্যতা কোরো না, রেখে দাও!"

"না, মা! মাস্টারমশাই আমাকে দেখতে বলেছেন, বলুন না আপনি, বলেননি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওকে দেখতে বলেছি।" এরা সব একজাতের।

ভদ্রলোক রানাঘাটে নেবে যাবেন। তোমার তৈরি লুচি বের করলুম—"খেতেই হবে।" খোকাকে দিলুম, বোনদের দিলুম। নানা কথা হল—দেশের স্বাস্থ্য, টেনান্সি অ্যাক্ট, কমনওয়েলথ। তারপর তাঁরা নেমে গেলেন। গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে, হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন: 'আরে ভালো কথা, আপনার নাম-ঠিকানাটা তো জানা হল না! বলুন বলুন—

তিনি কাগজ কলম বের করলেন। একবার বললুম—শুনতে পেলেন না—আবার বললুম—'রহিমুদ্দিন চৌধুরী।'

'অ্যাঁ ?'

"রহিমুদ্দিন চৌধুরী।"

'অ'

লিখে নিলেন কিন্তু হাত কাঁপল। ঢোঁক গিলে বললেন, "তা বেশ বেশ। কিন্তু ধরার উপায় নেই, দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী—তাই নয় গো ?"

দেখলে মনে হয় ঠিক বাঙালী—তাই নয় গো ? আমি চেঁচিয়ে বলতে চাইলাম : "এখন কি বুঝলেন তবে পাঞ্জাবী ?" কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বের হল না।

আবহাওয়াটা সহজ করার জন্যে বোন দুটি তেমনি হেসে বলল—"ভুলে যাবেন না, আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রীট।" হাসবার চেষ্টা করলুম।

গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে পেলাম খোকার হাত থেকে মা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন খাবারটা। তোমার হাতের তৈরি সেই খাবারের টুকরোটা প্ল্যাটফর্মে পড়ে রইল। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল—মনে হল কামরাসুদ্ধ লোককে ডেকে বলি : "দেখো তোমরা,—বড় অবিচার হল, দেখো। কেউ কিছু জানল না। আমি চুপচাপ বসে রইলাম—সমস্ত দিনটাই আমার মাটি !

সব কথা এখন আর মনে নেই—মনে রাখতেও চাইনে, মাঝে মাঝে বোন দুটির কথা কানে ভাসছে : 'ভুলে যাবেন না—আসবেন ঠিক—বিডন স্ট্রীট।' মনে মনে বলি :

"না, তোমাদের ভুলব না বোন—তোমরাই নতুন বাংলা—তোমাদের মুখ চেয়েই যে আমরা বেঁচে আছি—তোমাদের ভুলব না।" চিঠির উত্তর দিও।...

তোমার রহিম

খামের উপর ঠিকানা লেখা :—

আমিনা চৌধুরী

উজানীপাড়া, হাওড়া

[দুই]

বাগেরহাট

বৌ—

আজ সকালে অমলের বাসায় এসে উঠেছি। পথে আসতে দেখছি বহু লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেছে। থমথম করছে সমস্ত শহরটা—লোকে জোরে কথা পর্যন্ত বলছে না। বুঝতেই পারছ, হঠাৎ একেবারে এর মাঝখানে এসে পড়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। ব্যাপারটা ভালো করে বোধগম্য হওয়ার আগেই শুনি অমল চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছে—মালপত্র বাঁধাছাদা হচ্ছে। দু-একদিনের মধ্যেই ওরা পাকিস্তান ছেড়ে কলকাতায় রওনা হবে। আমাকে ওরা আশা করেনি—অমলের বৌ একটু ফিকে হাসল।

"ব্যাপার কী অমল? কী খবর বৌদি? তোমরাও শেষকালে চললে?"

বৌদি হাসবার চেষ্টা করল, "তোমাদের দেশে তো আর আমাদের জায়গা হবে না ঠাকুরপো!"

"আমাদের দেশ? আমাদের দেশ মানে? খুলনা তো অমলের দেশ—আমার দেশ ২৪ পরগনা—যাচ্ছ তো আমার দেশেই শুনছি।"

"আজকাল আর তা নয়—এখন মোছলমানের দেশ পাকিস্তান আর হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থান।" অমল বলল বৌদিকে: "তুমি যা করছিলে তাই করো গিয়ে।" জিনিসপত্র গোছাতে বৌদি চলে গেল। চুপচাপ অমলের দিকে চেয়ে বসে রইলাম। অমলের বাচ্চাটা নতুন হামা দিতে শিখেছে—ফুটফুট করছে সুন্দর—সামনে দুটো দাঁত উঠছে। সে তার বাপের পা ধরে দাঁড়াতে গিয়ে ধপ করে পড়ে কেঁদে উঠল। অমলের ভ্রূক্ষেপ নেই।

"শোন্ রহিম, কথা আছে তোর সঙ্গে।"

"বল্, শুনছি।" বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলুম।

অমলের কাছে যা কথা শুনেছি তার মোট কথাগুলো তোমাকে জানাচ্ছি; শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে নমঃশূদ্রদের গ্রামে একটা

ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেছে। নমঃশূদ্ররা বেশির ভাগই চাষী—নয়তো জেলে। স্বভাবতই তারা গরিব। কিছু দিন ধরে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা একজোট হচ্ছিল। তাদের দুজন নেতাকে ধরবার জন্য পুলিশ ওয়ারেন্ট বের করে। নেতাদের মধ্যে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান। তাদের ধরার জন্য গ্রামে যখন একদল পুলিস ঢোকে চাষীরা তাদের বলে ফিরে যেতে। তাতে কাজ না হওয়ায় কিছুটা উত্তম মধ্যম দিয়ে তারা তাদের বের করে দেয় গ্রাম থেকে। এর পরেই ঘটনার শুরু। বহু আর্মড পুলিস আর বে-সরকারী গুণ্ডা বাহিনী গিয়ে হাজির গ্রামে। স্ত্রীপুরুষনির্বিচারে শুরু হয় প্রচণ্ড অত্যাচার। গ্রামকে গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দেয়—আর যা পায় লুট করে নিয়ে আসে। সমস্ত মানুষ গাঁ ছেড়ে পালাতে শুরু করে—আর্ত চিৎকারে আকাশ বাতাস ভরে ওঠে। এদিকে জোর প্রচার চলতে থাকে যে হিন্দুরা হচ্ছে পাকিস্তানের শত্রু—ওদের তাড়াও। এই সুযোগে শহরে গুণ্ডারা হিন্দুদের কয়েকটা দোকান লুটপাট করে—আগুন দেয়। সদর রাস্তায় ওরা শাসাতে থাকে হিন্দুদের। আনোয়ারকে তোমার মনে আছে? সেই যে স্কাউণ্ড্রেলটা কলেজে একদিন তোমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করেছিল? শুনেছিলাম একজনের সঙ্গে শেয়ারের বিজনেস করার নাম করে তার যথাসর্বস্ব মেরে দিয়ে পাকিস্তানে চলে এসেছে। এখন শুনি সেই নাকি এখানকার গুণ্ডা বাহিনীর মস্ত বড় কর্তা। তিনিই নাকি লীড করছেন!

শুনে পর্যন্ত রক্ত টগবগ করে ফুটছে। রাসকেলটার যদি একবার দেখা পাই তো ওর টুঁটি আমি ছিঁড়ে দেব—এ তুমি দেখে নিও! অমলরা চলে যাচ্ছে—কাল না গেলে পরশু যাবে—নয়তো তার পরদিন। কী বলব ওদের বলো তো? লজ্জায় দুঃখে আমার বুকটা খান খান হয়ে যাচ্ছে। কী যেন আমার একটা করা উচিত, বুঝতে পারছি না। অমলের দেশ ছেড়ে যদি অমলকে চলে যেতে হয়, আমার দেশকেই বা আমি আঁকড়ে থাকব কোন্ যুক্তিতে? ভাবতে খারাপ লাগছে বড়ো। এখানে বিশেষ কাউকে চিনি না। একটি পরিচিত ছাত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে—তারা পীস কমিটি করছে বলল। সব কাজকর্ম এখানে প্রায় বন্ধ। ভাবছি কাল পরশু নাগাদ ঢাকা চলে যাব। সেখানে শুনছি কিছু কিছু কাজ পাবার সম্ভাবনা আছে। অন্য কিছু ভেবো না। আজকের

দিনে মানুষকে আর সহজে বেশি দিন বিভ্রান্ত করে রাখা যায় না। মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই—এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে। ওখানকার পরিচিতদের কাছে এখানকার সঠিক খবরটা দিও।...

তোমার রহিম

[তিন]

ঢাকা

বৌ—

তোমার চিঠি পেয়ে আরো ভাবনা বাড়ল। কলকাতার কাগজগুলো খুলনার ব্যাপারকে যদি এইভাবে প্রচার করতে শুরু করে থাকে তাহলে তার সাংঘাতিক ফল ফলবে। যে পয়সা লাভের আশায় ওরা দানবকে জাগিয়ে তুলছে সেই দানবই ওদের ধ্বংস করবে। তবে ওরা বোধ হয় নিশ্চিন্ত যে সময় বুঝে দাঙ্গা বাঁধানো বা থামানো—এটা ওদেরই হাতে! এখানকার কাগজগুলোও ঠিক তাই শুরু করছে। পরস্পরের ওপর সন্দেহ আর অবিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে, কখন কী ঘটে সেই আশঙ্কায় সবার চোখেমুখে বিষন্নতা দেখছি, এমন যদি কোন শক্তি থাকত যা এই সমস্ত নোংরামিকে পায়ে মাড়িয়ে মনুষ্যত্বের ধ্বজাকে উচুঁতে তুলে ধরবে, শুধু আমি নয় প্রায় সবাই মনেপ্রাণে এই কথাটি অনুভব করছে—কিন্তু সে কই? এখানে সরকারী মহলে কিছু কাজের আশায় ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। আমি যে বাঙালী, এই কথাটাই প্রায় ভুলে যেতে বসেছি। তুমি তো জান, আমি পয়সা খরচ করে উর্দু ভাষা শিখেছিলাম। উর্দু সাহিত্যকে আমি ভালো বাসি। কিন্তু যখন সেটা শাসনের দণ্ড হয়ে সোজা ঘাড়ের ওপর পড়তে চায়, আমার সংস্কৃতির টুঁটি টিপে ধরে, তখন তাকে বর্জন করাই মানুষের কাজ। সকলের কথায় সোজা বাংলায় উত্তর দিই—বুঝলে ভালো, না বোঝে পরোয়া নেই। কাজেই কাজ যে জুটবে না বেশি, তা বোধহয় বুঝতে পার।

তোমার রবীন্দ্রসংগীতের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছে জেনে ভারী কষ্ট হচ্ছে। তোমাকে দেখে যারা কথা না বলে মুখ ফিরিয়ে

নিয়েছে, আমি অন্তত বিশ্বাস করি তাদের রবীন্দ্রসংগীত শেখবার কোন অধিকার নেই, কিন্তু এ বিশ্বাস হারিওনা যে এরা সবাই ভালো—এদের বাদ দিয়ে একা তুমি যাবে কোথায়? দুর্ভাগ্য দেশের অভিশাপ এখনো কাটেনি, সে দুর্ভাগ্য থেকে তুমি আমি বাদ যাব কেমন করে বলো, বৌ! মনুষ্যত্বের অপমান যখন দেখি, মনে হয় আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খাক করে দিই এই হতভাগা দেশের পচা আবর্জনাগুলোকে।

সেদিন শুনলুম কয়েকটা চ্যাংড়া ছোঁড়া মিলে সদর রাস্তার ওপরে এখানকার কলেজের পণ্ডিতকে যাচ্ছেতাই অপমান করেছে—টিকি কেটে দিয়েছে, মুখে গোমাংস দিয়েছে জোর করে। ভাবতে পার? আমি শুনে এখানকার মাতব্বরদের বললুম: "আপনারা থাকতে চোখের সামনে এইসব অনাচার ঘটছে—আপনারা কি ঠিক জানেন যে আপনারা এখনো বেঁচে আছেন?"

তাঁরা বললেন: কী করব—ওদের হাতে বন্দুক আছে, পেছনে পুলিস আছে। ওরা হুমকি দিয়েছে যে-কেউ ওদের বাধা দেবে তারাই পাকিস্তানের শত্রু। তাদের ঘরদোর ওরা জ্বালিয়ে দেবে, তাদের খুন করবে—ইত্যাদি। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় গোটা জাতটারই শিরদাঁড়া বেঁকে গেছে, নইলে কটা আগাছাকে উপড়ে ফেলা যায় না? আগাছাই বোধহয় জন্মাচ্ছে বেশি—বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও স্বীকার করতে হবে।

এখানে আর মোটে ভালো লাগছে না বৌ। এধারে এসেই বোধহয় ভুল করেছি—তোমাকে ছেড়ে আর এক দণ্ডও থাকতে পারছি না। ... কাজকর্ম চুলোয় যাক্, দু-একদিনের মধ্যেই পাড়ি দেব। অমলের চিঠি পেয়েছি—ওরা আগামী কাল রওনা হবে। কলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে লিখেছে। ওখানেই ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিও। কোনরকমে চলে যাবেই।

তোমার রহিম

[এর পরের চিঠিটা প্রায় কুড়িদিন পরে লেখা। মনে হয় এর আগে আরো চিঠি লিখেছিলেন—যে কোন কারণেই হোক সেটা নেই]

[চার]

আমিনা—

আমি—বোধহয় শীগগিরই পাগল হয়ে যাব। গত সাত দিন ধরে এক সেকেণ্ডের জন্যও ঘুমোতে পারিনি—পাগলের মতো সারা শহরে ঘুরে বেড়িয়েছি। মনে হচ্ছে মনুষ্যত্ব শেষ হয়ে গেছে—বীভৎস তাণ্ডব চলছে পশুত্বের। চারিদিকে চিৎকার, কান্না আর পৈশাচিক উল্লাস। তার ওপর আজ আট দিন তোমার কোন চিঠিপত্র নেই। হাজার হাজার রিফিউজি এসে জড়ো হচ্ছে। তারা বলছে কলকাতায় আর একজন মুসলমানও বেঁচে নেই। বিশ্বাস করা উচিত কি না সে বিচারের বুদ্ধিও আমার লোপ পেয়ে গেছে। তুমি কোথায় আছ? তুমি এখনও আছ তো? একথা আজ আর কোন মানুষকে জিজ্ঞেস করি না—জিজ্ঞেস করি সূর্যকে, জিজ্ঞেস করি গাছপালাকে—আর জিজ্ঞেস করি, আমার আমিনা কেমন আছে? কোথায় আছে?

অমলের একখানা চিঠি এসেছে। বর্ডার থেকে ওদের মারধোর করে সমস্ত লুটপাট করে নিয়েছে। বৌদিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেছে—অমল কোনরকমে বাচ্চাটাকে নিয়ে রানাঘাটে পৌঁচেছে। অমল লিখেছে—"আমার অবস্থার কথা না লেখাই ভালো, তবে এটুকু জ্ঞান এখনও আছে যে এ খবর কলকাতার কাগজওয়ালাদের হাতে পড়া উচিত নয়। যা ভালো হয় করিস। আমি দেহমনে সম্পূর্ণ অথর্ব হয়ে গেছি।" আমি এখনই বেরিয়ে পড়ছি। এখানে আর কয়েক ঘণ্টা থাকলে বোধহয় আত্মহত্যা করে বসব। বৌদিকে খুঁজে বের করতেই হবে। তোমার খবর পেলে মনে অনেকটা জোর পেতুম। জানি না আবার কবে তোমায় দেখব—জানি না দেখব কিনা।

আমার অক্ষমতাকে ক্ষমা কোরো। বড়ো অহংকার ছিল আমার দেশকে আমি চিনে ফেলেছি—সে অহংকার চূর্ণ হয়েছে। মনুষ্যত্বকে বড়ো করতে গিয়ে পশুত্বকে ছোট করে দেখেছি—তাই পশুর প্রতিরোধ শুরু হয়েছে। যেখানেই থাক, যেমন থাক—সাবধানে থেকো। তোমাকে আমি হারাতে পারব না বৌ, অমলের মহত্ত্ব আমার আছে কিনা, সে পরীক্ষা দিতে আমি পারব না। আমি সাধারণ মানুষ।...

তোমার রহিম

চিঠি এই কটাই। পড়ার পর হাওড়া উজানীপাড়ায় গিয়ে খোঁজ করেছি শিল্পী রহিমুদ্দিনের বাড়ি কোনটা। কেউ বলেছে—'জানি না।' কেউ বলেছে—'এ পাড়ায় কোন নেড়ে-ফেড়ে আর নেই মশাই।' একজন পানওয়ালা শেষ পর্যন্ত দেখিয়ে দিল একটা একতলা বাড়ি—তার দুখানা ঘর নিয়ে ওরা থাকত। বাড়িটার শোচনীয় অবস্থা, দরজা জানালার একটারও কপাট নেই—মাঝখানে কেবল একটা চট ঝুলছে। ডাকাডাকি করলে কেউ সাড়া দেয় না। শেষ পর্যন্ত চট সরিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখি অন্তত বিশজন মেয়েছেলে—বাচ্ছাকাচ্ছা সুদ্ধ কেউ বসে কেউ শুয়ে রয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখে সবাই যেন চমকে উঠল। বাড়িটার চেয়েও তাদের অবস্থা খারাপ। জিজ্ঞাসা করলাম: "রহিমুদ্দিন চৌধুরী এখানে থাকেন?"

তারা কেউ নাম শোনেনি রহিমুদ্দিনের—সেদিন সকালে খালি ঘর পেয়ে আশ্রয় নিয়েছে—পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু সব। শুনলাম এরি মধ্যে চারবার হুমকি দেওয়া হয়েছে—রাতের মধ্যে উঠে যেতে হবে। একটি মধ্যবয়সী মহিলা ঘরের এককোণে বসে বমি করতে শুরু করলেন, সবাই নির্বিকার। একধামা খই মুড়ি নিয়ে দুটি ছেলে ঢুকল—দেখে মনে হল স্কুলের ছাত্র। তারাই ওদের এবাড়িতে জোর করে জায়গা দিয়েছে—দেখাশোনা করছে। তাদের জিজ্ঞাসা করলুম। একজন চিনত রহিমুদ্দিনকে—আমিনাকেও চিনত। তার দিদি রহিমুদ্দিনের কাছে ছবি আঁকা শিখতে আসত—সেও আসত দিদির সঙ্গে। তার কাছে সব খবর পেলুম। বলল: "মাস্টারমশাই শুনেছি পাকিস্তানে আছে—কিন্তু আমিনা দিদি বোধহয় বেঁচে নেই। একদিন রাতদুপুরে এই ঘরটায় শিকল বন্ধ করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা করেছি আগুন নিভিয়ে ওদের উদ্ধার করতে—কিন্তু পারিনি—তখন ভীষণ গুলি চলছিল।" ছেলেটির চোখ ছলছল করতে থাকে। বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম—সমস্ত দেওয়ালগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে—পাশেই একটা নিমগাছ ঝলসে কুঁকড়ে গেছে। আগুন লেগেছিল সত্যিই। নন্দাকে ব্যাপারটা বলিনি—কেননা একটা সন্দেহ আমার হয়েছে আমিনা যদি পুড়েই মরে থাকে—ড্রেসিং টেবিলটা অক্ষত রইল কী করে?

ছাত্রটি বলেছিল : টেবিলটা ছিল পাশের ছোট ঘরটায়। হয়তো আমিনাও সে ঘরে ছিল। কিন্তু সে গেল কোথায়?

নন্দার বিশ্বাস, কাগজে খবরটা বেরোলে আমিনা এসে নিয়ে যাবে তার ড্রেসিং টেবিলটা তাই এই কাহিনী লেখা। আয়নাটা নন্দা কাপড় দিয়ে মুড়ে রেখে দিয়েছে।

পরিশিষ্ট

কাহিনীর এখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই পাঠক-পাঠিকার কাছে। হয়তো তার সঙ্গে এই কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই—কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। গত পয়লা এপ্রিল একটি বাংলা কাগজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে :

"হাওড়া স্টেশনের নিকট গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাহার কাছে একটা ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি তুলি ও কিছু স্কেচ ছবি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ হয় সে হাওড়া স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে পাগলের ভান করে ও বলে : "একজন মানুষ।"

খবরের হেডলাইনে লেখা—'পাকিস্তানের গুপ্তচর গ্রেপ্তার।'

গুরমুখ সিং জিত
ঠাণ্ডা প্রাচীর

গুরমুখ সিং জিত পাঞ্জাবের মানুষ। মাতৃভাষা গুরুমুখী। কিন্তু তিনি হিন্দীতেই লেখেন। হিন্দী ভাষার ওপর তাঁর অসাধারণ দখল। দখল আছে বলেই, ছন্দের মাধুর্যে তাঁর গদ্য অলঙ্কৃত। আর এই অলঙ্কৃত ছন্দের মাধুর্য নিয়ে তিনি ছুটে গিয়েছেন দেহাতী মানুষের কাছে, শহরের মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে। কখনও তিনি মানুষের মন নিয়ে খেলা করেছেন, কখনও সমস্যার গভীর থেকে গভীরে চালিয়ে দিয়েছেন তীক্ষ্ণ তরোয়াল। আর সেই গভীর থেকে তুলে এনেছেন রক্তাক্ত মানুষের মন—মানুষের হৃদয়। তাঁর 'চেনাব বহতা রহা,' 'দুখতি রগ,' 'তুম হি বাতাও'—শুধু মনস্তাত্ত্বিক গল্পই নয়—এসেছে নতুন ধরনের মানুষ। 'ভীল কা বিবাহ'—লোক কথার আমেজে লেখা। উপন্যাস 'শিখর কা শৃঙ্গ' আত্মকথনমূলক—বিশ্লেষিত হয়েছেন একজন বুদ্ধিজীবী। তিনি মূলত গল্প লেখক।

গভীর এক চিন্তায় ঈশ্বরদাস ডুবে গেল। মে মাসের, প্রচণ্ড গরম, লু বইছে। ও বারবার অন্যমনস্ক এবং বিচলিত হয়ে পড়ছে। ডান হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো। খসখস করে পিঠ চুলকোতে লাগল। বিক্ষিপ্ত চিন্তাগুলো তার মগজ সমানে খামচে চলেছে, তার এতটুকু সুরাহা না দেখে গায়ের গেঞ্জিটা সে খুলে ফেলল। এবার খোলা গেঞ্জিটা দিয়ে পিঠ রগড়াতে লাগল। ওর মনের গভীরে যে ভয় এবং বিহ্বলতা দানা বেঁধে রয়েছে তা যেন বাইরের ভয় এবং বিহ্বলতাকে হার মানাচ্ছে। নিজের মনের সঙ্গে যুঝে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাইছে। সেই সঙ্গে সে করছিল কৃতকর্মের লাভ-ক্ষতির একটা হিসেব। অতীতের ঘটনাকে সমস্ত দিক থেকে উলটেপালটে সে পরখ করে নিতে চাইল। ভাবতে ভাবতে ওর মাথা টনটন করে উঠল।

পাকিস্তান হয়েছে খুব বেশি হলেও মাত্র বছর আষ্টেক হল। কুচা নবী করিমে, তার প্রতিবেশী মোহনলালের বাড়ি থেকে প্রায় সব সময়েই গুমরে গুমরে কান্নার একটা করুণ আওয়াজ ভেসে আসে। মায়াবন্তীর এই গুমরে গুমরে কান্না কখনো কখনো বা উচ্চরোলে ওঠে। পাকিস্তান

হওয়ার পর বিপদ সবার ওপরেই একসঙ্গে নেমে এল, কিন্তু ওদের বিপদ ছিল একটু ভিন্ন ধরনের,—অন্যের তুলনায় অনেক বেশি। পিণ্ডি ভাটিয়াতে সবকিছু খুইয়ে ওরা সুখে মণ্ডিতে আসে ট্রেন ধরতে। মৃত্যু-ভয়ে ওদের প্রাণ কুঁকড়ে ছিল। ঐ সুখে মণ্ডি স্টেশন থেকে এর আগেও ওরা বহুবার ট্রেন ধরে হাফিজাবাদ সাঁগলা হিল বা জড়াওয়ালে গিয়েছে। প্লাটফরমের ওপর একটা পিপুল গাছ। তার নীচের বেঞ্চটায় মোহনলাল এসে হামেসাই বসত। এই বেঞ্চে বসে থাকতে খুব ভালো লাগত ওর। সুখে মণ্ডি স্টেশনের প্রতিটি ইট কাঁকর ওর পরিচিত। কিন্তু সেদিন এই প্লাটফরমের সবকিছুই অপরিচিত। মনে হল এ যেন প্লাটফরম নয়, কোন অন্ধকার পাহাড়ী ঘাঁটির শেওলা-পরা পিছল ঢাল। তখন মনের মধ্যে একটা সাংঘাতিক ভয়, আতঙ্ক।

অবশেষে এই ভয়টাই একটা ঘটনায় রূপান্তরিত হল।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে উঠল। সেই থমথমে অন্ধকারে মোহনলাল আর মায়াবন্তীদের পরিবারের সবাই আরও সিঁটিয়ে গেল। বেঞ্চের ওপর আর যারা বসেছিল তারাও তাদের তল্পিতল্পা সামলাচ্ছে। ভয়ে তাদের বুক ধুকধুক করছিল। এর মধ্যে ট্রেন এসে গেল। শুধু পা দুটো রাখার জন্যে কোনরকমে একটু জায়গার প্রয়োজন। স্টেশনে ঢুকে ট্রেনটা ঝিমুতে লাগল, ছাড়বার আর নামগন্ধ নেই। ট্রেনের পুরুষ মহিলা শিশু—সবাই ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। একটা আর্ত গুঞ্জন কণ্ঠনালি দিয়ে নিরুচ্চারে বেরিয়ে এল। স্টেশনের আশেপাশে কোথায় যেন ঢাকের আওয়াজের মতো একটা গুমগুম শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে এক বিকট ভয়-ধরানো চীৎকার মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

কামরায় যারা বসেছিল তাদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। মায়েরা শিশুদের বুকের মধ্যে টেনে নিল, পুরুষরা লটবহরগুলো আরও কাছে টেনে আগলে ধরল। চারদিকেই চীৎকার আর চেঁচামেচি। প্ল্যাটফরম জুড়ে ভালা আর বল্লম বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিচ্ছে। জ্বলন্ত মশালগুলো এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে। মুহূর্তে চারিদিকে একটা উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ল।

জাঠরা প্রতিটি কামরায় লুটতরাজ চালাচ্ছে। সামনে যাকে পাচ্ছে,

তাকেই কেটে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলছে। কামরাগুলোতে লাশের স্তূপের মধ্যে রক্তের ঢেউ বইতে লাগল। এক সময় এই রক্ত শুকিয়ে জমাট বাঁধল। কিন্তু কেউই জানল না, কে মরেছে, আর কে প্রাণে বেঁচে আছে। যারা কোনরকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল, তারাও নিজেদের মৃত বলেই মনে করল। লাশের স্তূপের মধ্যে তারা শ্বাস বন্ধ করে মরা মানুষের মতো পড়ে রইল।

পরের দিন ট্রেন যখন অমৃতসরে পৌঁছল, তখন কয়েকটি সেবাদলের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী রুটি আর জল নিয়ে প্ল্যাটফরমে হাজির ছিল। ট্রেনের কামরার মধ্যে মৃত মানুষের স্তূপ দেখে তাদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। মোহনলাল আহত হয়েছিল, কিন্তু তখনও জ্ঞান হারায়নি। মায়াবন্তী কামরার এক কোণে ভয়ে বিহ্বলতায় সিঁটিয়ে বসেছিল। এই প্রথম তারা পরস্পরকে দেখতে পেল। কাঁদতে কাঁদতে মায়াবন্তীর চোখের জল চোখেই শুকিয়ে গিয়েছিল। কোনরকমে সে কোলের বাচ্ছাটাকে সামলে রেখেছে। দাঙ্গাবাজরা ছোট কৃষ্ণাকে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। তার মাথা একদিকে আর ধড় অন্যদিকে পড়ে আছে। বেঞ্চের নীচে নিজেকে কোন রকমে গুটিয়ে লুকিয়ে রেখেছিল মোহনলাল। মায়াবন্তী ওকে বেঞ্চের নীচ থেকে টেনে বের করে বুকে জড়িয়ে ধরল। কান্তার কথা মনে পড়তেই তার খোঁজ শুরু হয়ে গেল। থৈ থৈ জমাট-বাঁধা রক্তে মোহনলালের পা লাল হয়ে গেছে। মৃত মুখগুলো সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কামরায় পড়ে-থাকা মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে কান্তা নেই,—কান্তার কোন হদিশ ছিল না।

প্রাণে বেঁচে থেকেও মায়াবন্তী যেন প্রাণহীন—মৃত। খবর পাওয়া গেল জালিমরা কান্তাকে তুলে নিয়ে গেছে। সেই সময় কান্তার বয়স খুব বেশি হলে বারো-তেরো। জীবনের এত বড় একটা দগদগে ঘা ও কিভাবে সারিয়ে তুলবে? মোহনলাল কৃষ্ণার মাথাটা দু হাতে তুলে আবেগে চুমু খেল। মায়াবন্তীর দু চোখ কান্নার আবেগে ফেটে পড়তে চাইছে, কিন্তু তার চোখে এক ফোঁটাও জল নেই। তার কাছে কিছু আর অবশিষ্ট নেই।

ঘন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে খড়কুটোর মতো উড়তে উড়তে ওরা দিল্লীতে এসে পৌঁছল। প্রাণের ধ্বনি, স্বর কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ স্থির

হয়ে যেতে লাগল। একদিন সেই মোহনলাল চাঁদনীচকে একটা ঘড়ির দোকান খুলে বসল। দোকান ভালোই চলছে। তারপর সোহনলাল বি. এ. পাস করে ডেপুটি কমিশনার অফিসে উচ্চপদে চাকরি পেল। কিন্তু এই আট বছর ধরে কান্তার জন্যে যে দগদগে ঘা সৃষ্টি হয়েছে তা এতটুকুও শুকোয়নি; বরং সেই ঘা থেকে এখনও পুঁজ আর দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। আর মায়াবন্তী শূন্যতার ব্যথায় হামেশাই বেহুঁশ হয়ে পড়ে। চন্দ্রকান্তাকে খুঁজে বের করার জন্যে মোহন সব রকম চেষ্টা করে দেখেছে। হোম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিয়ে পাকিস্তানের হোম মিনিস্টারের কাছে বিশেষ আবেদন করে চিঠি পাঠিয়েছে, 'স্পেশাল স্টাফ দিয়ে দয়া করে কান্তার খোঁজ করুন'। সোহনলালও ডেপুটি কমিশনারকে দিয়ে পাকিস্তান হাই কমিশনারের কাছে আবেদন জানায়, যাতে তিনি ওর বোনকে খুঁজে বের করার জন্যে যথাসম্ভব চেষ্টা করেন। হাই কমিশনার পাকিস্তান সরকারকে দিয়ে খবরের কাগজে পুরস্কার ঘোষণা করে সংবাদ ছাপেন। তাদের জেলার যে সব মেয়েদের লুট করে নেওয়া হয়েছিল, এই আট বছরে তাদের অনেককেই ফিরে পাওয়া গিয়েছে। সেইসব মেয়েদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেল, কান্তা এখন চৌধুরী পরিবারের বৌ। এই খবর পাওয়ার পর তারা আরও জোর তল্লাশি চালাল। কিন্তু তবুও কান্তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না। মায়াবন্তী নিজের কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চীৎকার করতে থাকে, "হায়, কান্তার মৃত্যু কেন হল না। এর চেয়ে ওর মৃত্যু ভালো ছিল। গাড়িতেই ওকে কেন কেটে ফেলল না।" কাঁদতে কাঁদতে সে ভগবানের কাছে মিনতি করে বলে, "ভগবান, ওর মৃত্যুর খবর যেন ঠিক হয়। বহলোলপুরে চৌধুরী নিসার আহমদের ঘরেও আছে এ খবর যেন মিথ্যে হয়।" কিন্তু মনকে মায়াবন্তী কেমন করে বশ করবে? বুকের মধ্যে তো সবসময়েই চন্দ্রকান্তার নাম গুনগুন করছে! চন্দ্রকান্তা যে তার দুই সন্তানের চেয়ে অনেক, অনেক প্রিয়। কান্তাকে সে তার হাতের তালুতে সযত্নে-রাখা ফুলের মতো আগলে রেখেছিল। গরম হাওয়ার ঝাপটা এসে তার শরীরকে ঝলসে দেবে, সে তা কখনই ভাবতে পারেনি। 'কান্তা, এর থেকে ভালো ছিল আতুর ঘরে তোর মৃত্যু। তোকে আমি মেরে ফেললাম না কেন? এরা আমার দুঃখ—আমার ব্যথা বোঝে না।'

বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। সোহনলাল হয়ত সবে অফিস থেকে ফিরেছে, সে মাকে কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দেয়, 'মা কেঁদো না।'

ঈশ্বরদাসকে যেন একটা মশা জোরে কামড়ে দেয়। জ্বালায় সে আবার জেগে ওঠে। কখন যে তার দু চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল সে জানে না। তন্দ্রার আমেজ ছুটে গেলে ও আবার দরদর ঘাম মুছতে লাগল। পুছতে পুছতেই ওর দু' চোখ আবার তন্দ্রায় ঢলে পড়ে।

"চাচাজী, বাবা আপনাকে ডাকছেন। তাড়াতাড়ি আসুন, মা বেহুঁশ হয়ে পড়েছে।" ঈশ্বরদাস সবে কাছারি থেকে ফিরেছে। ফিরতে না ফিরতেই মোহনলালের ছেলে ওকে ডাকতে আসে।

এর আগেও সে মায়াবন্তীকে দেখেছে, আজকেও বিশেষ কোন নতুন বৈশিষ্ট ওর চোখে ধরা পড়ে না। কিন্তু কেমনতরো যেন সব ব্যাপারটা। মায়াবন্তী অনেকক্ষণ ধরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। ওর দাঁত ফাঁক করে মোহনলাল একটা চামচে করে জল দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই কপাটি-লাগা দাঁত ফাঁক করতে পারছে না।

ভোর থেকেই কান্তার কথা আজ কেন যেন মায়াবন্তীর বারবার মনে পড়ছিল। তাই হা-হুতাশ করে সমানে কেঁদে চলেছে। ডাক্তার মায়াবন্তীকে পরীক্ষা করে ইঞ্জেকশন দিলেন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর ডাক্তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে লাগলেন। এমন সময় বাইরে একটা লরি এসে থামল। লরির শব্দ শুনে ঈশ্বরদাস ঝটিতি বাইরে ছুটে গেল। দেখল, একটা পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে থানার বড়বাবু নামলেন। নেমে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি মোহনলালজীর বাড়ি ?"

বড়বাবুর প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরদাস শুধু ঘাড়টা সামান্য একটু কাত করল।

বড়বাবু ইশারা করে কাকে যেন গাড়ি থেকে নামতে বললেন। একজন যুবতী গাড়ি থেকে নামল। মেয়েটি ঈশ্বরদাসের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ইতিমধ্যে মোহনলালও বাইরে বেরিয়ে এল। মোহনলাল যুবতীটিকে দেখেই চিনতে পারল—এতো কান্তা। নিজের চোখকে যেন

বিশ্বাস করতে পারছে না মোহনলাল। সামনে এগিয়ে গিয়ে সে কান্তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় কপালে সস্নেহে চুমু খেতে লাগল।

কিন্তু কান্তার উদাস চেহারায় কোন উচ্ছ্বাস বা পরিবর্তন দেখা গেল না। সে এই অপ্রত্যাশিত পরিবেশকে জানার, বোঝার চেষ্টা করছিল। মোহনলাল তাকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে মায়াবন্তীর জ্ঞান ফিরে আসছিল। মোহনলাল মায়াবন্তীকে বলল, "এই দেখ, এই যে কান্তা এসে গেছে।" কিন্তু সে মোহনলালের কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। মায়াবন্তী চোখ মেলে চাইল। সত্যিই তার সামনে কান্তা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হ্যাঁ, কান্তাই, যাকে সে তার প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসে, যার জন্যে গত আট বছর ধরে সে তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়ে ফেলেছে, যাঁর জন্যে সে দুঃখ এবং বেদনায় জর্জরিত। এই কান্তার জন্যেই তো সে তার কন্যা কৃষ্ণার ভাগ্যের পরিণতি ভুলে রয়েছে।

চন্দ্রকান্তাও তার মার দিকে খাঁ খাঁ চোখ নিয়ে তাকিয়ে রইল। মুহূর্তে মায়াবন্তী উঠে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। আজ কত বছর বাদে তার চোখ কান্নায় ভরে উঠল। এ ক'বছর মায়াবন্তীর দু চোখের জল শুকিয়ে মরুভূমির মতো হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার তাতে বান ডাকল। কিন্তু কান্তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন ঠাণ্ডা ছাই। বাড়ির কাউকেই সে মনে করতে পারছে না। ছোট ভাই সোহনলালের সঙ্গেও সে মন খুলে মিশতে পারছে না। মা আদর করে কান্তাকে পাশে বসালো।

কাররই খেয়াল হয়নি, থানার বড়বাবু তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মোহনলাল বড়বাবু এবং সঙ্গের তিনজনকে খুব আদর-আপ্যায়ন করে বসাল। রোশন কাপুর রিকভারি স্টাফের সঙ্গে যুক্ত, চন্দ্রকান্তাকে উদ্ধার করার জন্যে তিনি স্বয়ং অপারেশনে গিয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনা তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন। ইতিমধ্যে চা তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যত্ন করে সবাই তাদের চা খাওয়াল। অনেকক্ষণ ধরে ওদের কথাবার্তা চলল। এর মাঝে চন্দ্রকান্তা একটি কথাও বলেনি। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, সে যেন নিজের বাড়িতে নয়, অন্য কারো বাড়িতে এসেছে। ওর চোখে মুখে কোন আনন্দ উচ্ছ্বাসের ঝলক নেই, নেই একবিন্দু চোখের জল। থানার বড়বাবু যখন ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছিলেন

কান্তা তখন মাথা হেঁট করে বসেছিল। আর মায়াবন্তী মাঝে মাঝে ওর মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।

বারান্দায় কার যেন পায়ের শব্দ। ঈশ্বরদাসের স্বপ্নের জাল মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। প্রচণ্ড গরমে অবস্থা কাহিল, গেঞ্জিকে হাত পাখা বানিয়ে হাওয়া খেতে লাগল। মাঝ-দুপুরের ঢলে-পড়া প্রচণ্ড রৌদ্র-তাপে নিজেকে সে ভীষণ ক্লান্ত অনুভব করছে।

কয়েক দিন যেতে না যেতেই মায়াবন্তীর সে উৎসাহ আর উদ্দীপনা ঝিমিয়ে পড়ল। সস্নেহে চন্দ্রকান্তাকে কাছে বসিয়ে খোঁজখবর তো নেয়ই না, বরং কথায় কথায় ওর ওপর খিঁচিয়ে ওঠে। কান্তা তার হৃদয়ের গোপন কথা গোপন রেখে সেই বহুদিন আগের দুর্ঘটনার কথা বলে চলে……

"ওরা যখন ভালা আর বল্লম উঁচিয়ে আল্লাহ আকবর ধ্বনি দিতে দিতে গাড়িতে উঠল, আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। কৃষ্ণা আমার পাশেই বসে ছিল। দৈত্যের মতো একটা লোক কৃষ্ণাকে হেঁচকা টানে তার কাছে টেনে নিয়ে রাম-দা দিয়ে ওর গলা নামিয়ে দিল। আর একজন জোর করে টেনে হিঁচড়ে আমাকে গাড়ি থেকে নামাবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে করতে কখন যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম, জানি না।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, একটা খাটিয়ার ওপর আমি শুয়ে আছি। পাশেই একজন মহিলা বসে আছেন। তিনি আমার দিকে এক গ্লাশ জল এগিয়ে দিলেন। মহিলাটির ওপর চোখ পড়তেই আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। মহিলাটি এবং চারপাশের ঐ পরিবেশ যেন আমাকে আর দেখতে না হয়; আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম। বেশ কয়েকদিন এইভাবে কেটে গেল। খাওয়া নেই, মনের কোন স্থিরতা নেই। একজন যুবক মাঝে-মধ্যে এসে উঁকি মেরে দেখে যেত। সে এলেই আমি দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে থাকতাম। জানি না কখন আমার নিজের অজান্তেই চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছিল। ক্রমেই আমি আত্মস্থ হয়ে উঠলাম এবং নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। জানতে

পারলাম, আমাকে সুখে কী মণ্ডি থেকে তুলে বহলোলপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন বহলোলপুরে জেলাধীশ চৌধুরী গুলাম কাদিরের বাড়িতে আছি। এই কদিন ধরে প্রায় সারাক্ষণ যিনি আমার পাশে বসেছিলেন তিনি চৌধুরী সাহেবের বেগম। তাঁর চোখ দুটি গভীর মমতায় ভরা। বুঝতে পারলাম, আমি আমার পরিবার, ফেলে-আসা দিন এবং যে বিশ্বাস ও সংস্কারে অভ্যস্ত তা আর কোন দিনই ফিরে পাব না। কিন্তু তবু সবকিছু আমি স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারছিলাম না, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

ক্রমশ সমস্ত রহস্য আমার কাছে খোলসা হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম, আমি আর কোন দিনই বাবা-মার কাছে ফিরে যেতে পারব না। আমার মধ্যে যে সামান্য শক্তি এবং আবেগ অবশিষ্ট ছিল তা নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল। রহমত বিবি আমাকে খুব স্নেহ করতেন—আমার দুঃখকে ভোলানোর জন্যে সমস্ত রকম চেষ্টাই করতেন। বড় চৌধুরী সাহেবও সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। দেখতে দেখতে এইভাবে কয়েক বছর কেটে গেল।…

বাতাসের এক ঝটকায় দরজা হাট হয়ে খুলে গেল। একটা পাল্লা অন্য একটা পাল্লার সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে শব্দ হল। জ্বলন্ত আগুনের মতো লু এসে ঈশ্বরদাসের সমস্ত শরীর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল। 'হায় রাম!' বলে ঘাম মুছল, মুছে আবার ঝিমুতে লাগল।

ঈশ্বরদাসের মেয়ে সন্তোষ ওকে অনেকবার বলেছে, কান্তা সবসময় আনমনা থাকে, কারোর সঙ্গেই কথা বলে না। ওর দুচোখ যেন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে। আর ওর মুখের ওপর পড়েছে বিমর্ষতার একটা পুরু পলস্তারা।

একদিন সন্তোষ কান্তাকে পাকড়াও করে বলল, "কান্তা, তুই যে একেবারে বাড়ির বাইরে বেরুস না! এভাবে কদ্দিন চলবে?"

সন্তোষের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কান্তা চুপ করে বসে রইল। কিন্তু বারবার প্রশ্ন করাতে সে দায়সারা গোছের একটা উত্তর দিল, "কী করব বল! মন কিছুতেই মানতে চায় না। আমার এই হৃদয় নিয়ে কি করব?

আমাকে সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, আর ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করে। ওদের এই ফিসফিসানি দেখলে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করে মরি।"

সন্তোষ ওকে সান্ত্বনা দেয়, "যখনই তোর মন চাইবে আমাদের বাড়িতে আসিস। ভালো লাগবে।"

একদিন সন্তোষ কান্তাকে চেপে ধরল, "বল, তুই কেন এত মনমরা থাকিস।" কান্তার মনটা ভাল ছিল সেদিন, "তোকে সব কিছুই বলব, কিন্তু একটি শর্তে। কাউকে একথা বলতে পারবি না।...ছু-তিন বছর চৌধুরী গুলাম কাদিরের বাড়িতে আরাম-আয়াসেই কেটে যায় আমার। ওরা কোনদিন কোন খারাপ ব্যবহার করেনি। নাম রাখল, সইদা খাতুন। নাম বদলের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, সারা জীবন আমাকে এখানেই থাকতে হবে। রহমত বিবি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর ছেলে নিসার আহমদ লাহোরে পড়াশোনা করত। সে যখন বহলোলপুরে আসত, আমার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলত। মেয়েদের ওপর কোন অন্যায় অবিচার দেখলেই তার কটু সমালোচনা করত। ওর সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি অধীর আগ্রহেপ্রহর গুনতাম। কোন কোন দিন ও আমাকে নিয়ে চেনাবের তীরে বেড়াতে যেত। চেনাব আমাদের গ্রাম বহলোলপুর থেকে মাত্র ক্রোশ খানেক দূরে।

"চেনাবের যে কী আকর্ষণ তা তোকে আমি বোঝাতে পারব না, সন্তোষ। সন্ধ্যার সময়ে আমরা ছুজনে চেনাবের জলে তামাটে সূর্যের অস্ত দেখতাম। আর যখন এক ফালি চাঁদ চেনাবের অন্য পাড় থেকে উঠে ঢেউয়ের তালে তালে নাচত তখন আমরা গল্প বন্ধ করে ঢেউয়ের দিকে অপলক চেয়ে থাকতাম। চাঁদনী রাতে চেনাবের যে কী সৌন্দর্য তোকে আমি তা ভাষায় বোঝাতে পারব না...।" বলতে বলতে কান্তা এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল—যেন হৃদয়ের গভীর থেকে একরাশ ধোঁয়া বেরিয়ে এল। শুকিয়ে যাওয়া ঠোঁটের ওপর আলতো ভাবে জিভ বোলাল কান্তা।

সন্তোষের ছু চোখ যেন কান্তার মুখের ওপর স্থির হয়ে গেঁথে রইল। এই প্রথম সন্তোষ কান্তার মুখে আনন্দের ঝিলিক দেখল। অভিভূত হয়ে ও কান্তার কাহিনী শুনছিল।...

"চেনাবকে চিনতে হলে বর্ষার সময়েই দেখা ভালো। সে সময় চেনাবের এপাড়-ওপাড় দেখা যায় না। শুধু জল আর জল। চেনাব আপন মনে গুরগুর করে ডেকে চলেছে, ঘোলা জলের এক একটা ঘূর্ণি ঢেউ তুলে সে ছুটে চলেছে।...যারা চেনাবের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছে, একমাত্র তারাই জানে এর কী অসাধারণ শিহরণ। আমার বয়েস তখন খুবই কম। তাই পরের দিকে শুধু বৈশাখী পূর্ণিমায় আমি চেনাবের পাড়ে যেতাম। তখন আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি এবং ভাবনা ছিল শিশুর মতো। চেনাবের ঢেউ যেন আমার হৃদয়েও উচ্ছ্বাসের ঢেউ তুলত। আর এই ঢেউ আমাকে এত মুগ্ধ করত, এত আকৃষ্ট করত, আর এমন ভাবে হাতছানি দিত আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না ; একা একা গিয়ে হাজির হতাম চেনাবের পাড়ে। নিসার আহমদ যখন আমার সঙ্গে থাকত, সেই মুহূর্তগুলো যে কত মধুর হয়ে উঠত, কী বলব!"

কান্তা ওড়না দিয়ে তার ভিজে-ওঠা চোখের পাতা ধীরে ধীরে মুছল। ওর চোখের কোণ দিয়ে তুলোর মতো নরম কী একটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসছিল। আর সন্তোষ বিস্ময়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। সে যেন কান্তার ভেতর পাথরের মতো স্থবির একটা কান্না—একটা বুক ফাটা হাহাকার দেখতে পাচ্ছিল।

"রহমত বিবিকে আমি আম্মা বলে ডাকতাম। একদিন তিনি আমাকে কাছে টেনে বললেন, 'এখন থেকে আমিই তোর আম্মা। মনে কর, তোর আগের মার মৃত্যু হয়েছে। তোর প্রতি আমাদেরও তো একটা কর্তব্য আছে। এভাবে তোকে আর থাকতে দিতে পারি না।'

"মনোযোগ দিয়ে আমি আম্মার কথা শুনছিলাম। উনি আমার গালে আলতো একটা টোকা মেরে বললেন, 'আমার ইচ্ছে তোর বিয়ে দিই। চৌধুরী সাহেবেরও তাই ইচ্ছে। তোর কি মত, বল?'

"উনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে অধীর আগ্রহে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। আমার বুকের ভেতর ধুকধুক করতে লাগল।

"তোকে ছেড়ে আমি কিভাবে থাকব! খোদা কি এক মোহ আর মায়াই না সৃষ্টি করেছেন! নিসার আহমদের সঙ্গে আমি তোর শাদি দিতে চাই। তোর কোন অমত নেই তো?'

"খোদার কাছে এর বেশী আমি আর কি চাইতে পারতাম! তাই

চুপ করে রইলাম। কিন্তু আম্মা আমার নীরবতার ভাষা বুঝে নিলেন। সন্তোষ, তুই কোনদিন একই সঙ্গে একজন মহিলাকে মা এবং শাশুড়ি ; একজন পুরুষকে বাবা এবং শ্বশুর হতে দেখেছিস ? আমার শাদি ওরা কী ধুমধাম করেই না দিয়েছে, কি বলব।...”

সন্তোষ কান্তার সারা মুখে চোখে বিদ্যুৎ-এর চমক দেখল।

ঈশ্বরদাস ভীষণভাবে চমকে ওঠে। সদর দরজায় কে যেন খুব জোরে জোরে কড়া নাড়ল। কিন্তু কাউকেই সে দেখতে পেল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে উঠছে, কিন্তু গরম ভাবটা তখনও কমেনি। ওর দু'চোখ ঘুমে ঢুলঢুল করছে।

একদিন মোহনলাল ওকে বলল, “ভাই সাহাব, আপনার সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চাই। কান্তাকে কি করা যায় বলুন তো ? ও সব সময় কেমন যেন মনমরা, কারোর সঙ্গে একটা কথাও বলে না। আর ওর মা সব সময় ওর সঙ্গে খিচখিচ করে চলেছে।”

ঈশ্বরদাস ওদের বাড়িতে গিয়ে বসতে না বসতেই মায়াবন্তী ডুকরে কান্না জুড়ে দিল। “ভাই সাহাব, ভগবানের কাছে আমি কি প্রার্থনা করেছিলাম, তা উনি বুঝতে পারেননি। ভগবান, এর চেয়ে কান্তার মৃত্যু ভালো ছিল। তা হলে আর এ ঝামেলা পোয়াতে হত না। দাঙ্গায় মারা গেলেও ভালো হত।” বলতে বলতে মায়াবন্তী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

মায়াবন্তীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে ঈশ্বরদাস বলল, “বোন, ঈশ্বরের যা ইচ্ছে তা তো ফেরাবার নয়। তিনি যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।” তারপর সে মোহনলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ভাই সাহাব, আপনি কি বলতে চান ?”

“ভাবছি, কান্তাকে কোথাও বিয়ে দিয়ে নতুন করে ওর জীবন শুরু করাই। কিন্তু কেউই ওকে বিয়ে করতে রাজি নয়। কান্তাকে আট বছর বাদে পাকিস্তান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, এ কথা যারাই জানতে পারছে, তারাই পিছু হটছে। আর দ্বিতীয়বার এমুখো হচ্ছে না। ওর বিয়েতে আমি সবকিছু দিতে তৈরি, কিন্তু তবুও কেউ রাজী হচ্ছে না।

আপনার কাছে অনুরোধ, আপনিই ওর জন্যে একটা ঘর দেখুন।” মোহনলালের গলায় হতাশা।

“আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনার কষ্ট আমি অনুভব করছি।” তারপর ঈশ্বরদাস কথার মোড় ঘুরিয়ে বলল, “উপায় একটা বের করতেই হবে। আমাদের এই কট্টর সমাজের গায়ে যতই কালিমা থাক না কেন, কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্তু কোন অবলা নারীর ওড়নার ওপর যদি ছিটেফোঁটা দাগ থাকে, তবে আর কথা নেই। কেউ তাকে গ্রহণ করতে রাজি হয় না। আমার কথা শুনে আপনি হয়তো ভাবছেন, ঈশ্বরদাস কীরকম পাগলের মতো আবোল-তাবোল বকছে। যদি ওদের গ্রহণ করতেই না পারি, তবে কি দরকার ছিল সরকারের কাছে আর্জি পেশ করার? —কি দরকার ছিল ওদের ওপার থেকে ফিরিয়ে আনার? ওরা ওপারে অন্তত কোন রকমে একটা মাথা গুঁজবার ঠাঁই তো করে নিয়েছিল। আজ এত বছর বাদে ওদের আমরা শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে এলাম। উপড়ে নিয়ে এলাম সত্যি, কিন্তু মাটির গভীরে ওদের শিকড় নতুন করে বসাতে রাজি নই।”

মোহনলালও ঈশ্বরদাসের কথাগুলো বুঝল। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে।

মায়াবন্তীর দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে। ওড়না দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল, “এর চেয়ে ওর মৃত্যু হলেই খুশী হতাম। ভগবান, আমি যে ওর জন্যে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি। কান্তাকে জন্ম না দিলেই পারতাম। কোন্ জন্মের হিসেবনিকেশ ও নিচ্ছে কে জানে?”

ঈশ্বরদাস মায়াবন্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে উঠে দাঁড়াল; যেতে যেতে বলল, “বোন, ভুলেও যেন কান্তার সামনে এসব কথা বল না। তুমি নিজেই বল, এর জন্যে ওর কি অপরাধ ছিল? আমি ওর জন্যে ছেলে খুঁজব, তোমরাও খোঁজখবর নাও। সবাই মিলে চেষ্টা করলে একটা না একটা ছেলে পাওয়া যাবেই। কিন্তু ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি, চন্দ্রকান্তার মন তুমি ভেঙে দিও না। কোন দিন কি তুমি ওর হৃদয়ের গভীরে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করেছ?”

ঘর থেকে বেরুতেই ঈশ্বরদাস সামনে কান্তাকে দেখল। পাথরের

মতো নিশ্চল প্রাণহীন ওর মুখের ওপর একটা আতঙ্কের ভাব ঈশ্বরদাস লক্ষ্য করল। খুব দরদের সঙ্গে সে কান্তাকে জিজ্ঞেস করল, "কান্তা-মা, কি হয়েছে ? এখানে তুমি কি করছ ?"

ঈশ্বরদাসের প্রশ্নে কান্তার মুখের আদল কঠিন হয়ে ওঠে। কান্তা ওর কথার কোন জবাব দেয় না। ঈশ্বরদাস ওর চোখের কোণে কয়েক ফোঁটা জল যেন টলমল করতে দেখল। বুঝতে পারল, ও ওদের সমস্ত কথাই শুনেছে।

ঘুম ভাঙার পর ঈশ্বরদাস দেখল, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। দুপুরের উত্তাপটা অনেক কমে গিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে ঈশ্বরদাস সারা ঘরে একবার পায়চারি করল, তারপর গ্যাট হয়ে বসল বিছানায়। আজকে ওর মগজ কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা। ও আবার কান্তার কথা ভাবতে লাগল।

একমাত্র সন্তোষের কাছেই চন্দ্রকান্তা মুখ খোলে। ওর জন্যে ঈশ্বর-দাসের যে দুঃখ, যে দরদ তা কান্তার মনকে নাড়া দেয়। কান্তা মাঝে মাঝে ঈশ্বরদাসের কাছে তার দুঃখ এবং ব্যথা ব্যক্ত করে ফেলে। কিন্তু যে গোপন কথা ঈশ্বরদাসকে বলতে তার বাধত, তা সে সন্তোষকে বিনা দ্বিধায় বলত।

একদিন কান্তা সন্তোষের পাশে নিবিড় হয়ে বসে ওর মনের অব্যক্ত ব্যথাগুলো, শুকনো পাপড়ির মতো নিজের হাতেই টেনে তুলল। তুলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল একটা শাশ্বত বেদনা।

"দু বছর হয়ে গেল, এখানে আসার পর থেকে এক রাতের জন্যেও আমি ঘুমতে পারিনি, সন্তোষ। এমন কি দিনের আলোতে আবছা লোহার পর্দার পেছনে দাঁড়িয়ে নিসার আহমদ যেন আমার সঙ্গে কথা বলে। কান পাতলেই ওর কথা শুধু আমি শুনতে পাই। স্বপ্নের মধ্যে ও আমার হাত আবেগে জড়িয়ে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে যায়—চেনাবের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। নইম আর সালমা যেন কাঁদতে কাঁদতে আমাকে আকুল ভাবে ডাকে। ব্যথা-জর্জরিত ওদের মুখ দেখে বুক ফেটে যায়। চন্দ্রকান্তা বা সইদা, আমি যেই হই না কেন আমার

সবচেয়ে বড় পরিচয়, আমি মা। এই দুই পরিবারই আমার কাছে সমান। আমার বুকের ভেতর যে ভালোবাসা, যে মমতা তা ব্যথায় মুচড়ে উঠছে। মমতা ভালোবাসা আমার দু চোখকে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কে যেন আমার এই কান্নাকে ভেঙে খানখান করে দিয়েছে! সন্তোষ, তুই কি আমার জন্যে কিছু করতে পারিস না?"

সন্তোষ কোন মতে ওড়নার খুঁটে মুখ গুঁজে কান্নার দমক রোখার চেষ্টা করছিল, আর কান্তার কাহিনী শুনে চলেছিল।

"সন্তোষ, আজকে তোকে আমি যে কাহিনী বলছি, সে কাহিনী যেন তুই ছাড়া দুনিয়ার আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি না জানে। আমার স্বামী নিসারের কাছ থেকে আমি যে ভালোবাসা পেয়েছি, সে ভালোবাসা আমি এ জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। বিয়ের এক বছর বাদেই নইমের জন্ম হয়। আর নইমের বছর দেড়েক বাদে সালমা হয়। জানি না, তোকে কোনদিন আমি ওদের দেখাতে পারব কিনা! ওদের দেখলে তুই-ই আমাকে বলবি, 'সইদা তুই জালিম। এমন সুন্দর আদুরে বাচ্চা দুটিকে ছেড়ে তুই কেমন করে আছিস?' তোর এ প্রশ্নের জবাব আমি হয়তো কোনদিনই দিতে পারব না, তবু শোন, যতটুকু সম্ভব বলছি।

"সালমার জন্মের পরে আব্বাজানের ইন্তেকাল হয়। খোদা যেন তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখেন!...আব্বাজানের মৃত্যুর পর নিসার আহমদ জেলাধীশ হয়। জমি-জমা আমাদের কমতি ছিল না। এলাকায় আমাদের প্রচণ্ড প্রতিপত্তি। তাই নিসার আহমদকে সবাই সম্মান করে, খুব ইজ্জত ওর। পাকিস্তানের পুলিস যখন আমাদের এলাকায় মেয়ে উদ্ধারের জন্যে ছানবান করতে আসত, ভয়ে ওরা আমাদের বাড়িমুখো হত না। নিসার আমাকে অনেকবার বলেছে, পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট 'সিভিল এ্যাণ্ড মিলিটারি গেজেট' 'নবায়ে ওয়াক্ত'-এর মারফত জানিয়েছে, আমার খবর যে দিতে পারবে, তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। কয়েকবার দরদ নিয়ে ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি কি হিন্দুস্থানে তোমার বাবা-মার কাছে যেতে চাও?' আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তবে ও নিজেই আমাকে সীমান্তে পৌঁছে পার করে দিত। এসব কথা শুনলে আমি হাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধরতাম।

বলতাম, 'আমি বোধ হয় এখন তোমার কাছে বোঝা হয়ে উঠেছি। নইম আর সালমার মুখের দিকে চেয়েও কি আমাকে তোমার বোঝা মনে হয়?' আমার কথা শুনে ও আমাকে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ত। আর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বিপদের দুর্ভাবনা হারিয়ে যেত।

"কিন্তু একদিন পরিষ্কার আকাশ ঘন কালো মেঘে ছেয়ে গেল। সারা গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেছে। গ্রামে পুলিস এসেছে, সঙ্গে বড় অফিসার। হিন্দুস্থানের পুলিস অফিসারও তাদের সঙ্গে ছিল। পুলিসের দলটি আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। এসে জিজ্ঞেস করল, 'চৌধুরী সাহেব বাড়িতে আছেন?' ওদের কথা শেষ হওয়ার আগেই নিসার আহমদ বাইরে বেরিয়ে আসে। সন্তোষ, তারপরের ঘটনাগুলো আমি ঠিক ঠিক করে বলতে পারব না। ওরা আমার স্বামীর কোন কথাই শুনল না। আমি নিজে ওদের কত কাকুতি-মিনতি করে বললাম, 'আমি হিন্দুস্থানে যেতে চাই না, আমাকে আপনারা জোর করে নিয়ে যাবেন না। আমার বাবা-মা মারা গ্যাছে। এই আমার দুটি সন্তান, এদের মুখের দিকে চেয়ে আপনারা আমার ওপর জোর করবেন না। আমি চৌধুরী সাহেবের বেগম, নিজের খুশীতেই তাকে শাদি করেছি।' কান্নায় আমি তখন ভেঙে পড়েছি। কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'চন্দ্রকান্তা আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে। সেখানে জন্ম নিয়েছে সইদা খাতুন,—আমি। আপনারা চন্দ্রকান্তার কথা ভুলে যান।' ...আমি নইমের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনারা আমার মুখের আদলের সঙ্গে নইমের মুখ মিলিয়ে দেখুন। দেখুন তো আমার চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার মিল আছে কিনা?' কিন্তু ওরা বারবার একই জবাব দিচ্ছিল, 'আমাদের করার কিছু নেই, আইনের কাছে আমরা বন্দী। পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের কড়া আদেশ, আপনাকে হিন্দুস্থানে ফেরৎ পাঠাতেই হবে।'

"সত্যি বলছি সন্তোষ, সেই সময়ে যেন আকাশ থেকে সূর্য কোথায় পালিয়ে গিয়েছিল—জহ্লাদ যেন মানবতাকে নির্মমভাবে হত্যা করছিল। আর বিক্ষত মানবতার সেই গাঢ় লাল রঙ যেন সমস্ত পরিবেশকে রাঙিয়ে তুলেছিল। আর কোন উপায় না দেখে নিসার আমাকে হাতে

ধরে জিপে তুলে দিল। তারপর ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। আমার আম্মা রহমত বিবি আমার জন্যে খোদার কাছে মোনাজাত করতে লাগলেন। নইম আর সালমা সমানে কেঁদে চলেছিল। সেপাইরা ঠেলে ওদের পেছন দিকে হটিয়ে দিল। আম্মা ওদের ভোলাতে লাগলেন,—তোদের মা বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে, এখুনি, এই তো এখুনি ফিরে আসবে। কিন্তু সেই নিষ্পাপ শিশু হৃদয় দুটিও বুঝতে পারছিল, কী ঘটছে। আমার মন জিপ থেকে উড়ে বাইরে আছড়ে পড়তে লাগল। হঠাৎ একসময় জিপ চলতে লাগল আর আমার দু চোখের সামনে যেন কিয়ামতের অন্ধকার নেমে এল। এর পরের ঘটনা আমার কিছুই মনে নেই।"

ইতিমধ্যে ঈশ্বরদাসের জন্যে রুটি এসে গেছে। ও কোন কথা না বলে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। রুটির একটি টুকরোও ওর গলা দিয়ে নামছিল না। খেতে খেতে ওর হাত চলা থেমে গেল। ও আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেল।

একদিন সন্তোষ ওকে বলল, "বাবা, তুমি কি নিজের হাতে আমাকে গলা টিপে মারতে পারবে?"

"এমন মা-বাবার অভাব নেই, যারা অজান্তে নিজের হাতে আপন সন্তানকে গলা টিপে হত্যা করে।"

"কান্তার যে দুঃখ, যে বেদনা তার প্রতিটি পরতকে তুমি জানো। তোমার কাছে ওর জন্যে একটা আর্জি আছে বাবা। আমার অনুরোধ, তুমি 'না' করবে না। ওর মৃত্যু তো অনেক আগেই হয়েছে, এখন শুধু তোমার না শুনে ও মরতে চায়।"

"তোষি, আমাকে সব খুলে বল।"

"তোমার সঙ্গে একজন দেখা করতে চায়, তুমি বললে দেখা করিয়ে দেব।"

"কে?"

"নিসার আহমদ। না, না আব্দুল হামিদ।"

"নিসার আহমদ।…কি করে সে এখানে এল? কান্তার খবরই বা কার মারফত পেল সে?" ঈশ্বরদাস এক নাগাড়ে প্রশ্ন করে চলে।

"সব কিছু জানার প্রয়োজন নেই। আমি ওর বোন, মনে কর আমিই সব ব্যবস্থা করেছি।"

হাঁটুর ওপর রাখা ঈশ্বরদাসের হাত হঠাৎ ছিটকে থালার ওপর আছড়ে পড়ল। থালার কানায় লেগে ওর আঙ্গুলটা একটু ছড়ে গেল। হাতটাকে ধীরে চাপ দিতে দিতে এক ঝটকায় ও ঘাড়টাকে টান করে আবার খাওয়ায় মন দিল। আজ কী যেন হয়েছে ঈশ্বরদাসের, কিছুতেই কান্তার কথা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না।

অবশেষে ঈশ্বরদাসকে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশ করা হল। তার হাতে হাতকড়া পরানো। পুলিস তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করেছে। তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা পাঠ করে শোনানো হল। অভিযোগের সার কথা, সে কুচা নবী করিষের একটি মেয়ে চন্দ্রকান্তাকে গুজরাতের বাসিন্দা সইদা খাতুন—এই নাম দিয়ে জাল পারমিট দেয়। জাল পারমিট দিয়ে সে চন্দ্রকান্তার পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত।

ঈশ্বরদাস দেখল, মোহনলাল আর মায়াবন্তী তার সামনে দাঁড়িয়ে। আরও অনেকেই মামলা দেখার জন্যে এসেছে। মোহনলাল বলছে, 'হে ভগবান, শত্রুরও যেন এরকম প্রতিবেশী না থাকে। আমার মেয়েকে এ লোকটা পাকিস্তানে পাচার করেছে। এ হিন্দুস্থানী, না পাকিস্তানী!'

মায়াবন্তী মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলেছে। কিন্তু চোখে এক ফোঁটাও জল নেই।

সোহনলাল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখে-চোখে চিন্তার বলিরেখা-গুলো দেখা যাচ্ছিল।

সন্তোষ অসীম ধৈর্যে বুক বেঁধে সমস্ত কথাই শুনছিল।

ঈশ্বরদাস নিজের পক্ষ সমর্থন করে একটি কথাও বলল না। ম্যাজিস্ট্রেট ওকে দুবছরের সাজা দিল।

ওয়ার্ডার যখন থালা নিতে এল, তখন ঈশ্বরদাস উদাসভাবে চোখ মেলে তাকাল। ওর মনে এতটুকু ক্লেশ বা আফশোষ নেই। জেলের ভ্যাপসা গরম, বিস্বাদ রুটি আর গরাদ—সব কিছুই যেন কোথায় অতলে তলিয়ে গেছে। আর সেই অতল থেকে যেন সটান ওর সামনে উঠে এল নিসার আহমদের ঋজু তলোয়ারের মতো তীক্ষ্ণ চেহারা। ভালোবাসায় ভরপুর নিসার আহমদের যে আঙ্গিনা, সেই আঙ্গিনায় যেন সইদা খাতুনের খুশী আর আনন্দের চারাগাছ পল্লবিত হয়ে উঠছে।…ওয়ার্ডার থালা টেনে নিতেই ও উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে তৃপ্তির একটা ঢেকুর তুলল ঈশ্বরদাস।

নারায়ণ ভারতী

দলিল

নারায়ণ 'ভারতী' সিন্ধি ভাষা-ভাষী লেখক। মূলত ছোট গল্পকার। দেশ বিভাগের পর অন্যসব হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো তাঁকেও চিরদিনের জন্যে মাতৃভূমি সিন্ধু ছেড়ে চলে আসতে হয়। এই লক্ষ লক্ষ সিন্ধি শরণার্থীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। সিন্ধি ভাষা-ভাষী কোন অঞ্চল বা ভূখণ্ড এপ্রান্তে না থাকায় দেশ বিভাগের পর এই সাহিত্য ভারতের মাটিতে তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তবু সিন্ধি ভাষা-ভাষী লেখকরা লড়াই করে চলেছেন—তাঁদের ঐতিহ্যময় ভাষা এবং সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। নারায়ণ 'ভারতী' তাঁদের মধ্যে একজন।

গতকাল ক্লেমস অফিসারের দপ্তরে মন্ধনলালের হাজিরার তারিখ ছিল। দলিল-দস্তাবেজ আর রসিদ বই ইত্যাদির পুটলীর বাঁধন খুলল ও। খুলে কাগজপত্রের ওপর মৌমাছির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ও যেন ভনভন করে উড়ে উড়ে কিছু দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ওর বুকের গভীর থেকে উৎসারিত হল। জমি এবং বাড়ির জন্যে ও ক্লেম করেছে। পার্টিশনের জন্যে সিন্ধুতে যে বসতবাড়ি এবং সম্পত্তি ছেড়ে এসেছে, গতকাল তারই জন্যে ক্লেম অফিসারের দপ্তরে ওকে হাজিরা দিতে হয়েছিল। বাড়ির ক্লেম সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আলাদা করে রাখল মন্ধনলাল।

কাগজপত্রগুলো দেখতে দেখতে চোখের সামনে ছায়াছবির মতো অনেকগুলো দৃশ্য একের পর এক ভেসে উঠতে লাগল ওর। কয়েকটা দলিল প্রায় দশ বছর আগেকার। কয়েকটা বছর বিশেকের পুরনো। আর কয়েকটা তো হবে চল্লিশ বছর আগেকার। তাদের বাড়ির দরজা জানলা তৈরি করেছিল সিদ্দিক ছুতোর। বাড়ির পাশেই সুমরের বাড়ি। সুমর চন্দনের জমি চাষ-আবাদ করত। আজ···না জানি কত কথাই তার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে।

হঠাৎ একটা দলিলের ওপর গিয়ে ওর দৃষ্টি থেমে গেল।…এক নিঃশ্বাসে ও দলিলটা পড়ে ফেলল। দলিলে লেখা "নবী বক্সের পুত্র, আমি রসুল বক্স, বৃত্তি চাষ-আবাদ, বয়স তিরিশ, গ্রাম মিরল, তহসিল কম্বর, জেলা লাডকানা, আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বজ্ঞানে আমার বসত বাটি …শেঠ মক্কনলালের কাছে বিক্রি করিয়া এই কবলা করিয়া দিলাম।"

মক্কনলাল আর পড়তে পারল না। ওর হৃদয় ব্যথায় মুচড়ে উঠল। রসুল বক্সের বসতবাড়ি, তার স্ত্রী আর ছেলের মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। রসুলের ছেলে দেখতে কী আদুরেই না ছিল। দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় ও আধো-আধো গলায় ডেকে বলত, "বাবুজী, আমাকে গরু চরানোর জন্যে রাখবে না? আমি তোমার গরু চরাবো।" বলতে বলতে মিছিমিছি গরু চরানোর ভঙ্গি এবং শব্দ করে এগিয়ে আসত। ফসলের মৌসুমে মক্কনলাল রসুলকে ডেকে কিছু আনাজ-তরকারি দিয়ে বলত, "তোমার রমজানকে দিও। ও আমার গরুর রাখাল না!" তার পর তারা দু'জনেই রমজানের আধো আধো কথাগুলো স্মরণ করে হো হো করে হেসে উঠত।

দেশ বিভাগের বছর খানেক আগে, রসুল বক্স একদিন মক্কনলালের কাছে এল। ঘটনাটা এখনও সে ভুলতে পারেনি। মক্কনলালকে বলল, "বাবুজী, আমার জমি যে খালি পড়ে একেবারে শুকিয়ে যাবে। গরীব মানুষ, মারা পড়ব। বীজ কেনার মতো একটি কানা-কড়িও যে আমার নেই।"

ওর কথা শুনে মক্কনলাল তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে, "মিঞা সাহেব, তোমার কাছে আমি এখনও দু'শ টাকা পাই। আজ পর্যন্ত তুমি তা শোধ করনি। আবার ধারের জন্য এসেছ। একটি পয়সাও আমি তোমাকে ধার দিতে পারব না। অন্য কারো কাছে যাও।" বলে মক্কনলাল হুঁকোর ওপর কল্কে রেখে, জুতোয় মচমচ শব্দ তুলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল। রসুল বক্স চৌকাঠ থেকে উঠে বারান্দায় এল। এসে মাথা থেকে পাগড়ি খুলে মক্কনলালের পায়ের ওপর রেখে বলল, "বাবুজী, গরীবের ওপর দয়া কর। আমার কাছে এক রতি জিনিস নেই, যা বন্ধক দিয়ে ধার পাব। বিয়ের সময় পাওয়া বৌ-এর গলার যে একছড়া হার ছিল, তাও জমু

বেনিয়ার কাছে বন্ধক দিয়েছি। কাপড়ের প্রয়োজন ছিল। ন্যাংটো তো আর থাকতে পারি না! আটা আর কাপড়—এ দুটো জিনিস না হলে কে আর বেঁচে থাকতে পারে বল?"

মন্ধনলাল সুর নরম করে বলল, "বেশ, বেশ মিঞা। এসেছ যখন নিরাশ করব না। বাপ-দাদার আমল থেকে কর্জ নিচ্ছ, আমার কাছে না এলে আর কার কাছেই বা যাবে? কিন্তু ভাই, টাকা-পয়সার ব্যাপার। সবসময় সবার একরকম অবস্থা যায় না। তাছাড়া দিনকাল যা পড়েছে, তাতে নিজের ছেলেকেই বিশ্বাস করা যায় না!…পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যাও। দেড়শ টাকা তো তোমার কাছে পাওনাই আছে, মোট দুশ টাকার পরিবর্তে তোমার বসতবাড়িটা লেখাপড়া করে দিয়ে যাও।"

রসুল বক্স বিড়বিড় করে বলল, "বাবুজী একমাত্র এই বসতবাড়িটাই আমার সম্পত্তির মধ্যে বেঁচে রয়েছে, তাও যদি…"

তাকে বাধা দিয়ে মন্ধনলাল বলল, "মিঞা, তোমার কাছ থেকে এ বাড়ি কে ছিনিয়ে নিচ্ছে! বাড়িতে তুমি যেমন আছ, তেমনিই থাক। ভগবান তোমাকে যখন দিন দেবে, তখন নিজের জায়গা তুমি ফিরে পাবে। মাসে শুধু দুটাকা করে দিয়ে যাবে। এই দুটাকাও যদি না নিই তবে ওপরওয়ালার কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব? এই সামান্য কটা টাকা না নিলে বেনিয়ারা বলে বেড়াবে, দেখ মন্ধনলাল রসুলকে…' তোমাকে আর বেশী কী বলব, তুমি সমঝদার মানুষ, সবইতো বুঝতে পারছ।"

বসতবাড়ি লেখাপড়া হয়ে গেল। সেদিনের সমস্ত ঘটনাই আজ মন্ধনলালের এক এক করে মনে পড়ে যায়। মনে হয়, যেন এই সেদিন ঘটেছে। ওর দুচোখ জলে ভরে ওঠে : জানি না, রসুল কোথায়? আমার কথা কি ওর মনে আছে?…এই দলিল-দস্তাবেজ কি মন্ধনলাল ক্লেম অফিসারের কাছে পেশ করবে? রসুলই তো এখন ঐ বাড়ির হক মালিক। অথচ দুশ টাকা তো ও কবে শোধ করে দিয়েছে। কিন্তু আগামীকাল ক্লেম অফিসে এইসব দলিলপত্র পেশ করলেই মন্ধনলাল টাকা পেয়ে যাবে। পাকিস্তান সরকার রসুলের কাছ থেকে বাড়ি ছিনিয়ে নিয়ে নিলামে চড়াবে। কিন্তু রসুল কোথায় মাথা গুঁজবে?… এখানে—এই হিন্দুস্থানে আসার সময়, রসুল হায়দ্রাবাদ পর্যন্ত ওর সঙ্গে

এসেছিল। ওকে পৌঁছে দিয়ে ও চলে যায়। বেচারা গাড়ি-ভাড়া পর্যন্ত নেয় নি। বলেছিল, "বাবুজী, এ আমার একান্ত কর্তব্য। কোরানে লেখা আছে, 'পাড়া-পড়শীর সঙ্গে ভাই-বেরাদরের মতো বাস কর।...বাবুজী, তুমি কি আর ফিরে আসবে না?"

আর, আজ কিনা আমি তার মাথা গুঁজবার ঠাঁইটুকুও কেড়ে নিতে যাচ্ছি। বসবাসের জন্যে সবারই মাথার ওপর ছাদ চাই।...মক্ষনলালের দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কালো কালিতে লেখা দলিলের হরফগুলোর ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে ও আবেদনের বয়ানগুলো ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

অমৃত রায়
ব্যথার মঞ্জরী

অমৃত রায় প্রেমচন্দর কনিষ্ঠ সন্তান। জন্ম বেনারসে, হিন্দী সাহিত্যে প্রেমচন্দ একক যে যুগ সৃষ্টি করে গেছেন, অমৃত রায় অন্য অনেকের সঙ্গে সেই যুগকেই এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। সৃষ্টি করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন, কোথাও বা এক কদম এগিয়েছেন। বৃত্তি অধ্যাপনা। লিখেছেন অসংখ্য গল্প এবং উপন্যাস। এইসব গল্প এবং উপন্যাসে মূলত এসেছে মধ্যবিত্ত জীবন—তার ক্রুরতা নীচতা ভালোবাসা হৃদয়াবেগ জীবন সংগ্রাম—এবং তার জয় পরাজয়। মধ্যবিত্ত জীবনের এই গতির বাইরে তিনি বেরুননি। প্রেমচন্দর জীবন এবং সাহিত্যের ওপর তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'কলম কা সিপাহী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের মধ্যে 'সুখ-দুঃখ' এবং 'হাতি কা দাঁত'—নিঃসন্দেহে তাঁকে হিন্দী কথাসাহিত্যে স্থান করে দিয়েছে। কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত ছিলেন। আজও আংশিকভাবে আছেন।

আজ অমাবস্যার রাত। ঘন, কালো। নীরব, নিস্তব্ধ। দূর—বহু দূর থেকে শুধু কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শিয়ালের ডাক ভেসে আসছে। মানুষের কণ্ঠস্বর বলতে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে গানের দু-একটা কলি। তাও কোন রিক্সাওয়ালার কণ্ঠে ভেসে আসা ফিল্মী গানের এক-আধটা কলি। তাছাড়া আর কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই।

আশপাশের কোন বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সানাই-এর একটা বেদনা-সুর। সানাই এমন একটা বাদ্যযন্ত্র যা মানুষের সুখ এবং দুঃখ এই দু সময়েরই সঙ্গী। জানি না আজ সুরেশ্বরের কি হয়েছে।

…আপনারা সুরেশ্বরকে কতটুকু জানেন। নিশ্চয়ই আপনারা ওকে কোনদিন বীণা বাজাতে শোনেননি। চোখ বন্ধ করে ও যখন বীণার তারের ওপর আঙুল খেলাতে থাকে তখন ও এক অন্য মানুষ হয়ে যায়। মনে হয় না যে সেই সুরেশ্বরই এখন আমাদের সামনে বসে আছে। এখন ওর উঠতি বয়স। মাত্র তিরিশটি বসন্ত ও পেরিয়ে এসেছে। ওর সংগীতের মূর্চ্ছনা থেকে যে ব্যথার সুর প্রবাহিত সেই সুরের ফল্গুধারায় একবার যে অবগাহন করেছে, তার প্রতিটি তন্ত্রী কেঁপে কেঁপে উঠেছে। আর সেই ফল্গুধারায় স্নাত মানুষের মনে হয়েছে, এই সুরের যে স্রষ্টা—

তার অস্থি আর মজ্জায় যেন অনেক—অনেক ঝরা-পাতা আর শিশির-বিন্দু সমাহিত।

সুরেশ্বর রেলওয়ের একজন কেরাণী। রেলের ঘট-ঘটাং আওয়াজ আর ফাইলের বোঝার ক্লান্তিকে সে তার বীণার তন্ত্রীতে বেঁধে নতুন এক মহিমায় রূপ দিয়েছে। সারাদিনের ছোটাছুটির পর রাত্রে এই বীণাই তাকে এনে দেয় শান্তি, যে তার সাথী—তার রক্ষা-কবচ। এই বীণা হাতে না থাকলে অফিসের ফাইল তাকে নিশ্চিতই গ্রাস করে ফেলত। রাত্রে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে, প্রতিবেশীদের ঘুমের কোন রকম ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, অনেক—অনেক গভীর রাত পর্যন্ত সে তার বীণা বাজাত। রাত্রির এই নিঃশব্দ গভীরতা তার বড় প্রিয়। ওর ইচ্ছে, ঘড়ির কাঁটাটা কোন একটা ঘরে এসে স্থির হয়ে যাক। ও দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে চায়; যাতে পরদিন পর্যন্ত সুরের মূর্ছনা তাকে আবিষ্ট করে রাখতে পারে।

জানি না, আজ সুরেশ্বরের মন কেন এত উদাস। সানাইয়ের একটা তীক্ষ্ণ স্বর ধারালো ছুরির মতো ওর হৃদয়ে এসে ধীরে ধীরে বিঁধছে। একটা অদ্ভুত ধরনের বেদনা—একটা বিচিত্র ব্যথা ক্রমশ ওর হৃদয়ে সঞ্চারিত। আজকে ওর বীণায় কোন ঝংকার নেই—স্তব্ধ। আজ ও নিজেই শ্রোতা। সানাইয়ের সুরটা বাঁকানো তরোয়ালের মতো তার দেহকে বিক্ষত করছে। সানাইয়ের সুরের এই উঁচু-নীচু স্বর-গ্রাম কী বলতে চায় সুরেশ্বর তা বোঝার চেষ্টা করছে। ব্যথার গভীর অতলকে স্পর্শ করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প জাগছে তার। সুন্দরী এক পাহাড়ী মেয়ের মতো সানাইয়ের সুরটা বুকের গভীর প্রদেশে চড়াই-উৎরাই ভাঙছে। আর সেই উচ্ছল তরুণী যেন কোন ক্রুর দৈত্যের অভিশাপে বন্দিনী। ওর প্রিয়জনেরা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে—ওর আত্মীয়রা ওকে ত্যাগ করেছে। আর ও নিজেই নিজের ব্যথার ভার বহন করে চলেছে। ওর মুখাবয়ব তুষারস্নাত মটর ফুলের মতো। ওর পরনের শাড়িটা যেন তুষারের মতো শুভ্র—মুখের ভঙ্গিমা যেন উদাসী মেঘের মতো বিস্তৃত।

…সুরেশ্বর সানাইয়ের এই সুর-মূর্ছনাকে নতুন এক কল্পনায় পরিবর্তিত করে সেই মানস-প্রতিমার দিকে স্বপ্নাতুর চোখ নিয়ে বসেছিল।

হঠাৎ কে যেন ওর কাঁধ ধরে খুব জোরে এক ঝাঁকুনি দিয়ে ওকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। যে মানস-প্রতিমা ওর চোখের সামনে ভাসছিল, তা সানাইয়ের মূর্ছনার ছবি নয়—রক্তমাংসে-গড়া এক তরুণীর অবয়ব।

সে-তরুণীকে আজকেই সে শরণার্থীদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। হাজারা জেলার কোন এক সীমান্ত অঞ্চলের হিন্দু পাঠান যুবতী সে।···গভীর বেদনার সুর যখন সানাই-এ বেজে চলেছে, ঠিক তখনই সেই বেদনার অনিন্দ্যসুন্দর প্রতিমা নিজে নিজেই তার সামনে ভেসে উঠছে —যেন সমুদ্রের ফেনা থেকে কোন ভেনাস উঠে আসছে ...

হ্যাঁ, সত্যিই ভেনাস···উর্বশী···তক্ষশীলার রূপবতী···শরের মতো ছিপছিপে মসৃণ—দীর্ঘাঙ্গী, স্বাস্থ্যবতী, যৌবনে ভরপুর—একহারা, সীমান্তের কাজু বাদামের মতো টানাটানা চোখ, চন্দনের মতো গায়ের রঙ, অভিজাত মুখশ্রী আর দীর্ঘ বেণী। কিন্তু প্রসাধন নেই, সাজ-সজ্জার আড়ম্বর নেই—তাকে কেমন যেন উদাসী-উদাসী দেখাচ্ছিল, তার এই অপরূপ লাবণ্য যেন বদলে গেছে, উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম কোন ভাবই তার মধ্যে নেই। একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় যেন অন্তরের অন্তঃস্থলে ব্যথার একটা সঙ্গীত গুমরে উঠল।

সুরেশ্বর আজকেই ওর ডেরা দেখেছে। ভাগ্যিস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধটা হয়েছিল। যুদ্ধ না হলে মিলিটারির জন্যে ব্যারাক তৈরি হত না, আর ব্যারাক তৈরি হয়েছিল বলেই জানোয়ারদের ভয়ে পলাতক মানুষ আজ সেই ব্যারাকে আশ্রয় পেয়েছে। এই তৈরি ব্যারাক শরণার্থীরা পেয়ে গিয়েছিল—যেন ওদের জন্যেই এইগুলো বানানো হয়েছিল। ঘর-বাড়ি, খেত-খামার, দোকান-পাট ছেড়ে ছিন্নমূল মানুষ এই ব্যারাকেই তাদের শেষ সম্বল নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। টিনের বড় মাঝারি ছোট বাক্স, খাটিয়ার পায়া এবং কাঠ, দড়ির গাঁঠরি সব আলাদা করে সাজানো-গোছানো। তাছাড়া আছে চাটাই বালতি ঘটি থালা টিন। কেউ কেউ বা সঙ্গে করে এনেছে হুঁকো। এ সবকিছুই তাদের ঘর-গেরস্থালির আসবাবপত্র। এসব জিনিসপত্র নিয়েই নতুন এই জগতে তারা নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। মেয়ে-বৌরা কুয়ো থেকে জল আনছে কিম্বা রুটি বানাচ্ছে। শিশুরা ধুলো-মাটি সারা গায়ে মেখে

ভয়ে ভয়ে খেলছে। লোহতা আর হাজারার ধুলো মিশে গেছে, ওরা পরখ করছে নতুন জীবনকে। আর ওদের ভেতরে গোপন ভীত-সন্ত্রস্ত মুখগুলো বারবার উঁকিঝুঁকি মারছে, একটা অদৃশ্য ভয়ের জাল দিয়ে নিজেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে।

এই ব্যারাকে—এই নতুন দুনিয়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারে সুরেশ্বর বেদনার প্রতিমা, এই অনন্যা সুন্দরীকে ফুলকো ফুলকো রুটি সেঁকতে দেখেছিল।....

আর বন্নোর এই দুর্দশার কাহিনী সুরেশ্বর শুনেছে তার ফেলে-আসা অতীত দুনিয়ার কোন এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে। আজ এই নতুন দুনিয়াতেও সে তার প্রতিবেশী। এই নতুন আস্তানায় আর কোন বাধার প্রাচীর উঠবে না। কেননা, এই মানব সন্তান-সন্ততিরা নিজেদের মেহনতের ওপর বেঁচে নেই, বেঁচে আছে জনসাধারণের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর। এখানে ওর কেমন লাগছে? প্রশ্ন করেছিল সুরেশ্বর। বন্নোর প্রতিবেশী হাজারা জেলার সেই আধ-বুড়ো মানুষটি উত্তরে বলেছিল, "ভিক্ষের অন্ন খেয়ে বেঁচে থাকতে কেমন আর লাগতে পারে বাবুজী।" ওর কাছ থেকেই সুরেশ্বর জানতে পারে, এ বছরেই, কিছু দিন আগেই বন্নোর বিয়ে হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি একই গ্রামে। আর বিয়ের পরেই শুরু হয় দাঙ্গা। ওর স্বামীকে হত্যা করে খুনীরা ওকে তুলে নিয়ে যায়। তারপর বন্নোর ওপর চলে হিংস্র অত্যাচার, শেষমেশ একদিন রাত্রে প্রাণটা হাতের মুঠোয় নিয়ে বন্নো পালিয়ে এসে উদ্বাস্তুদের দঙ্গলে ভিড়ে যায়। সুরেশ্বর জানতে পারে বন্নোর দুঃসাহসিক জীবনের ব্যথার কাহিনী।

সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে, ছোট্ট একটা খাটিয়ায় বসে সেই আধ-বুড়ো লোকটি বন্নোর কাহিনী বলছিল। আর সেই সময় সুরেশ্বরের নায়িকা বন্নো বেদনার শিথিল অনুভূতি, দুর্জয় সাহস নিজের কোমল দেহে লুকিয়ে নীরবে রুটি সেঁকে চলেছে। নীরবে মুখ বুজে এই ব্যথা সইতে সইতে ও কেমন উন্মাদের মতো হয়ে গেছে। কথা বলা, হাসি এসব সে ভুলে গেছে। শুধু একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করত। ফেলে-আসা দিনের প্রিয় সামগ্রী, প্রিয় অবলম্বন সবকিছু হারিয়ে গেছে;

তার সঙ্গে পুড়ে খাক হয়ে গেছে বন্নোর হাসি, কথা। পাঁচ হাজার কিম্বা পঞ্চাশ হাজার বছর আগের এক ভূমিকম্প পলস্তরাহীন জীবনকে—ওর জীবনের ফাটল ধরা দালানকে (ওর বিয়ের আগের দিনগুলো) ধসিয়ে দিয়ে গেছে। আর সেই ধ্বংসাবশেষের স্তূপের ওপর মরে পড়ে রয়েছে সদ্য ডানা গজানো একরাশ পাখি। পচে গলে সেই পাখির দেহ এখন জমাট বেঁধে গেছে। ঝকমকে পাথরের ফাটলের মধ্যে সেগুলো আয়নার টুকরোর মতো। ঠোঁট ফাঁক করে হাসতে পারছে না বন্নো, হাসি যেন থমকে গেছে।

ব্যারাকের কাছেই ইঁদারা। ইঁদারার পাশে একটা কুঠরি। জানি না, যুদ্ধের সময় এই কুঠরি কী কাজে লাগত। এখন খালিই পড়ে রয়েছে। হয়তো যুদ্ধের সময় ওখানে লুকোচুরি খেলা হত।

আজকে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় হঠাৎ কুঠরির মধ্যে প্রাণের একটা সাড়া পাওয়া গেল। বন্নো তখন জল আনতে গিয়েছিল। বেশী দূর যায়নি, এমন সময় সেই কুঠরি থেকে একটা আর্ত চীৎকার ভেসে এল। আর কারা যেন সেই চীৎকারটা জোর করে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। চীৎকারের শব্দ কমে গেল—কিন্তু একটা গোঙানি, একটা কাতরানি ভেসে আসছে। কিছু পুরুষ গলার ফিস-ফিসানিও সে শুনতে পেল। বন্নো ঠিক করল, ব্যাপারটা যাচাই করতে হবে। জল নিয়ে ও ব্যারাকে ফিরল। কলসী রেখে, তাক থেকে একটা চাকু নিয়ে কুঠরির দিকে এগিয়ে গেল বন্নো।

ও যখন প্রায় গজ দশেকের মতো দূরে, সেই সময় দলের কোন একজন দেশলাই জ্বালাল। এবং জ্বালিয়ে কিছু খুঁজতে লাগল। কিন্তু দেশলাই নিভে গেল।

মুহূর্তের সেই একঝলক আলোয় বন্নো দেখল, চার-পাঁচজন পুরুষ একজন যুবতীকে মাটিতে শুইয়ে জোর করে চেপে ধরে আছে। মেয়েটিকে চিত করে শুইয়ে ফেলা হয়েছিল। হয়তো বা সে নিজেই চিত হয়ে শুয়ে আছে। সারা শরীরে কোন কাপড় নেই—সম্পূর্ণ

উলঙ্গ। দু-তিনজন যুবক তার হাত-পা জোরে চেপে ধরে আছে—আর সেই মেয়েটি হাত-পা ছাড়ানোর জন্যে প্রাণপণ ছটফট করছে…

মেয়েটি আজ একদঙ্গল উন্মত্ত শরণার্থী যুবকের শিকার। ওদের রক্ত, রক্তই—গঙ্গার শুদ্ধ জল নয়। ওরা তাই প্রতিশোধ নিতে চায়—নিজেদের অপমানের প্রতিশোধ। তাদের ধর্মের মেয়েদের ইজ্জত যারা নষ্ট করেছে, সেই দুশমনদেরই এক মেয়ের ইজ্জত নিয়ে তারা বদলা নিচ্ছে।

আশপাশের কোন একটা গ্রামে এই পাঁচ-ছজন তরুণ আক্রমণ চালায়। গ্রামের জিনিসপত্র ওরা লুট করেছে আর তার সাথে এই মেয়েটিকেও তুলে নিয়ে এসেছে। এখন শুধু মেয়েটির ইজ্জত লুটেই প্রতিশোধ নিচ্ছে না, নিজেদের ক্ষুধাও নিবৃত্ত করছে। তাদের ধর্মের জন্যেও কিছু কর্তব্য পালন করছে তারা।

এক মুহূর্তের জন্যে যে আলোর রশ্মি ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল, সেই রশ্মিতে বন্নো ধর্মের এই উপাসকদের দেখল। দেখল তারা কী করছে।

বুঝতে তার এক মুহূর্তের জন্যে দেরি হয়নি। দেশলাই-এর এক ঝলক লাল রোশনাই-ই মানুষগুলোর পাশবিকতাকে স্পষ্ট করে দিয়েছিল। এর বেশী কিছু আর বন্নোর দেখার দরকার হয়নি, একদিন সে নিজেই এইরকম এক নাটকের নায়িকা হয়েছিল।

বন্নোর ভেতর যে পশুর আত্মা লুকিয়ে ছিল, তা মুহূর্তের জন্য পৈশাচিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। সে এক প্রতিহিংসার তৃপ্তি অনুভব করল।…ছিঁড়েকুড়ে খাক। এই মেয়েটির যে খোদা, সে তো সেই জানোয়ারদেরও খোদা।…ওরা একে ছিঁড়েকুড়ে খাক।

বন্নোর মনের মধ্যে এক পৈশাচিক উল্লাসের তরঙ্গ।

কিন্তু মিনিট কয়েকের মধ্যে তার ভেতর আবার এক উলটো ঢেউ আছড়ে পড়ল। সাপ ছোবল মারলে বিষের যেমন প্রবাহ সৃষ্টি হয়, সেই রকম একটা নীল জ্বালার প্রবাহ খেলে গেল তার সারা দেহে, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে।

বন্নোর মনে হল সে নিজে বুঝি একটা বিরাট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। উলঙ্গ যে মেয়েটি চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে আছে, সেই মেয়েটি অন্য কেউ নয়, সে নিজেই। ছটা হাত তাকে মাটিতে পেড়ে

ফেলে ঠেসে ধরে আছে। নেকড়ের মতো ক্ষুধার্ত চোখগুলো যেন তার খুবই চেনা। এই ক্ষুধার্ত চোখগুলো সে এর আগেও দেখেছে।...

"কে, কে ওখানে" চীৎকার করতে করতে বন্নো চাকু উঁচিয়ে কুঠরির মধ্যে ঝড়ের বেগে ঢুকল। ভেতরে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। দু-একজন পালানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তারা ভাবল, না, দেখা দরকার কোন্ শয়তান আমাদের কাজে বাধা দিতে এসেছে।

বন্নো দু-একজনের ওপর চাকু চালিয়েছিল। কিন্তু তারা ছিল ওস্তাদ খেলোয়াড়। বন্নোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা চাকু ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ছিনিয়ে নেওয়ার আগেই উন্মত্ত বন্নো মেয়েটির দিকে ছুটে গিয়ে তার পেটে চাকু চালিয়ে দিল ; পরে সে চাকুটা নিজের বুকেই বসিয়ে দিল।

ভীষ্ম সাহানী

অমৃতসর এসে গিয়েছে

ভীষ্ম সাহানীর জন্ম ১৯১৫, পাঞ্জাবে। জীবনের প্রথম থেকেই বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ থাকায় তাঁর রচনায় জনজীবনের ছাপ খুব দুর্লভ নয়। যদিও সে ছাপ মধ্যবিত্তের বেড়াজালকে ডিঙ্গিয়ে বেরুতে পারেনি। ফলে তাঁর লেখায় মধ্যবিত্ত জীবন এবং সেই জীবনের জটিলতা বারবার এসেছে।

রেলের কামরায় যাত্রীর খুব একটা বেশী ভিড় ছিল না। আমার ঠিক সামনের সিটেই একজন সর্দারজী বসে; অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধের গল্প বলে চলেছে। যুদ্ধের সময় বার্মার ফ্রন্টে সে লড়াই করেছিল। গল্প বলছে আর তারই ফাঁকে খিক খিক করে হাসছে এবং মাঝে-মধ্যে গোরাসৈন্যদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। কামরায় তিনজন পাঠান ব্যবসায়ীও ছিল। পাঠান ব্যবসায়ীদের একজন ওপরের বার্থে শুয়েছিল। তার পরনে সবুজ রঙের পোশাক। লোকটি খুব হাসি-খুশী। রোগামতো একজন ভদ্রলোক আমার পাশেই বসেছিলেন, পাঠানটি তাঁর সঙ্গে সমানে মস্করা করে চলেছে। রোগা লোকটিকে দেখে পেশওয়ারের লোক বলে মনে হচ্ছিল। কারণ তারা নিজেদের মধ্যে পশ্‌তুতে কথা বলছিল। আমার সামনে ডান দিকে এক বৃদ্ধা আগাপাশতলা ঢেকে বসে সমানে মালা জপ করে চলেছে। কামরায় আরও দু-চারজন যাত্রী ছিল। কিন্তু তাদের আমার ঠিক ভালোভাবে মনে নেই।

গাড়ি মৃদু-মন্দ গতিতে ছুটে চলেছে। যাত্রীরা সমানে বকবক করছে। বাইরে গমের ক্ষেতে আলতো হাওয়ার একটা ঢেউ বয়ে

চলেছে। আমার মন স্বভাবতই আনন্দে ভরে আছে। আসন্ন স্বাধীনতা উৎসব দেখার জন্যে আমি দিল্লী যাচ্ছি।

সে সময়কার কথা যখন ভাবি বা মনে পড়ে, তখন মনে হয়, আমি যেন এক ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বেঁচে ছিলাম। হয়ত সময় কেটে গেলে অতীতের অনেক ঘটনাই মিথ্যে বা যুক্তিহীন বলে মনে হয়। ভাবীকালের পটপরিবর্তনের প্রতিটি পদে পদে, এই মিথ্যে বা যুক্তিহীনতাও ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়।

সেই সময় পাকিস্তানের জন্ম ঘোষিত হয়েছে। আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপরেখা নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেছে। কিন্তু কেউই এ ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে খুব বেশীদূর পর্যন্ত তাদের চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। আমার সামনে যে সর্দারজী বসেছিল সে বারবার আমাকে জিজ্ঞেস করছিল, পাকিস্তান হওয়ার পর জিন্না সাহেব বোম্বাইয়ে থাকবেন, না পাকিস্তানে চলে যাবেন। তার প্রশ্নের জবাবে প্রতিবারই আমি বলেছি, বোম্বাই ছাড়বেন কেন, বোম্বাই থেকে পাকিস্তানে যাতায়াত করবেন। বোম্বাই ছাড়ার কোন কথাই ওঠে না। লাহোর আর গুরুদাসপুর নিয়ে একই রকম জল্পনা-কল্পনা চলছিল। শহর দুটির কোন্‌টা কোন্ দিকে পড়বে। খুব স্বাভাবিকভাবেই হাসি-ঠাট্টা এবং গল্পগুজবের মধ্যে সময় কেটে যাচ্ছিল। এদের মধ্যে যারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাচ্ছে, কেউ কেউ তাদের নিয়েও ঠাট্টা করছে। কেউই জানে না, তারা যা করছে তার কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভুল। একদিকে পাকিস্তান হওয়াতে মনের মধ্যে উল্লাস, আর অন্যদিকে হিন্দুস্তান স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আনন্দ। বহু জায়গাতেই তখন দাঙ্গা চলছে, আর তারই সঙ্গে চলছে আজাদীর জন্যে লড়াই। ঠিক এইরকম এক পটভূমিতে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দাঙ্গা তো এমনিই থেমে যাবে। টালমাটাল এই অবস্থায় একদিকে স্বাধীনতার স্বর্ণাভ ধূলিকণা উড়ছিল ; আর অন্যদিকে একটা অনিশ্চয়তাও দোল খাচ্ছিল। এই টালমাটাল অবস্থা—এই অনিশ্চয়তার মধ্যে কখনও বা ভবিষ্যতের বন্ধুত্বের একাত্মতার একটা অস্পষ্ট রূপরেখা ঝিলিক দিয়ে উঠছিল।

খুব সম্ভব জেহলম স্টেশন ছাড়িয়ে যাওয়ার পরেই ওপরের বার্থের

পাঠান তার খাবারের পুটলী খুলে বসল। পুটলী খুলে সেদ্ধ মাংস এবং নান-রুটি বের করে সবাইকে ভাগ করে দিতে লাগল আর আমার পাশে বসা সেই রোগামতো ভদ্রলোকটিকে হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই নান-রুটি খাওয়ার জন্যে জোরাজুরি করতে লাগল। "আরে বাবুসাহেব, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, গতরে তাগদ হবে। আমার মতো তাগদ হবে। বৌ তোমার সাথে খুশীতে থাকবে। আরে ডালখোর, অত ডাল খাও বলেই তুমি এত রোগা-পটকা।"

কামরার সবাই হাসতে লাগল। ভদ্রলোকটি পশ্‌তুতে তাকে যেন কী বললেন। সে মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকাল।

অন্য একজন পাঠান হেসে বলল, "আমাদের হাতের ছোঁয়া যদি খেতে মন না চায়, তবে নিজের হাতে তুলে নাও। খোদার কসম খেয়ে বলছি, খাসির মাংস, অন্য কিছু নয়।"

ওপরের বার্থে যে পাঠানটি বসেছিল, সে বলল, "আরে আমাদের হাতে খেলে তোমাকে এখানে কে দেখছে। তোমার বৌকে তো আমি আর বলতে যাচ্ছি না। আমাদের সঙ্গেই বসে খাও। আমরা না হয় তোমার সঙ্গে ডালই খাব।"

জোর হাসি-ঠাট্টা চলল। রোগা ভদ্রলোকটিও হেসে হেসে মাথা দোলাতে লাগল। পশ্‌তুতে দু-চারটে জবাবও দিল।

"আমরা খাচ্ছি, আর তুমি বসে বসে আমাদের মুখ দেখবে—এ খুব খারাপ।"

নাদুস-নুদুস একজন পাঠান সর্দার বলল, "কেন ও খাবে, তুমি এঁটো হাতে খাচ্ছ না!" বলে হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল। বেঞ্চের ওপর কাত হয়ে সে আধ-শোয়া অবস্থায় ছিল। আর তাতেই তার ভুঁড়ির অর্ধেকটা সিট থেকে ঝুলে পড়ছিল।—"ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই তুমি পুটলী খুলে খানা খেতে শুরু করে দিলে। তাই বাবুজী তোমার হাতের ছোঁয়া খাবে না—না খাওয়ার আর কী কারণ থাকতে পারে।" পাঠানটি আমাকে চোখ মেরে আবার হিঃ হিঃ করে হাসতে লাগল।

পাঠান সর্দারটি আবার টিটকিরি মেরে বলল, "বাবুজী মাংস খায় না। মেয়েদের কামরায় গিয়ে বসো, এখানে বসে কী করবে?"

কামরায় আরও যাত্রী ছিল। কিন্তু এই পাঠানটি এই কামরায়

পুরনো যাত্রী। সফরের শুরু থেকেই সে এই কামরায় আছে। আর যারা ছিল তারা নেমে গিয়েছে, আবার কিছু নতুন যাত্রীও উঠেছে। পুরনো যাত্রী বলেই হয়তো তার মধ্যে কেমন যেন একটা বেপরোয়া-ভাব এসে গিয়েছিল।

—আরে এদিকে এসো, আমার কাছে এসে বসো। গল্প করা যাক।

ঠিক এই সময় কোন এক স্টেশনে এসে গাড়ি থামল। একদঙ্গল যাত্রী হুড়মুড় করে কামরায় উঠল। ধাক্কাধাক্কি করতে করতে অনেকে একসঙ্গে কামরার মধ্যে এগুতে লাগল।

কে একজন জিজ্ঞেস করল, "কোন স্টেশন?"

আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বললাম, "খুব সম্ভব উজিরাবাদ।"

স্টেশনে গাড়ি বেশীক্ষণ দাঁড়াল না। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার ঠিক আগে একটা খুবই সাধারণ ঘটনা ঘটল। আমাদের পাশের কামরার একজন লোটায় জল নেয়ার জন্যে প্ল্যাটফরমে নেমেছিল। লোটায় জল ভরতে ভরতে সে ছুটে কামরার দিকে পালিয়ে এল। লোটা থেকে ছলকে ছলকে জল পড়ছিল। আর যেভাবে সে ছুটে পালিয়ে এল তা দেখেই বোঝা যায় কিছু একটা ঘটেছে। জলের কলের কাছে আরও দু-চারজন লোক দাঁড়িয়েছিল। ওর দৌড় দেখে তারাও যে যার কামরার দিকে ছুট দিল। এইরকম ঘাবড়ে-যাওয়া লোকদের দৌড় আমি এর আগেও দেখেছি। দেখতে দেখতে সারা প্ল্যাটফরম খালি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের কামরায় তখনও হাসি-ঠাট্টা চলছে।

আমার পাশে-বসা সেই রোগামতো বাবুটি জিজ্ঞেস করল, "কিছু হয়েছে নাকি?"

হয়তো কিছু ঘটেছিল। কিন্তু কী ঘটেছিল তা কেউ-ই ভালোভাবে জানে না। আমি অনেক দাঙ্গা দেখেছি। তাই আবহাওয়ার সামান্যতম পরিবর্তন দেখলেই বুঝতে পারি, কী ঘটেছে। লোকজনের ছোটাছুটি, ঠাস ঠাস করে দরজা-জানলা বন্ধ করা, বাড়ির ছাদের ওপর লোকজন আর থমথমে ভাব—এ সমস্ত-কিছুই দাঙ্গার চিহ্ন।

ঠিক সেই সময় প্ল্যাটফরমের উল্টোদিকের যে দরজা, সেই দরজা

খোলার একটা শব্দ হল। কে যেন সেই দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

একজন তাকে উঠতে বাধা দিয়ে বলল, "আরে কোথায় উঠছ, এখানে কোন জায়গা নেই, বলছি না—এখানে জায়গা নেই।"

কয়েকজন যাত্রী অনেকক্ষণ ধরেই ভেতরে ঢোকার জন্যে চেষ্টা করছিল আর ভেতরের যাত্রীরা তাদের বাধা দিচ্ছে। কিন্তু একবার কোনরকমে ভেতরে ঢুকতে পারলে আর কেউ বিরোধিতা করে না, বরং অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা সেই কামরার হকদার হয়ে ওঠে। আর পরের স্টেশন থেকেই তারাই কোমর বেঁধে নেমে পড়ে যাতে অন্য যাত্রীরা না উঠতে পারে: ..."অন্য কোন কামরা দেখ......এখানে জায়গা নেই......তাও উঠছ।......"

দরজার কাছে শোরগোল ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ঠিক এই সময় দেখতে পেলাম দলা-মোচড়া কাপড় নিয়ে ইয়া-বড়া এক গোঁফওয়ালা লোক ভেতরে ঢুকল। তেল-চিটচিটে ময়লা জামা-কাপড় দেখে মনে হল লোকটা নিশ্চয়ই এক হালুইকর। কামরার লোকজনের প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করেই সে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে একটা বিরাট কালো ট্রাঙ্ক টেনে তুলতে লাগল।

লোকটি কাকে যেন বলল, "উঠে এস, ভেতরে উঠে এস।" দরজার কাছে পাতলা লিকলিকে হাড্ডিসার এক মহিলাকে দেখলাম, আর সেই মহিলার পেছনে পেছনে উঠে এল বছর ষোল-সতেরোর শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে। কামরার লোকজন তখনও গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে চলেছে। পাঠান সর্দারটি পাশ ফিরে উঠে বসল।

প্রায় একসঙ্গে অনেকে চীৎকার করে বলতে লাগল, "দরজা বন্ধ করে দাও, জিজ্ঞেস না করে উঠছ কেন? এটা তোমার বাবার কামরা নাকি? ওকে ভেতরে ঢুকতে দিও না। ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দাও.... ..।"

লোকটি কোন কিছু গ্রাহ্য না করে তার আসবাবপত্র টেনে হিঁচড়ে ভেতরে তুলছিল। আর তার স্ত্রী এবং মেয়ে পায়খানার দরজার সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছিল।

"আর কোন কামরা কি খুঁজে পেলে না? মেয়েমানুষ নিয়ে এই কামরায় উঠলে?"

লোকটি ঘেমে নেয়ে গিয়েছিল। হাঁসফাঁস করতে করতে তার জিনিসপত্র টেনে-হেঁচড়ে ভেতরে তুলছিল। ট্রাঙ্ক তুলে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটা খাটিয়া সে ভেতরে টেনে তোলার চেষ্টা করছিল।

"আরে মশায়, বিনা টিকিটে যাচ্ছি না, আমাদের কাছে টিকিট আছে। কী করব কোন উপায় নেই, শহরে দাঙ্গা হচ্ছে। কী কষ্ট করেই না স্টেশন অব্দি পৌঁছেছি।" ওর আকুতি-ভরা কথায় সবাই ঠাণ্ডা মেরে গেল। কিন্তু ওপর বার্থের পাঠানটি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "এখান থেকে নেমে যাও বলছি, দেখতে পাচ্ছ না এখানে কোন জায়গা নেই।"

পাঠানটি ওপরের বার্থ থেকেই সেই লোকটির দিকে জোরে এক লাথি ছুঁড়ল। কিন্তু লাথিটি লোকটির গায়ে না লেগে তার স্ত্রীর বুকে লাগল। মহিলাটি চীৎকার করে সেখানেই বসে পড়ল।

যাত্রীদের সঙ্গে ঝগড়া-ঝাটি করার মতো তার কোন সময় নেই। সমানে সে তার জিনিসপত্র কামরার মধ্যে টেনে তুলছে। গোটা কামরাটাই ঠাণ্ডা। খাটিয়া তোলার পর সে বড় বড় বাক্স-প্যাঁটরা টেনে টেনে তুলতে লাগল। অবস্থা দেখে ওপরের বার্থের পাঠানটি এবার ধৈর্য হারাল। সে চীৎকার করে উঠল, "নামিয়ে দাও, একে নামিয়ে দাও, জানোয়ার কোত্থেকে এসেছে?" নীচের সিটে যে পাঠানটি বসেছিল সে উঠে দাঁড়াল। এবং লাল-কুর্তা-পরা যে কুলিটি ট্রাঙ্কটা ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছিল তাকে এক ধাক্কায় নীচে ফেলে দিল।

মহিলাটির আঘাত লাগার পর থেকে কামরার অন্যান্য যাত্রীরা লোকটিকে আর একটি কথাও বলল না। সবাই চুপ হয়ে গিয়েছিল। শুধু এক কোণায়-বসা এক বৃদ্ধা গজগজ করে চলেছিল, "ওকে বসতে দাও, ও মেয়ে, তুই আমার কাছে এসে বস্। আয়, এদিকে আয়। কোন রকমে এ যাত্রা কাটিয়ে নেব। এ জালিমদের কথা ছেড়ে দে, এদের বসতে দাও।"

অর্ধেকের বেশী জিনিসপত্র কামরাতে তোলার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

লোকটি হকচকিয়ে চীৎকার শুরু করে দিল, "আরে বাক্স-প্যাঁটরা

রয়ে গেল—সামন রয়ে গেল।"

পায়খানার সঙ্গে সেঁটে-দাঁড়ানো মেয়েটি থরথর করে কাঁপছিল। আর সমানে চীৎকার করে যাচ্ছিল "বাবা, নীচে জিনিসপত্র রয়ে গেল।"

লোকটি আরও ঘাবড়ে গিয়ে চীৎকার করতে লাগল, "নাম, জলদি, জলদি নাম।" খাট এবং বোঁচকা-বুঁচকি নীচে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে সে হ্যাণ্ডেল ধরে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মেয়ে এবং স্ত্রীও ঝাঁপ দিল।

বৃদ্ধাটি চীৎকার করে বলতে লাগল, "তোমরা, তোমরা খুব অন্যায় করলে—তোমাদের হৃদয়ে কোন মায়া-মমতা নেই—সব মায়া-মমতা পুড়ে খাক হয়ে গ্যাছে। ওদের সঙ্গে একটা শিশুও ছিল। তোমরা খুব অন্যায় কাজ করলে। ধাক্কা দিয়ে ওদের ফেলে দিলে!"

জনমানবহীন প্ল্যাটফরম ছেড়ে গাড়ি তখন সামনে ছুটে চলল। সমস্ত কামরাটাই কেমন যেন এক বিহ্বলতায় স্তব্ধ। বৃদ্ধাটি আর মুখ খুলল না। পাঠানদের বিরুদ্ধে কেউ একটা টুঁ শব্দ করতেও সাহস পেল না।

ঠিক সেই সময় আমার পাশের ভদ্রলোকটি আমার হাত খুব জোরে চেপে ধরে বলল, "দেখুন দেখুন, আগুন লেগেছে।"

গাড়ি প্ল্যাটফরম ছেড়ে এগিয়ে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শহরও পেছনে সরে যাচ্ছে। চলন্ত গাড়ি থেকে আমরা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখলাম। আর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর আগুনের শিখা লকলক করছে।

"মনে হচ্ছে দাঙ্গা হচ্ছে। স্টেশনেও লোকজন ভয়ে ছোটাছুটি করছে। কোথাও দাঙ্গা লেগেছে।"

শহরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত রেলের কামরায় দাঙ্গার খবর ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে আগুনের দৃশ্য দেখতে লাগল।

শহর পেছনে ফেলে গাড়ি ছুটে চলেছে। কিন্তু সমস্ত কামরায় কেমন একটা অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা। আমি সমস্ত কামরায় একঝলক চোখ বুলিয়ে নিলাম। রোগামতো ভদ্রলোকটি ভয়ে কেমন ফ্যাকাশে

হয়ে গেছে। তার কপালের ওপর চিকচিক ঘাম। মুখটা যেন কোন মৃত মানুষের। চারদিক দেখে মনে হচ্ছিল, প্রত্যেকেই যে যার জায়গায় বসে অন্যকে পরখ করছে। সর্দারজী ওপরের বার্থ থেকে নেমে আমার পাশে এসে বসল। আমার পাশে যে দুজন পাঠান বসেছিল তারা ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ওপরের বার্থে যেখানে পাঠানটি ছিল, সেখানে গিয়ে উঠে বসল। খুব সম্ভব অন্যান্য কামরাতে এরকমই ব্যাপার ঘটছিল। তিনজন পাঠানই ওপরের বার্থ থেকে নীচের যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করছে। যাত্রীদের সকলের চোখই ভয়ে বিস্ফারিত।

হঠাৎ কামরার মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করল, "কোন্ স্টেশন ?"

উত্তরে কেউ বলল, "উজিরাবাদ।"

'উজিরাবাদ' নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কামরার আবহাওয়া আবার পালটে গেল। পাঠানদের সেই তিরিক্ষি মেজাজ যেন এক নিমেষে চুপসে গেল। হিন্দু আর শিখ যাত্রীদের মধ্যে নেমে এল একটা গভীর নিস্তব্ধতা। একজন পাঠান তার ওভারকোটের পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে নস্যি টানতে লাগল। বৃদ্ধাটি সমানে মালা জপ করে চলেছে। মাঝেমধ্যে তার ঠোঁট দুটি নড়ছে, আর তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা বিদঘুটে শব্দ বের হচ্ছে।

পরের স্টেশনে যখন গাড়ি থামল, দেখলাম সেই স্টেশনেও একটা থমথমে ভাব। একটা পায়রাও ফরফর করে প্ল্যাটফরমের ওপর উড়ছে না। শুধু একজন ভিস্তিওয়ালা পিঠে জলের মশক নিয়ে জল দিচ্ছে।

"জল খাবে, জল ?" মহিলাদের কামরার জানলা দিয়ে মেয়ে আর শিশুদের অনেকগুলো হাত বাইরে উদ্‌গ্রীব হয়ে জল চাইতে লাগল।

গাড়ি ছাড়তেই, হঠাৎ জানলা বন্ধ করার শব্দ কানে আসতে লাগল। রেলের ঘটঘটাং আওয়াজের সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে গাড়ির এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত জানলা বন্ধ করার শব্দ।

জানি না কী এক অজানা আশঙ্কায় আমার পাশের সেই রোগা-মতো লোকটি উঠে দুই সিটের মাঝখানের ফালি জায়গাটায় শুয়ে পড়ল। ওর সমস্ত মুখ মরা মানুষের মতো ফ্যাকাশে। ওপরের বার্থের পাঠানটি তাকে কটাক্ষ করে বলল, "আরে, তুমি মরদ মানুষের দুর্নাম করছ।" পাঠানটি একই কথা বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছে আর

সমানে খিকখিক করে হেসে চলেছে। তারপর পশ্‌তুতে সে কী যেন বলল। ভদ্রলোকটি কোন কথার জবাব না দিয়ে ঘাপটি মেরে শুয়ে রইল। অন্যান্য যাত্রীদের মুখেও টুঁ শব্দটি নেই। সমস্ত কামরার পরিবেশে কেমন একটা ভয়াবহতা।

"এরকম মেয়েলী মানুষকে এ কামরাতে আমি থাকতে দেব না। বাবু সাহাব, সামনের স্টেশন এলে মেয়েদের কামরায় গিয়ে উঠো।"

ভদ্রলোকটি এই কথারও কোন জবাব দিল না। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই উঠে সিটে গিয়ে বসল। ও হঠাৎ কেন মেঝেতে শুয়েছিল, আর কেনই বা উঠে জানলা বন্ধ করে দিল জানি না। হয়তো ও ভাবছিল বাইরে থেকে ইট-পাটকেল বা গুলিগোলা ছুটে এসে লাগতে পারে।

একটা উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে আমাদের মুহূর্তগুলো কাটছিল। রাত্রি ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। গাড়ির গতি একটু ঢিমে হয়ে এলেই সবাই পরস্পরের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছি। পথের মাঝে গাড়ি থেমে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে কামরায় ভীষণ একটা স্তব্ধতা নেমে আসছে। শুধু পাঠানদের মধ্যেই কোন উদ্বেগের চিহ্ন নেই। তাদের মুখ-চলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল—কারণ ওদের হাসি-মস্করাতে আর কেউ সায় দিচ্ছিল না।

পাঠানটি ঝিমুচ্ছিল। অন্যান্য যাত্রীরা ভাবলেশহীন চোখে শূন্য-তার মধ্যে উসখুস করছিল। বৃদ্ধাটি আপাদমস্তক ঢেকে, দু-পা বেঞ্চের ওপর তুলে জড়সড় হয়ে বসে ঝিমুচ্ছিল। ওপরের বার্থের আর একজন পাঠান আধ-শোয়া অবস্থায় পকেট থেকে কালো পুঁতির তসবিহ বের করে হাতে ফেরাতে লাগল।

আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোয় বাইরের পরিবেশ আরও অনিশ্চিত—আরও রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দূরে—বহু দূরে হঠাৎ হঠাৎ আগুনের হলকা নজরে পড়ছে। হয়তো কোন শহরে আগুন লেগেছে। কখনও কখনও গাড়ি হুইসল দিতে দিতে তীব্র বেগে ছুটে চলেছে। আবার কখনও বা তার গতি ঢিমে হয়ে আসছে। তারপর মাইলের পর মাইল ঢিমেতালেই এগিয়ে চলছে।

সেই রোগামতো ভদ্রলোকটি বাইরের দিকে মাথা বাড়িয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে হঠাৎ চীৎকার করে উঠল, "হরবংসপুরা পেরিয়ে গেছে।" তার চীৎকারে একটা উত্তেজনা ছিল। কামরার সবাই চমকে উঠে আবার নড়েচড়ে বসল।

যে পাঠানটি হাতে তসবিহ ফেরাচ্ছিল, সে বলল, "আরে বাবু সাহাব, এত চিল্লাচ্ছ কেন ? তুমি কি এখানে নামবে ? শিকল টানব !" বলেই সে খিকখিক করে হাসতে লাগল। সে হয়তো হরবংসপুরার নামই শোনে নি, কিংবা জায়গাটা কোথায় তাই জানে না।

ভদ্রলোকটি পাঠানের মস্করার কোন জবাব না দিয়ে শুধু মাথাটা একটু কাত করল। তার দিকে একঝলক তাকিয়ে জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বারবার বাইরের দিকে তাকাতে লাগল।

কামরায় আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। এক সময় ইঞ্জিন হুইসল দিল। গাড়ির গতিও বেশ কিছুটা কমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ঠকাস, ঘটাং করে একটা শব্দ হল। খুব সম্ভব গাড়ি লাইন বদল করল। গাড়ি যে দিকে ছুটছিল ভদ্রলোক সেই দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল।

"এসে গিয়েছে, এসে গিয়েছে, অমৃতসর এসে গিয়েছে।" বলে সে চীৎকার করে উঠে উল্লাসে লাফিয়ে দাঁড়াল। তারপর ওপরের বার্থের পাঠানটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আবে পাঠান কি বাচ্চে, নীচে নেমে আয় শালা, তোর মার···নীচে নেমে আয় বলছি। তোর পাঠানত্ব ঘুচিয়ে দেব···"

ভদ্রলোকটি জোরে চীৎকার আর গালিগালাজ করতে লাগল। যে পাঠানটি তসবিহ ফেরাচ্ছিল, সে পাশ ফিরে ভদ্রলোকটিকে বলল, "আরে বাবুজী, তুমি আমাকে কিছু বলছ ?"

ভদ্রলোকটিকে উত্তেজিত দেখে অন্য যাত্রীরাও উঠে দাঁড়াল।

"নীচে নেমে আয় শালা···হিন্দুর মেয়েকে লাথি মেরেছিস, হারামজাদা কোথাকার !"

"আরে বাবু, বকবক মৎ কর। বলছি, গালিগালাজ কোরো না। গালি দিলে তোমার গলা ঘুঁটে দেব।"

"গালি দিচ্ছিস মাদার···" চীৎকার করতে করতে ভদ্রলোকটি

সিটের ওপর উঠে দাঁড়াল। ও তখন থরথর করে কাঁপছে।

সর্দারজী বলল, "আরে রাখ, খুব হয়েছে। এটা লড়াই-ঝগড়া করার জায়গা নয়। কতক্ষণের আর সফর, মাথা ঠাণ্ডা করে বোস।"

ভদ্রলোকটি গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে বলল, "শালা তোকে যদি লাথি না মারি তবে···গাড়ি তোর বাপের ?"

"আরে তুমি শুধু মিছিমিছি আমাকে কেন দোষ দিচ্ছ, সবাই তো ওকে বের করে দিয়েছে। আমিও ছিলাম ঠিকই। তুমি শুধু আমাকেই গালমন্দ করছ। আর-একবার গালি দিলে গলা টিপে ধরব।" পাঠানটির কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধাটি বলল, "আরে বীরপুঙ্গবরা, আরাম করে বোস। তোমাদের কি কোন আক্কেল-শরম নেই।"

বৃদ্ধার ঠোঁট দুটিকে প্রেতের ঠোঁট বলে মনে হচ্ছিল। আর সেই ঠোঁটের ফাঁকটুকু দিয়ে ক্ষীণ একটা ক্যাসফেসে আওয়াজ বেরিয়ে আসছিল।

ভদ্রলোকটি সমানে চীৎকার করে চলেছে, "শালা নিজের ঘরে শের, এখন দেখি তোর কেমন পাঠানের হিম্মত···"

ঠিক এই সময় গাড়ি অমৃতসরের প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফরমে তিল ধরার জায়গা নেই, লোকে গিজ গিজ করছে। যারা অপেক্ষা করছিল, তারা সবাই হুমড়ি খেয়ে কামরার ভেতরটা দেখতে লাগল। সবাই বারবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, "পথে কী হয়েছে, কোথায় কোথায় দাঙ্গা হয়েছে ?"

লোকে-থিকথিক প্ল্যাটফরমে শুধু দাঙ্গারই চর্চা হচ্ছিল : পথে কোথায় কী ঘটেছে। হঠাৎ খিদে-তেষ্টা বোধ হতেই কয়েকজন যাত্রী একজন চাটওয়ালার ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ঠিক এই সময় তিন-চারজন পাঠান আমাদের কামরার দিকে এগিয়ে এল এবং ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। পাঠান দোস্তদের দেখতে পেয়েই পশ্‌তুতে কী যেন বলল। আমি পেছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম ভদ্রলোকটি নেই। জানি না ও কখন গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। আমার টনক নড়ে গেল। রাগে ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। না জানি কী করে বসে। ইতিমধ্যে পাঠানরা তাদের লটবহর নিয়ে নেমে পড়ল এবং পাঠান দোস্তদের সঙ্গে অন্য কামরার দিকে এগিয়ে

গেল। আগে একবার যেভাবে সবাই ভাগাভাগি করে কামরায় কামরায় বসেছিল, এবার আবার তাই শুরু হল।

চাটওয়ালার চারদিকে যে ভিড় জমে উঠেছিল, তা এখন কিছুটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় ভদ্রলোকটিকে আমাদের কামরার দিকে এগিয়ে আসতে দেখলাম। ওর মুখের ফ্যাকাসে ভাব এখনও কেটে যায়নি। কপালের ওপর একগুচ্ছ চুল হাওয়ায় উড়ছিল। কাছাকাছি এলে লক্ষ্য করলাম, ওর ডান হাতে লোহার একটা ছড়। জানি না লোহার ছড়টা ও কোথা থেকে জোগাড় করল। কামরায় ঢোকার সময় ও ছড়টা পেছনের দিকে লুকিয়ে নিল এবং আমার পাশে বসার আগে ছড়টা সিটের নীচে এক ধাক্কায় ঢুকিয়ে দিল। সিটে বসে ও ওপরের বার্থের পাঠানের দিকে তাকাল। কিন্তু পাঠানদের দেখতে না পেয়ে হকচকিয়ে গেল।

"হারামীটা পালিয়ে গ্যাছে?…সব শালাই পালিয়েছে।" বলতে বলতে সে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে উঠে দাঁড়াল। তারপর চীৎকার করে বলতে লাগল, "তোমরা ওদেরকে ছেড়ে দিলে? তোমরা সব হিজড়ে…তোমাদের কি কোন রাগ-অভিমান নেই।"

গাড়িতে প্রচণ্ড ভিড়। বহু নতুন যাত্রী উঠেছে। কেউই তার কথায় কোন গুরুত্ব দিল না।

গাড়ি ছাড়লে, সে আবার আমার পাশে এসে বসল। কিন্তু সে তখনও উত্তেজনায় কাঁপছে আর সমানে বকবক করে চলেছে।

হেঁচকা টান দিয়ে গাড়িটা এগুতে লাগল। পুরনো যাত্রীরা পেট ভরে লুচি-তরকারি এবং জল খেয়ে নিয়েছিল। অমৃতসর ছেড়ে গাড়ি এগিয়ে চলল। যে দিকে তাদের জীবন বিপন্ন নয় সেদিকেই গাড়িটা এগিয়ে চলল।

নতুন যে যাত্রীরা গাড়িতে উঠেছিল, তারা সমানে কথা বলে চলেছে। গাড়ি আবার মাঝারি গতিতে ছুটতেই অল্পক্ষণের মধ্যে কামরার যাত্রীরা ঝিমুতে শুরু করল। কিন্তু ভদ্রলোকটি ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল আর বারবার আমাকে

জিজ্ঞেস করে চলল, "পাঠানরা কোন দিকে গিয়েছে দেখেছেন?" বুঝলাম ওর মাথায় পাগলামি ভর করেছে।

গাড়ি আবার এক স্টেশনে এসে থামল। চাকার ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল। মনে হচ্ছিল প্ল্যাটফরম থেকে কিছু গড়িয়ে পড়ছে বা কোন যাত্রী নামছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম।

বার বার তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছিল। একবার ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলাম, গাড়ির গতি বেশ কম। সারা কামরা অন্ধকার। আমি ঘাড়টা উঁচিয়ে শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। পেছনে যে স্টেশন ফেলে এসেছিলাম, সেই স্টেশনের লাল সিগন্যাল তখনও জ্বলজ্বল করছে। সবে একটা স্টেশন ছেড়েছি। তাই গাড়ির গতি এখনও তেমন তীব্র হয়ে ওঠেনি।

কামরার মধ্যে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন শোনা গেল। দূরে ধোঁয়ার একটা কালো কুণ্ডলী দেখা যাচ্ছিল। ঘুম-ঘুম চোখ নিয়ে আমি সেই ধোঁয়ার কালো কুণ্ডলীর দিকে আবিষ্টের মতো তাকিয়ে রইলাম। বুঝতে পারছিলাম না, এই ধোঁয়ার কুণ্ডলী কিসের। তাই এ নিয়ে আর ভাবলাম না। কামরার মধ্যে অন্ধকার। সমস্ত আলো নিভে গেছে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে আশঙ্কা হল, বোধহয় আগুনের গোলা এখনই ফাটবে।

আমার পেছনের যে কামরা, সেই কামরা থেকে কোন কিছু হেঁচড়ানোর শব্দ আসতে লাগল। পেছনের কামরার দরজার দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম দরজা বন্ধ। আবার দরজার ঘরঘরানির আওয়াজ শুনতে পেলাম। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠল। লাঠি দিয়ে দরজার ওপর কে যেন সমানে ঠকঠক আওয়াজ করে চলেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করলাম। দেখলাম, একটা লোক পাদানিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার কাঁধে একটা ঝুলি, হাতে একটা লাঠি, আর পরনে বিদঘুটে এক রঙচঙে পোশাক। মুখে একরাশ দাড়ি। কী ঘটছে দেখার জন্যে নীচের দিকে তাকালাম। দেখলাম, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক মহিলা সমানে ছুটছে। মহিলাটির খালি পা, আর হাতে দুটি বোঝা। বোঝার ভারে সে ভালো করে

দৌড়তে পারছে না। পাদানিতে যে লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল, সে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে মহিলাটিকে দেখছিল, আর হাঁফাতে হাঁফাতে চিল্লোছে, "ছুটে আয়, কোনরকমে উঠে পড়।"

দরজার ওপর লাঠি দিয়ে আঘাত করতে করতে সে বলতে লাগল, "দরজাটা খোল, খোদার ওয়াস্তে দরজাটা খোল।"

লোকটি হাঁফাচ্ছিল আর বলছিল, "খোদার ওয়াস্তে দরজাটা খুলে দাও। আমার সঙ্গে মেয়েছেলে আছে। গাড়ি ছেড়ে দেবে..."

হঠাৎ আমি দেখলাম, রোগামতো ভদ্রলোকটি হড়বড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে চীৎকার করে উঠল, "কে? এখানে কোন জায়গা নেই।"

পাদানিতে দাঁড়ানো লোকটি বিড়বিড় করতে লাগল, "খোদার ওয়াস্তে বলছি, গাড়ি ছেড়ে দেবে..."

লোকটি জানলা দিয়ে ভেতরে হাত বাড়িয়ে ছিটকিনি খোলার চেষ্টা করতে লাগল।

ভদ্রলোকটি চীৎকার করে বলতে লাগল, "বলছি না ভেতরে জায়গা নেই। নেমে যাও বলছি।" আর ঠিক সেই সময় দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল।

আর তখনই চেয়ে দেখলাম, ভদ্রলোকটির হাতের ছড়টা ঝকমক করছে। সে লোকটির মাথায় সেই ছড় দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম। পা দুটো কেমন শিথিল হয়ে গেল। সেই ছড়ের প্রচণ্ড আঘাতেও কিন্তু লোকটি পড়ে গেল না। তার দুটো হাত তখনও শক্ত করে গাড়ির হ্যাণ্ডেল চেপে ধরে আছে। কাঁধের ঝোলাটা ছিটকে তার মুঠির কাছে নেমে এসেছে।

চোখ মেলে দেখলাম তার সারা মুখের ওপর রক্তের কয়েকটি ধারা। ভিড়-ভারাক্কার মধ্যেও তার ঠোঁটের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁত দেখতে পেলাম। সে শুধু একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল, "হায় আল্লা, হায় আল্লা!" তার পা টলছে। সে ভদ্রলোকটির দিকে পাথর চোখে তাকাল। চোখ তার বুজে আসছিল। সে তার করুণ চোখ দুটি দিয়ে সেই ভদ্রলোকটিকে সনাক্ত করতে চাইছিল, 'তুমি কে? কিসের বদলা নিচ্ছ তুমি?' এর মধ্যে অন্ধকার বেশ কিছুটা সরে গিয়েছে।

তার ঠোঁট থরথর কাঁপছিল, আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সাদা দাঁত দেখা যাচ্ছিল। দেখে ভুল হচ্ছিল ও যেন মুচকি মুচকি হাসছে; কিন্তু আসলে ভয়ে ওর ঠোঁট দুটি তখন নেতিয়ে পড়েছিল।

নীচে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ওর স্ত্রী সমানে ছুটে আসছিল। আর সমানে অভিশাপ দিয়ে চলেছিল স্বামীকে। স্ত্রী তখনও জানে না তার স্বামীর কী হয়েছে। ভাবছে, গাঁটরির ভারের জন্যে ওর স্বামী গাড়িতে উঠতে পারছে না, তাই পা টলছে। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে সেও ছুটে আসতে লাগল। নিজের বোঁচকা সামলাতে সামলাতে ও স্বামীর পাদুটো ঠেলে ঠেলে পাদানিতে ঠিক করে দিচ্ছিল।

একসময় লোকটির হাত হ্যাণ্ডেল থেকে আলগা হয়ে গেল। হাতটা শিথিল হয়ে যেতেই সে গুঁড়ি কাটা গাছের মতো নীচে ছিটকে পড়ল। ছিটকে পড়তেই মহিলাটি ছোটা বন্ধ করে দিল। যেন তাদের দুজনেরই সফর একসঙ্গে থেমে গেল।

ভদ্রলোকটি হাট-করা দরজার কাছে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তখনও তার হাতে লোহার ছড়। ভাবলাম ও লোহার ছড়টা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু ছুঁড়ে না ফেলে সে ছড়টা নিয়েই তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। ওর হাতে যেন কোন বল নেই। আমার জোর জোর নিঃশ্বাস পড়ছিল। অন্ধকারে এক কোণে জানলার সঙ্গে ঠেস দিয়ে বসে আমি ওকে লক্ষ্য করছিলাম।

ভদ্রলোকটি একটু নড়ে চড়ে উঠল। জানি না কেন ও সামনের দিকে দু-এক পা এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে খোলা দরজা দিয়ে পেছনের দিকে ফিরে তাকাল।

গাড়ি ছুটে চলছিল। আর কামরার মধ্যে একটা আবছা-আবছা অন্ধকার।

ভদ্রলোকটি বেহেডের মতো টলছে। এক ঝটকায় সে ছড়টি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর সে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরনের জামা কাপড়, নিজের দু-হাত দেখল। হাত দুটো নাকের কাছে এনে শুঁকল। শুঁকে সে পরখ করছিল, তার হাতে কোন রক্তের গন্ধ নেই

তো। তারপর সে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে আমার পাশে বসল।

ক্রমেই অন্ধকার মিলিয়ে গিয়ে দিনের আলো ফুটে উঠল। একটা মেঘমুক্ত আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গাড়ি চলছে, কেউই শেকল টেনে গাড়ি থামানোর চেষ্টা করছে না। ইতিমধ্যে ছিটকে-পড়া সেই লোকটিকে আমরা কয়েক মাইল দূরে ফেলে এসেছি।···গমের ক্ষেতে তখনও মৃদু-মন্দ হাওয়ার ঢেউ খেলে চলেছে।

সর্দারজী গা চুলকোতে চুলকোতে উঠে বসল। ভদ্রলোকটি মাথার পেছনে দু-হাত রেখে সামনের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে ছিল। এক রাতের মধ্যেই তার মুখে ছোট ছোট দাড়ি গজিয়ে গিয়েছে। সর্দারজী তার সঙ্গে গল্প শুরু করে দিল। বলল, "দেখতে এমন হলে কী হবে, আপনার মশাই হিম্মত আছে। সত্যি, আপনি হিম্মত দেখিয়েছেন বটে। আপনার ভয়েই পাঠানরা এ কামরা ছেড়ে পালাল। ওরা এখানে থাকলে, আপনি নিশ্চয়ই ওদের মাথা চৌচির করে দিতেন···" সর্দারজী তোষামোদ করছিল আর সমানে হিঃ হিঃ করে হাসছিল।

ভদ্রলোকটি কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসল। অদ্ভুত বীভৎস সেই হাসি।

সে সর্দারজীর মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল!

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক

খড় কাটার মেশিন

উপেন্দ্রনাথ অশ্‌ক-এর জন্ম পাঞ্জাবের জলন্ধরে, কাল্লোভানি মহল্লায়। পিতার বৃত্তি ছিল যজমানি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশ হয় উনিশ শ' ছাব্বিশ সালে লাহোরের উর্দু 'মিলাপে'। প্রেমচন্দ-এর সঙ্গে যোগাযোগের পর উর্দু থেকে হিন্দী সাহিত্যে আসেন। আই.পি.টি.এ. এবং প্রগতি লেখক সংঘ-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। সাজ্জাদ জাহিদের অনুরোধে তিনি 'তুফান সে পহলে' একাঙ্ক নাটকটি লেখেন। কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই বেআইনী বলে ঘোষিত হয়। তাঁর 'গরম রাগ' একসময় প্রগতিশীল মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। তিনি অসংখ্য নাটক কবিতা গল্প এবং উপন্যাস লেখেন এবং এখনও লিখে চলেছেন।

রেল লাইনের ওপারে নতুন গড়ে-ওঠা বসতি ইসলামাবাদ। সেই নতুন বসতির মুসলমানরা যখন জিনিসপত্রের মোহ ছেড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল, তখন আমাদের প্রতিবেশী লহনা সিং-এর স্ত্রীর বুদ্ধি খেলে গেল।

সর্দারনী লহনা সিংকে বলল, "তুমি হাতের ওপর হাত রেখে নপুংসকের মতো বসে আছ! ওদিকে সবাই একেকটা সুন্দর বাড়ি কব্জা করে নিচ্ছে।"

সব রকম অপমানজনক কথা শুনতে রাজি লহনা সিং, কিন্তু মেয়েছেলের মুখ থেকে 'নপুংসক' শুনতে সে কিছুতেই রাজি নয়। তাই সে তার ঢিলে পাগড়িটা খুলে আবার কষে বাঁধতে লাগল, মেঝের সঙ্গে লটর-পটর খাওয়া লুঙ্গিটা কোমরে ভালোভাবে বেঁধে নিল। খাপ থেকে কৃপাণ বের করে তার ধার পরীক্ষা করে আবার খাপে ঢুকিয়ে রাখল। তারপর যে-কোন একটা 'নতুন' বাড়ি দখল করার জন্যে ইসলামাবাদের দিকে রওনা হল।

বাড়ির চৌহদ্দি পেরনোর আগেই সর্দারনী দৌড়তে দৌড়তে এসে লহনা সিং-এর হাতে একটা বড় তালা দিল। বলল, "বাড়ি যদি পেয়ে

যাও, দখল রাখবে কীভাবে?"

সর্দার লহনা সিং এক হাতে তালা নিয়ে এবং অন্য হাত কৃপাণের ওপর রেখে রেল লাইন পেরিয়ে ইসলামাবাদের দিকে এগিয়ে চলল।

অমৃতসরের খালসা কলেজ রোডের পুতলি-ঘরের কাছেই আমার বাড়ি। আমার বাড়ির সামনেই যে এক চিলতে খালি জমি, সেই জমিতেই লহনা সিং-এর খড়-কাটা মেশিনের দোকান। জমির এক দিকে দু-তিনটি স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর।

আলাদা বসত বাড়ি না পাওয়ায় সর্দারজী এখানেই থাকত। দেড়-দুহাজার টাকা নিয়ে সে ব্যবসা শুরু করে, কিন্তু যুদ্ধের সময় (সেই সময় কৃষকদের হাতে প্রচুর টাকা) সেই ব্যবসা ফুলে ফেঁপে বেড়ে ওঠে। আমদানী ভাল থাকায় আসবাবপত্রের বাহুল্য হল এবং সুখ-সুবিধার জন্যে মোহও জাগে তার মধ্যে। প্রথম দিকে এই স্যাঁত-সেঁতে অন্ধকার ঘরেই স্বামী-স্ত্রী খুশিতে ছিল, কিন্তু সবাই যখন তার স্ত্রীকে 'সর্দারনী' বলে ডাকতে লাগল, তখন এই স্যাঁতসেঁতে আর অন্ধকার ঘরটা সে উপেক্ষার চোখে দেখতে শুরু করল। ক্রেতাদের মেশিনের শক্তি এবং কার্যকারিতা দেখানোর জন্যে সর্দারজীকে দিনভর খড় কাটায় ব্যস্ত থাকতে হয়। সমস্ত জায়গা জুড়ে মেশিনের সারি, আর ভয়-ভাবনাহীন সর্দারজী তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়ে সমানে খড় কেটে চলেছে। মেশিনের কর্কশ শব্দ সর্দারনীর কানে অনবরত হাতুড়ির ঘায়ের মতো এসে বিঁধত। যেখানে সেখানে স্তূপ হয়ে পড়ে-থাকা বিচালি সর্দারনীর চোখে খচখচ করে বিঁধতে লাগল। সর্দার লহনা সিং-এর পাগড়ি আর লুঙ্গি ছিল সিল্কের। আগের ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের জামা ছেড়ে এখন তার বদলে সে হাঁটু-অব্দি লম্বা বোস্কির জামা গায়ে দেয়। কিন্তু চালচলনে সে আগের লহনা সিং-ই থেকে গিয়েছিল। অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে ঘর, মেশিনের কর্কশ শব্দ, খড়ের গাদা ওকে বিমর্ষ তো করতই না, বরং এই পরিবেশের মধ্যেই ও খুশিতে ডুবে থাকত। সর্দারজীদের সম্বন্ধে একজন লেখক মন্তব্য করেছিলেন, যে দিক থেকেই উলটে-পালটে দেখ না কেন, শিখকে শিখই দেখবে। সর্দার লহনা সিং সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়।

এর কারণ অবশ্য এই নয়, লহনা সিং রোগা-পটকা। বরং সে বেশ

হৃষ্টপুষ্ট। তার পৌরুষ তাকে পাঁচ-পাঁচটা সন্তানের জনক করেছে। আর সেই-পাঁচটা বাচ্চা সর্বক্ষণ সর্দারনীকে জোঁকের মতো আঁকড়ে ধরে আছে। যখনই কোন বুদ্ধিসুদ্ধির কাজের দরকার পড়ত, সর্দারনী ঠিক তখনই সর্দারজীকে 'বুদ্ধু' বলে উসকে দিত; আর 'নপুংসক' বললেই সর্দারজী রেগে গিয়ে চরম সাহসের কাজটা করে ফেলত। টাকার দেমাকে সর্দারনী ডগমগ, আর বাছাই বাছাই জামাকাপড় পরলে কি হবে, তার মধ্যে শিষ্টতার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

সর্দার লহনা সিং ইসলামাবাদে পৌঁছে দেখল সেখানে মারদাঙ্গা চলছে। তার খড়-কাটা মেশিন যেভাবে নিরীহ বিচালি কেটে ভুর ভুর করে নামিয়ে দিচ্ছে, তখন ঠিক সেই ভাবেই বিশেষ ধর্মের অনুগামীরা অন্য ধর্মের অনুগামীদের সমানে কেটে চলেছে। সর্দার লহনা সিং খাপ থেকে তার ঝকমকে কৃপাণ টেনে বার করল। যদি কোন মুসলমান তার সামনাসামনি এসে পড়ে তবে সে নিজের পৌরুষ প্রমাণ করে ছাড়বে। কিন্তু ইসলামাবাদে একজন জীবিত মুসলমানেরও চিহ্ন ছিল না। অলিতে গলিতে শুধু রক্তের দাগ। আর দূর থেকে লুটতরাজের হৈ চৈ শব্দ।

সে খুব সতর্কভাবে পায়ে পায়ে এগুচ্ছিল। একটু এগুতেই সে দেখতে পেল তার বন্ধু গুরদয়াল সিং একটা বাড়ির তালা ভাঙছে।

সর্দার লহনা সিং এগুতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত হয়ে গুরদয়াল সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমি এই বাড়িটা দখল করছি।" সর্দার গুরদয়াল সিং উপেক্ষার দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আবার নিজের কাজে লেগে গেল।

সর্দার লহনা সিং ঢিলে-হয়ে-যাওয়া পাগড়িটা ভাল করে কষে বাঁধতে লাগল। বাঁধতে বাঁধতে সে বন্ধুর নতুন বাড়িটা একবার নিরিখ করল। বন্ধুকে বাড়ি দখল করতে দেখে নিজের জন্যে বাড়ি খোঁজার কথা তার মনে পড়ে গেল। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে এগিয়ে গেল। দু-একটা বাড়ি ছাড়ার পর গুরদয়াল সিং-এর চেয়েও সুন্দর একটা বাড়ি তার নজরে পড়ল। দেখল বাড়ির দরজায় তালা ঝুলছে। গলি থেকে একটা বড় মতো ইট তুলে তালাতে দু-চার ঘা দিতেই তালাটা খুলে গেল।

বাড়িটা খুব বড় নয়, কিন্তু তার কোঠাঘরের তুলনায় স্বর্গ। বোধ হয় একদিন কোন শৌখিন কেরানী এই বাড়িতে থাকত, কারণ একটা ছোট্ট রেডিও এবং গ্রামোফোনও পড়েছিল। একটা ট্রাঙ্ক খোলা অবস্থায় পড়েছিল, কিন্তু তাতে কোন গয়না-গাটি বা কাপড়-চোপড় ছিল না। মারদাঙ্গা শুরু হওয়ার আগেই খুব সম্ভব বাড়ির মালিক শরণার্থী ক্যাম্পে অথবা পাকিস্তানে চলে গিয়ে থাকবে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ভার অনেক বেশি জিনিসপত্র ফেলে গেছে তারা। এত জিনিসপত্র দেখে সর্দার লহনা সিং তার কাঁধের কলারটা উলটে দিয়ে বকরির মতো উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বেছে বেছে সে একদিকে গুছিয়ে রাখল। আর যেগুলো অনাবশ্যক তা সে তুলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে যে তালাটা এনেছিল তা দরজায় লাগাল। দরজায় তালা লাগিয়ে গুরদয়াল সিংকে একটু নজর রাখতে বলে নিজের আসবাবপত্র আনতে চলে গেল। বাড়ির ওপর তার দখলটা সে সম্পূর্ণভাবে কায়েম করতে চায়।

বাড়িতে পৌঁছে তার খেয়াল হল আসবাবপত্র সে কিসে করে নিয়ে যাবে ? এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যে টাঙ্গা কোথায় পাবে ? উঠোন থেকে সাইকেল নিয়ে সে তার বহুদিনের বন্ধু রামধন গোয়ালার কাছে গেল। তার গোরুগাড়ি করেই সে এক সময় খড়-কাটার মেশিন নিয়ে আসে। অনেক সাধ্যি-সাধনা করে, দ্বিগুণ ভাড়ার লোভ দেখিয়ে সে ওর গাড়িটা নিয়ে এল।

সমস্ত জিনিসপত্র গাড়িতে বোঝাই করে সে যখন রওনা হতে গেল, তখন সর্দারনীও তার সঙ্গে যেতে চাইল। লহনা সিং তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ক্ষান্ত করল। বলল, যখন অন্য সর্দাররা সর্দারনীদের আনবে তখন সে তাকেও নিয়ে যাবে। হতে পারে সে হাজার সর্দারনীর সমান, কিন্তু সে তো নারী। দাঙ্গা-হাঙ্গামায় মেয়েরাই বেশি লাঞ্ছিতা হয়। তাছাড়া, বাড়ির সামনের চত্বরের ওপরেও নজর রাখতে হবে। অসংখ্য শরণার্থী আসছে, ঘর খোলা দেখে কেউ আবার আয়েশ করে বসে না যায়।

সর্দারনী সর্দারজীর যুক্তিতে রাজী হয়ে গেল। সে সর্দারজীকে

জিনিসপত্রের সঙ্গে খড় কাটার মেশিন নিয়ে যেতে বলল। নতুন বাড়িতে মেশিন বসিয়ে দিলে এ বাড়ির মালিক যে তারা, তাতে আর কোন সন্দেহ থাকবে না। সবাই বুঝতে পারবে এ বাড়ির মালিক খড় কাটার মেশিনওয়ালা সর্দার লহনা সিং।

সর্দারনীর এই প্রস্তাব সর্দারজীর মনে ধরল।

গোরুর গাড়িতে আর একতিল জায়গাও ছিল না। কিন্তু সে জিনিসপত্রের মাথায় খড়-কাটা মেশিনটা অনেক কষ্টে তুলে দিল। মেশিনটা যাতে পড়ে না যায়, সে জন্যে দড়ি দিয়ে কষে বেঁধে দিল। নতুন বাড়িতে পোঁছে সর্দার লহনা সিং দেখল সর্দার গুরদয়াল সিং-এর সর্দারনী এবং বাচ্চা-কাচ্চারা তাদের নতুন বাড়িতে এসে গিয়েছে। ওদের দেখে ওর মনে হল সে ভুল করেছে। তার সর্দারনীকে এখনই নিয়ে আসা উচিত। রোগা-পটকা গুরদয়াল সিং যদি সর্দারনীকে নিয়ে আসতে পারে সে কেন তার সর্দারনীকে আনতে পারবে না।

দেউড়িতে যেখানে বড় তালা ঝুলছে সমস্ত জিনিসপত্র সেখানে নামিয়ে রেখে সে গুরদয়াল সিংকে বলল, "ভাই, একটু দেখো, সর্দারনীকে নিয়ে আসি। তোমার স্ত্রী একজন সঙ্গী পেয়ে যাবে।"

যে গোরুগাড়ি করে এসেছিল, তাতে চড়েই আবার সে রওনা হল। বাড়িতে পোঁছেই সে সর্দারনী আর বাচ্চাদের ঝটপট তৈরি হয়ে নিতে বলল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর সর্দার লহনা সিং যখন তার সর্দারনী আর কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ইসলামাবাদ পোঁছল, দেখল তার বাড়ির তালা ভাঙা। দেউড়ির সামনে যে জিনিসপত্র রেখে গিয়েছিল, সব উধাও। শুধু খড়-কাটা মেশিনটা পড়ে আছে। হতচকিত হয়ে সে গুরদয়াল সিংকে চীৎকার করে ডাকল। কিন্তু দেখল সে বাড়িও অন্য একজন সর্দারের দখলে। জানতে পারল যে, গুরদয়াল সিং অন্য এক গলিতে আরও ভালো একটা বাড়ি দেখে উঠে গিয়েছে। সর্দার লহনা সিং কৃপাণ বের করে বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল চোর তার কী কী জিনিস নিয়ে গেছে।

দেউড়িতে পা দিতেই লম্বা-তাগড়া দুজন শিখ এগিয়ে এসে তার পথরোধ করে দাঁড়াল। তারপর তারা গোরুগাড়িতে-বসা তার স্ত্রী এবং

বাচ্চাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, "এ বাড়ি শরণার্থীদের জন্যে নয়। এখানে থানা-অফিসার বলবন্ত সিং থাকেন।" থানা-অফিসারের নাম শুনতেই লহনা সিং-এর কৃপাণ খাপে ঢুকে গেল, পাগড়ি ঢিলে হয়ে গেল তার।

"হুজুর, এ বাড়িতে আমি নিজে তালা লাগিয়েছিলাম। আমার সব জিনিসপত্র……"

"যা, এখান থেকে বের হয়ে যা। আদালতে গিয়ে দাবি করগে। অন্যের জিনিসকে নিজের বলে দাবি করছিস।"

সর্দার লহনা সিংকে তারা দেউড়ি থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিল। ঠিক সেই সময় লহনা সিং-এর চোখ খড় কাটা মেশিনের ওপর পড়ল। পড়তেই সে বলল, "দেখুন স্যার এই যে আমার খড় কাটার মেশিন এখানে রয়েছে। যে কোন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করুন, সবাই আমাকে জানে।"

হৈ চৈ শুনে 'নতুন' বাড়িগুলো থেকে যে সর্দাররা বেরিয়ে এল, তাদের একজনও লহনা সিং-এর পরিচিত নয়।

"ওঃ, কেন বলছ না যে খড়-কাটা মেশিনটা তোমার চাই," লহনা সিংকে ধাক্কা দিয়ে একজন শিখ বলল। তারপর সে তার এক সঙ্গীকে বলল, "এই কর্তার সিং, মেশিনটা রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দে। এরা গরিব শরণার্থী। আমরা শালার এই মেশিন নিয়ে কী করব?"

দুজনে মেশিন তুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল।

ঘণ্টা দু-আড়াই ধরে অযথা হয়রানির পর রাত্রি যখন নেমে এসেছে, সর্দার লহনা সিং আবার তার পুরনো বাসার দিকে রওনা হল। তার স্ত্রী এবং বাচ্চা-কাচ্চারা তার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে চলেছে। খড় কাটার মেশিনটি গোরুর-গাড়ির ওপর।

দর্শক

অতীত

দর্শক উনিশ শ' বত্রিশ সালে হিমাচল প্রদেশের উনা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের নাম বাথু। খুবই পশ্চাদপদ গ্রাম বাথু। অধিকাংশ জমির মালিক রাজপুতেরা। অত্যাচার এবং শোষণ এখানকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দারিদ্র্যতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়। ম্যাট্রিক পাশ করার পর পড়াশোনা ত্যাগ করে চাকুরীর খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। প্রাইভেটে তিনি ইণ্টার পাশ করেন। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালে উর্দু 'মিলাপে' তাঁর প্রথম গল্প 'খুদা সে বেহতর হ্যায় ইনসান' প্রকাশিত হয়। ছোট গল্পকার হিসেবে তিনি বিশেষভাবে সমাদৃত। যে নির্যাতিত শ্রেণী থেকে তিনি উঠে এসেছেন সেই শ্রেণী, সচেতনভাবে তাঁর গল্পে বিচরণ করেছে। 'ভটকা হুয়া মুসাফির' তাঁর একমাত্র উপন্যাস। গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'উপহার', 'তেল কা কনস্তার', 'কংকাল', 'পতিতা'।

বাড়ির পেছন দিকের যে প্রাচীর তা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর প্রাচীরের ওপর বসানো কাচের টুকরোগুলো ঝকমক করছে। বাড়ির মালিক ফিরোজ খাঁ। ফিরোজ খাঁ দেখতে সাধারণ, হৃষ্টপুষ্ট, আধ-বুড়ো। পেন্সনপ্রাপ্ত সৈনিক। নিজের এবং আশপাশের গ্রামে সে 'মোল্লা' নামে পরিচিত। একটি মেয়ে আছে, মেয়েটির বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এখন তার জীবনে কাজ কেবল ছুটি, লালা মিলখিরামের দোকানে বসে পাশা খেলা আর কোরান-শরীফ পড়া।

ফিরোজ খাঁর বাড়ির গায়েই রলা খাঁর বাড়ি। দেখতে লম্বা, ছাঁটা সাদা দাড়ি। বৃদ্ধ। খুবই শরীফ আদমি। মিষ্টি, হাসি-খুশী। ঘোড়াতে মাল বওয়ার কাজ করে।

রলা খাঁর বাড়ির সামনেই দু' ভাই—বরকত আলী আর এনায়েত খাঁ থাকে। বরকত আলী কাশির রোগী। এনায়েত খাঁ খেতমজুর।

রলা খাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে একটু বাঁয়ে এগিয়ে গেলে উটওয়ালা নিক্কা খাঁর বাড়ি। আর নিক্কা খাঁর বাড়ি ছাড়িয়ে একটু ওপরের দিকে

উঠে গেলে সাহাবদিনের বাড়ি। সাহাবদিন পাঠান। দীর্ঘদেহী। খুব ফর্সা আর বলিষ্ঠ। লাল-লাল চোখ। নীচের দিকে ঝুলে-পড়া লম্বা-গোঁফ। ওরা খুব পর্দানশীন, স্ত্রীও দেখতে খুবই সুন্দরী। এত সুন্দরী আমি জীবনে দেখিনি।

এই বাড়িগুলোর পরেই বিরাট এক খোলা-মেলা চত্বর। চত্বরের চারদিকে ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোয় আর চত্বরে গোরু-মোষ বাঁধা থাকে। ...এই চত্বরেই মুরার সঙ্গে আমার পরিচয়।

তখন আমার বয়স বড় জোর বছর বারো। প্রায় সময়েই অসুস্থ থাকতাম। গ্রহ-শান্তি করার জন্যে পণ্ডিতমশায় উপদেশ দেন, সারা বছর ধরে প্রতি মঙ্গলবার একুশটি গোরুকে নিজের হাতে করে ঘাস-পাতা খাওয়াতে হবে।

গ্রামে খুব বেশি হলে দুশটি পরিবারের বাস। এর মধ্যে দেড়শ পরিবারই ব্রাহ্মণ, রাজপুত আর বেনে। আর এই দেড়শ পরিবারে খুব বেশি হলে পাঁচটার বেশি গোরু ছিল না। কিন্তু মুসলিম পরিবার-গুলোতে গোটা বিশেকের মতো গোরু ছিল।

গোরুকে ঘাস-পাতা খাওয়ানোর জন্যে আমি এখানে আসতাম।

গোরুর লম্বা-লম্বা শিংগুলোকে আমি ভীষণ ভয় পেতাম। ভয়ে সিঁটিয়ে যেতাম। এমন সময়, খুব বেশি হলে বছর দশেক বয়েসের ডল-পুতুলের মতো দেখতে একটা মেয়ে এসে বলল, "এই যে বীর-পুরুষ, আমাকে দাও, খাইয়ে দিচ্ছি।"

"না, তোমাকে দেব না। মা নিজের হাতে খাইয়ে দিতে বলেছে।"

"বেশ, আমি সামনে দাঁড়াচ্ছি, তুমি খাইয়ে দাও।"

আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার ভয় করে না।" ডল পুতুলের মতো মেয়েটি মাথা নাড়িয়ে জানাল, না। ঘাস-পাতা খাও-য়ানো হয়ে গেলে আমি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি রলা খাঁর মেয়ে না?"

ও আবার মাথা নাড়িয়ে জানাল, "হ্যাঁ"।

বললাম, "আমি প্রতি মঙ্গলবার এসে গোরুকে খাইয়ে যাব।"

ছোট্ট সুন্দর মাথাটি দুলে উঠল। চোখ আর মাথা দুলিয়ে নীরব

ভাষায় কথা বলা নুরার বৈশিষ্ট্য। ওর মাথা-দোলানোর মধ্যে একটা অদ্ভুত সুন্দর ব্যঞ্জনা ছিল।

বর্ষা এলে, গ্রামের চারদিক ঘেরা পাহাড় বহুদূর পর্যন্ত সবুজ ঘাসে ছেয়ে যেত। হাওয়ায় ঘাসগুলো যখন দুলত, মনে হত যেন একটা সবুজ সমুদ্রে ঢেউ বয়ে চলেছে। এই সময় লাল ভেলভেট রঙের বীরবহুটি পোকায় চারদিক ছেয়ে যেত। নদী-নালা টইটম্বুর হয়ে উঠত। আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাতে সাঁতার কাটত।

বর্ষার সময় স্কুল বন্ধ থাকত। বন্ধ থাকত বলে সেই সময় আমি বনে জঙ্গলে মোষ চরিয়ে বেড়াতাম।....সেই বছর আমি আর নুরা একসঙ্গে মোষ চরিয়েছি।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। আমি আর নুরা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলাম। আমরা যেন আপন ভাই-বোনের মতো হয়ে উঠলাম। নুরা দেওয়ালী-দশহরা-হোলির উৎসবে আমার সঙ্গে মজে যেত, আর আমি নুরার সঙ্গে ঈদ-মহরমে জুটে যেতাম।

আমাদের দু পরিবারও ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। রলা খাঁ নুরার বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আমার বাবার সঙ্গে শলা পরামর্শ করত। আর মা আমার পড়াশোনা নিয়ে নুরার সঙ্গে আলোচনা করত।

'বীরপুরুষ বি.এ.-তে ফাস্ট' হলে আমি পীরের দরগায় শিরনি দেব,' বলতে বলতে নুরার সারা মুখ-চোখ আনন্দ আর মমতায় ভরে উঠত।

ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িকতার যে আগুন উসকিয়ে দিয়েছিল, তা অনুকূল হাওয়ায় ফুলে উঠল। সারা দেশ দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল। হাজার হাজার বছর ধরে যে মানবিক গুণগুলো অর্জিত হয়েছিল সেসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মানুষ শয়তানে পরিণত হল। শয়তানের চেয়েও ক্রূর হয়ে উঠল।...লুটতরাজ, হত্যা, বলাৎকার—এমন সব ঘৃণিত কাজ করল, যে কাজ দেখে শয়তানও লজ্জায় মুখ ঢাকল। খুব আশ্চর্যের কথা, সমস্ত অপকাজই করা হয়েছে ঈশ্বর অথবা আল্লার

নামে। আর এই লুটতরাজ-হত্যা-বলাৎকারে নেতৃত্ব দিচ্ছিল একদল গোঁড়া ধর্মান্ধ মানুষ।

আমাদের এলাকার আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলে, গ্রামের তরুণরা 'ললারি' মহল্লা রক্ষার জন্যে দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। তবুও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক হয়ে উঠল—আশপাশের গ্রামগুলো থেকে হুমকি-দেওয়া চিঠি আসতে লাগল। হুমকি ছিল,—সংখ্যালঘুদের সঙ্গে তারা যা করেছে, তাই যেন করা হয়। না করলে আমাদের গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাঁক করে দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতের মিটিং বসল। তাতে ঠিক হল, সংখ্যালঘুদের আমরা আমাদের বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। লুকিয়ে রেখে রটিয়ে দেব, ওরা পালিয়ে গিয়েছে।

নুরাদের পরিবার আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। রলা খাঁ, নুরা এবং তার মা সারাদিন একটা কুঠরিতে বন্ধ থাকত। ওদের মুখের ওপর আতঙ্ক আর মৃত্যুর একটা গাভীর উদাসীন ছাপ নেমে এসেছিল। ওদের হাসি-খুশী রাখার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেত। যদিও বা কদাচিৎ ওরা হাসত, কিন্তু সেই হাসি দেখে মনে হত যেন ওরা কাঁদছে।

ওদের অবস্থা দেখে আমার বুক ভেঙে যেত। ধর্মের ওপর থেকে আমার আস্থা উঠে গিয়েছিল।···এ কী ধরনের ধর্ম, যে ধর্ম জীবনের বদলে মৃত্যু ডেকে আনে;—মানুষকে মানুষের ওপর নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উত্তেজিত করে।···এই কথাটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছিল না। এক ধর্মের মানুষ যদি অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে কোথাও কোন খারাপ ব্যবহার করে, তাতে এমন কী এসে যায়, যার জন্যে হাজার হাজার মাইল দূরে মারামারি কাটাকাটি হবে! এ ঘটনার সঙ্গে তো তাদের কোন সম্পর্কই নেই।....জানি না ইতিমধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটে গেল যে পুরুষানুক্রমে যারা এই দেশে বাস করছে, হঠাৎ সেই দেশ তাদের কাছে পর হয়ে গেল। আর কেউ কেউবা তাদের এই দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছে।

অনেক মারদাঙ্গা অনেক আগুন জ্বলার পর সাম্প্রদায়িকতার আগুন কিছুটা নিভে গেল। সারা পাঞ্জাবের কথা বলতে পারব না, তবে আমাদের গ্রামে কোন ক্ষতি হয়নি,—না কোন আর্থিক হানি হয়েছে, না কোন দৈহিক। গ্রামে বিপত্তি যে কিছুই হয়নি, তা নয়। গ্রামের অবস্থা খুব সঙ্গীন ভেবে সাহাবদিন অন্য কোথাও চলে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর তার কোন খবর নেই।

একটা হালকা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা আমেজ পড়ছিল। ঠাণ্ডা এই আমেজে ভোরবেলা সবুজে ভরপুর খেতের রাস্তা ধরে যেতে কী ভালোই না লাগে! ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সবুজ সবুজ গমের চারার ওপর মুক্তোর মতো টলমল' করছিল শিশিরবিন্দু। মনে হচ্ছিল, আকাশে ডানা মেলে উড়ে যাই।

স্কুলে যাওয়ার জন্যে, তৈরি হচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল, ললারিদের পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে মিলিটারি এসেছে। হৃৎপিণ্ড ধকধক করতে লাগল। স্কুলের ব্যাগ ফেলে দিয়ে আমি ললারিদের পাড়ার দিকে ছুট দিলাম।

পৌঁছে দেখলাম, সেখানে বহু লোক জমায়েত হয়েছে। পাড়ায় ঢোকার মুখটায় একজন বালুচ সৈন্য রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিছুটা দূরে পঞ্চায়েত-প্রধান এবং আমার বাবা একজন মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে আছেন। অফিসার বলছিলেন, "এখান থেকে চিঠি গিয়েছে বলেই আমরা এসেছি। কাউকেই আমরা জোর করে নিয়ে যাব না। যারা থাকতে চায় থাকতে পারে। আপনিই সবাইকে জিজ্ঞেস করে জানুন।"

বাবা এবং পঞ্চায়েত-প্রধানের সঙ্গে আমিও পাড়ার মধ্যে ঢুকলাম। আমি সোজা রলা খাঁর বাড়িতে গেলাম। ঘরের এক কোণে বসে নুরা কাঁদছিল। রলা খাঁ এবং তাঁর স্ত্রী আসবাবপত্র বাঁধাছাদা করছিল। তাদের মুখে চোখে বিমর্ষতার মেঘ।

"আব্বাজী, আপনি এখানে থাকতে পারেন। ক্যাপ্টেন সাহেব বলছিলেন, তাঁরা কাউকে জোর-জবরদস্তি করে নিয়ে যাবেন না। বাবা আর প্রধান আপনাকে জিজ্ঞেস করতে আসছেন।" আমি আনন্দে উল্লসিত হয়ে বললাম।

মন চাইছিল বলে দিই, নুরাকে আমি বিয়ে করব। কিন্তু সেই সময় গ্রামের কট্টর সমাজব্যবস্থায় এ কথা বলার অর্থ নিজেকে চরিত্র-হীন বলে প্রতিপন্ন করা। তাই আমি চুপ করে রইলাম। ইতিমধ্যে বাবা এবং গ্রাম-প্রধান সেখানে এসে হাজির হল। তাদের চেহারায় কেমন একটা ক্লান্তির ভাব।…সবাই প্রায় একই উত্তর দিয়েছিল।

সন্ধ্যার প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে ওরা সবাই পাড়া থেকে বেরুল। কাফেলাটি ধীরে ধীরে স্কুলের পিপুলগাছের দিকে এগুল। সেখানেই ট্রাকটা দাঁড়িয়েছিল। ওরা পোঁছতেই ট্রাক ছেড়ে দিল। দৃশ্যটা খুবই করুণ। যেন কন্যাবিদায় হচ্ছে।…যারা যাচ্ছিল তারা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। আর যাদের ছেড়ে যাচ্ছিল তাদেরও চোখে জল। এমন কি, দু-চার জন মিলিটারির চোখও জলে ভরে উঠেছিল।

ট্রাক ছাড়ার আগে নুরা একবার আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি বললাম, "সাবধানে যেও।" ও মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল।

"পোঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে খবর দিও।" ও আবার মাথাটা কাত করল।

"বিয়ের খবর নিশ্চয়ই পাঠাবে। যেমন করে হোক আমি হাজির হব।" ও লজ্জা পেয়ে গেল। "বীরপুরুষ, পরীক্ষার রেজাল্টের খবর কিন্তু নিশ্চয়ই জানাবে। পীরের দরগায় তোমার ভালো রেজাল্টের জন্যে মানত করেছিলাম।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ও কান্নাভরা কণ্ঠে কথাগুলো বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।…কিছুক্ষণ পরেই আমাদের হৃদয়ের ওপর দিয়ে ট্রাকের চাকা দলাই-মলাই করতে করতে ছুটে চলে গেল।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল, আমি উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছি; কিন্তু নুরার কোন খবরই পেলাম না।

সেদিন ছিল বসন্ত ঋতুর এক সুন্দর শীতল রাত্রি। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। গায়ে কম্বল চাপিয়ে ঘুমনোর চেষ্টা করছি। হঠাৎ পাশের ঘরে বাবার গলা শুনতে পেলাম, "কি, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?"

"না, ঘুমোই নি।" মা উত্তর দিল।

"ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে?"

"আজ তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়েছে। বলছিল, শরীর ভালো নেই।"

ওদের কথাবার্তা শোনার জন্যে আমার কান খাড়া হয়ে উঠল।

"কী ব্যাপার ? তুমি ওর কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ?" মা জিজ্ঞেস করল।

"ওকে কিছু বোলো না।" বাবার গলা ফিসফিসানির মতো নীচু হয়ে গেল।—"রলা খাঁর চিঠি এসেছে। নুরা পাকিস্তানে পৌঁছতে পারেনি।"

সত্যি ! আমার হৃৎপিণ্ডে হঠাৎ কে যেন ছোরা বিঁধিয়ে দিল।··· নুরার তাহলে কি হয়েছে ?·· আমার সম্পূর্ণ চেতনাশক্তি কানের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে গেল।

মা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছিল ?"

"খুলে কিছু লেখেনি....মেয়েটি তো দেখতে সুন্দরী ছিল।"

"কিন্তু ওদের সঙ্গে তো পাকিস্তানী মিলিটারি ছিল।"

"তাতে এমন কি ফারাক আছে।... হে ভগবান, দয়া করো।" বাবার কণ্ঠ থেকে এক গভীর বেদনা ঝরে পড়ল।

আমি যেন পাথরের মতো জড় পদার্থে পরিণত হয়ে গেলাম।··· বিয়ের খবর নিশ্চয়ই দেবে। আমি যেমন করে পারি পৌঁছে যাব।··· বীরপুরুষ পরীক্ষার রেজাল্টের খবর দিও। পীরের দরগায় তোমার রেজাল্টের জন্যে মানত করেছি।···এখন কার বিয়ে হবে ?···কে পীরের দরগায় শিরনি দেবে ?···

"চাচাজী, আপনি গ্রামে এলে এই উজার চত্বরে গিয়ে দুদণ্ড বসেন, তাই, বাবা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।"

আমি চোখ তুলে তাকালাম। দেউড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আমার খুড়তুতো ভাই-এর ছেলে মিটমিট করে হাসছে। এই উজার চত্বরের সঙ্গে জড়িত অতীতের সমস্ত ঘটনাগুলো আজও আমার চোখের সামনে ভাসছে।

"যে অতীত অতীত হয়ে গিয়েছে সেই অতীত যেন আর কখনও বর্তমান বা ভবিষ্যৎ না হয়—কারো জন্যেই যেন না হয়।" বলতে বলতে আমি ওর পেছনে পেছনে এগিয়ে চলছিলাম।

মহীপ সিং

জল এবং পুল

মহীপ সিং—পাঞ্জাবের অধিবাসী। হিন্দী এবং পাঞ্জাবী—দু' ভাষাতেই তিনি দক্ষ। এবং দু' ভাষাতেই তিনি সমানে লিখে চলেছেন। কিছুদিন জাপানের কানসাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে অধ্যাপনা করেন। বর্তমানে দিল্লীতে আছেন। বৃত্তি অধ্যাপনা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। ইতিমধ্যে একটি উপন্যাস এবং পাঁচটি গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। হিন্দী সাহিত্যপত্র 'সংচেতনা'-র তিনি সম্পাদক। একাধিক গ্রন্থেরও তিনি সম্পাদনা করেছেন। গল্পকার হিসেবে তিনি নতুনত্বের দাবি রাখেন।

গাড়ি লাহোর ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন আর একবার ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল। আমরা এখন যে দিকে চলেছি, আজ থেকে চোদ্দ বছর আগে সে-জায়গা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই আগুনে হাজার হাজার মানুষ জ্বলে মরেছে, আর যারা বেঁচে গিয়েছে তাদের শরীরে এখনও আগুনের চিহ্ন রয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল, আমাদের গাড়ি যেন কোন দীর্ঘ অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে ছুটে চলেছে। আর আমরা যেন আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব এই অন্ধকারের হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চল বসে আছি।

গাড়িতে আমরা সবশুদ্ধ প্রায় তিনশ যাত্রী ছিলাম। মহিলা এবং শিশুদের সংখ্যাই ছিল বেশি। লাহোরে আমরা সবাই গুরুদ্বার দর্শন করেছি। সেখানে আমরা ভালোই অভ্যর্থনা পেয়েছিলাম, জানতাম পঞ্জা-সাহেবেও আমাদের কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই। তবু বলা যায় না, কখন মানুষের ভেতরের পশুটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠে সব-কিছুকে তছনছ করে দিয়ে যায়।

নানারকম কথা ভাবতে ভাবতে মার দিকে তাকালাম, দেখলাম মা জানলার ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে হাতের চেটোর ওপর মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। খেতের ফসল কাটা হয়ে গিয়েছে।

বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত সমতল মাঠ দেখা যাচ্ছে। মনে হল, এই সমতল মাঠ মার চোখের ভেতর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে অন্তরের অন্তস্থলে ঢুকে মনটাকে ছেয়ে ফেলেছে। আমি চোখ ফিরিয়ে গাড়ির অন্যান্য যাত্রীদেরও দেখতে লাগলাম। তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কেমন একটা উদাস-উদাসভাব। বুঝতে পারছিলাম, সবাই হঠাৎ কেন এমন উদাস হয়ে গেছে।

মার মগ্নতা ভেঙে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "তোমার এই পথ নিশ্চয়ই ভালোভাবে মনে আছে? নিশ্চয়ই তুমি বহুবার এদিক দিয়ে যাতায়াত করেছ?"

আমার দিকে তাকিয়ে মা মুচকি হাসল। সবকিছু হারিয়েও মার মুখে এই মিষ্টি হাসিটুকু রয়ে গেছে। মা আমাকে বলল, "এই পথের প্রতিটি স্টেশন আমার মনে আছে। কিন্তু কেন জানি না, আজকে এই পথটা কেমন যেন অচেনা-অচেনা মনে হচ্ছে। চোদ্দ বছর পর এদিক দিয়ে যাচ্ছি। আগেও এভাবে যেতাম। লাহোর পার হওয়ার পর থেকেই এক অদ্ভুত ধরনের উত্তেজনা আমার সমস্ত দেহমনে ছড়িয়ে পড়ত। আমাদের গ্রাম সরাই যতই কাছে এগিয়ে আসত, সেখানকার প্রতিটি মানুষের মুখ এক-এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠত। স্টেশনে কত লোকই না অভ্যর্থনা করতে আসত।" ..

চোদ্দ বছর আগের মধুর স্মৃতি চোখকে জলে ভরিয়ে তুলল। বাবা উত্তরপ্রদেশে গিয়েছিলেন রুজি-রোজগারের জন্যে। আমাদের সব ভাই-বোনের জন্ম হয়েছে পাঞ্জাবের বাইরে। আমার বেশ মনে আছে, বছরে বাবা এক-আধবার পাঞ্জাবে যেতেন, কিন্তু মা বছরে অন্তত দু-তিনবার যেতেনই। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে বয়সে যে সবচেয়ে ছোট সেই মার সঙ্গে যেত। যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে দেখেছি, আমার ছোট বোনই মার সঙ্গে যাতায়াত করত। সেই সময় সবে পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত হওয়ার খবর ঘোষিত হয়েছে, আর পাঞ্জাবের পাঁচটি দরিয়ার জলই উন্মত্ততার এক সমুদ্রে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মা পাঞ্জাবে যাবে বলেই স্থির করল। সবাই তাকে এমনভাবে নিষেধ করল, যেন সে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। সত্যিই তো মা জেনে-বুঝে আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। বাবা এবং

আমরা সবাই ভালো করে জানতাম, মাকে তার পথ থেকে ফিরিয়ে আনা অত সহজ ব্যাপার নয়। হেসে মা সবার কথা উড়িয়ে দিল। এবং সত্যিসত্যি বিশ-বাইশ দিনের মধ্যে মা পাঞ্জাব থেকে ফিরে এল। ফেরার সময়ে গ্রামের বাড়ির অনেক আসবাবপত্র বুক করে এসেছে। সঙ্গে করে শুধু এনেছে পুরনো একটা চরখা এবং ঘোল করার মথনি।

আবার সারা পাঞ্জাব জুড়ে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ঘরের পর ঘর, গ্রামের পর গ্রাম, শহরের পর শহর সেই আগুনে ভস্মীভূত হতে লাগল। একদিন আগুন নিভলে দেখা গেল, লাহোর আর অমৃতসরের মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ জমি, সেই জমি কখন ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, তৈরী হয়েছে এক গভীর খাদ। এই খাদের দুপারে মানুষ জন ছিটকে পড়েছে। আমরা ভুলে গিয়েছিলাম এই গভীর খাদের অন্য পারেই হচ্ছে আমাদের গ্রাম। পাকা যে সড়ক চলে গিয়েছে তার পরেই রয়েছে একটা খাল, আর তার পাশেই জেহলাম নদী। চপলা মেয়ের মতো দুলতে দুলতে বয়ে চলেছে জেহলাম।

আজ আমি মার সঙ্গে সেই খালের ওপর সরকারের তৈরি পুলের ওপর দিয়ে চলেছি। চলেছি সেই দিকে—গতকালও যে জায়গা ছিল আমাদের একান্ত আপন, কিন্তু আজ তা পর হয়ে গিয়েছে।

একটা বইয়ের পাতা আমি উলটে চলেছিলাম, এমন সময় মা আমাকে জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি কি সরাইয়ে থামবে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করে বললাম, "হ্যাঁ, মনে হচ্ছে থামবে। তবে রাত্তির দেড়টা-দুটোর আগে নয়। আমরা হয়তো গভীর ঘুমে ডুবে থাকব। স্টেশন এলে, জানতেও পারব না। সরাইয়ে আমাদের আর আছেই বা কী!"

মার চোখে-মুখে একটা ক্রোধের আভা খেলে গেল। বলল, "আগেই বা তোমাদের ওখানে কী ছিল?"

বুঝতে পারলাম, আমার কথায় মা খুব আঘাত পেয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে আমি মাথা গুঁজে বইয়ের মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট রাখলাম।

ক্রমে অন্ধকার ঘন হয়ে আসতে লাগল। একটা পুঁটলি খুলে মা

খাওয়ার জন্যে কী যেন সব বের করল। দূর সম্পর্কের এক মামাও আমাদের সঙ্গে ছিল। তিনজনে খেয়েদেয়ে শোয়ার বন্দোবস্ত করলাম। মামা তো মিনিট দশেকের মধ্যেই নাক ডাকতে শুরু করে দিল। আমিও শুয়ে পড়লাম। মা কিন্তু সেই একই ভাবে কনুইয়ে ভর দিয়ে বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে আমি চোখ মেলে তাকালাম। দেখলাম, মা তেমনি ঠায় বসে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে দশটা বেজে গেছে। বললাম, "মা, তুমিও শুয়ে পড়ো।"

'আচ্ছা' বলে মা আধ-শোয়া অবস্থায় বসে রইল। আমার তন্দ্রা এসেছিল, তন্দ্রায় একটা স্বপ্ন দেখলাম। সাধারণত স্বপ্নের কথা আমার মনে থাকে না। কিন্তু তন্দ্রার মধ্যে যে স্বপ্ন আমি সেদিন দেখলাম, তাতে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। সেটা ছিল খুব সম্ভব কোন অস্পষ্ট স্বপ্নের বিহ্বলতা। বহু বহু বছর আগের কোন তরল পদার্থ যেন আমার চারদিকে, মনে হচ্ছিল, সেই লাল টকটকে পদার্থের ওপর আমার পা থপ থপ করে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে আমি উঠে বসলাম। মা আমাকে ঝুঁকে দেখছিল। এক অদ্ভুত ধরনের আতঙ্ক আর উত্তেজনায় মার হাত থরথর করে কাঁপছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কী হয়েছে?"

"ছাখ তো বাইরে এত হৈ-হল্লা কিসের?"

আমি বাইরে মাথা বাড়িয়ে ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করলাম। আমাদের ট্রেন ছোট্ট একটা স্টেশনে এসে থেমেছে। প্লাটফরমের ওপর ল্যাম্প পোস্টের অস্পষ্ট আলো। বিচিত্র একটা হট্টগোল হচ্ছে। আমার প্রতিটি রোমকূপ কাঁটা দিয়ে উঠল। চোদ্দ বছর আগেকার শোনা অনেক ঘটনা মুহূর্তে বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল। যেখানে সেখানে গাড়ি থামিয়ে দাঙ্গাবাজরা মানুষকে মুলো-গাজরের মতো কেটে ফেলেছে। মামারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমার কাঁধ ধরে সে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

"আরে, কী হয়েছে?"

ঠিক এই সময় একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। ভিড়ের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে বলছে, "এই গাড়িতে সরাইয়ের কেউ আছে?"

আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন স্টেশনের কথা বলছে?"

মা বলল, "সরাই—আমাদের গ্রামের স্টেশন।"

বাইরে, আবার কে যেন চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "আরে ভাই, এই গাড়িতে সরাই-এর কেউ আছে?"

আমি মার দিকে তাকালাম। মার চোখে মুখে এক দৃঢ় সাহসের ভাব দেখলাম। মা বলল, "জিজ্ঞেস কর, ওরা কেন সরাইয়ের লোক খুঁজছে।"

জানলা দিয়ে আমি মুখ বাড়ালাম। দেখলাম, অনেক লোক ছোটাছুটি করে চীৎকার করছে, "আরে, এ গাড়িতে সরাইয়ের কেউ আছ না কি?"

একজন লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, "কী ব্যাপার ভাই?"

"তোমাদের মধ্যে সরাইয়ের কেউ আছে না কি?" মা সামনে মুখ বাড়িয়ে বলল, "হাঁ, আমিই এই গ্রামের।"

লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনি সরাইয়ের?"

"আজ্ঞে, হাঁ।"

মার উত্তর শেষ হতে না হতেই সারা স্টেশন জুড়ে আরও হুলুস্থুল, হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো লোকগুলো আমাদের কামরার সামনে এসে ভিড় করল। তারপর সবাই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করতে লাগল :

"আপনি সরাইয়ের?..."

মাও জোর দিয়ে বলছে, "হাঁ, আমি এই গ্রামেরই।"

উপস্থিত জনসমুদ্রের মধ্যে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কে যেন ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রশ্ন ছুড়ল, "আপনি কোন বাড়ির?"

মা আমার দিকে তাকাল। বললাম, "আমার বাবার নাম সর্দার মুলা সিং। ইনি আমার মা।"

"তুমি মুলা সিং-এর ছেলে?" কয়েকজন একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "আপনি মুলা সিং-এর স্ত্রী...রবেল সিং-এর বৌদি? তোমরা সবাই কেমন আছ...?" জিজ্ঞেস করতে করতে অনেকগুলো হাত আমাদের দিকে এগিয়ে এল। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা কে কেমন আছে

জিজ্ঞেস করতে করতে ওরা আমার হাতে ছোট ছোট পুঁটলি দিতে লাগল। দেখে মনে হচ্ছিল পুঁটলিগুলোতে বাদাম আখরোট কিশমিশ এবং শুকনো মেওয়া বাঁধা রয়েছে। দেখতে দেখতে আমাদের কামরা ছোট ছোট পুঁটলিতে ভরে গেল।

আমি অবাক হয়ে এই কাণ্ডকারখানা দেখছিলাম। মা মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে জোড় হাতে প্রতি নমস্কার করছিল। আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে মার ঠোঁট দুটি ফুলের পাপড়ির মতো কাঁপছিল। গলা দিয়ে কোন স্বরই বের হচ্ছিল না। দেখে মনে হচ্ছিল, চোখ দুটো এই বুঝি জলে ভরে উঠবে।

গার্ড কাছেই দাঁড়িয়েছিল। সবুজ লণ্ঠন ওপরে উঠিয়ে কোটের পকেট থেকে হুইশিল বের করল। দেখলাম, তিন-চারজন তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে।

"আরে বাবু, আর দু-চার মিনিট দেরি করো না। দেখছ না এই ঠাকরুন আমাদের গ্রামের...।" গার্ডের যে হাতে লণ্ঠন-ধরা ছিল তা একজন ধরে নীচে নামিয়ে দিল।

"বৌ-ঠাকরুন, সর্দারজী কেমন আছে? তাকে কেন সঙ্গে করে আনলে না—সেও পঞ্জা-সাহেব দর্শন করে যেত।" বুড়োমতো একজন মুসলমান মাকে বলল।

দু হাত দিয়ে মা মাথার ঘোমটা আরও খানিকটা টেনে দিয়ে খুব ধীরে বলল, "সর্দারজী মারা গেছেন...।"

"কী... মুলা সিং মারা গিয়েছে? কী হয়েছিল? কী হয়েছিল?"

মা কোন জবাব দিল না। আমি বললাম, "উদরি হয়েছিল। যে দিন উদরি ফাটে, তার পরদিন মারা যায়।"

"আঃ, বড় ভালো মানুষ ছিল। খোদা যেন তাঁকে শান্তিতে বিশ্রাম করতে দেয়।" একজন আফশোস করে বলল। আর অন্যান্যরা কিছুক্ষণের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইল।

"বৌ-ঠাকরুন, তোমার ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?"

"বাহে গুরুর কৃপায় সবাই ভালো আছে।" মা খুব আস্তে বলল।

একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল, "আল্লা ওদের দীর্ঘায়ু করো।"

একজন বলল, "বৌ-ঠাকুরুন, তুমি ছেলে-মেয়ে নিয়ে এখানে এসে

থাক।" একসঙ্গে অনেকে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল।

"বৌ-ঠাকুরুন, তোমরা আবার এখানে ফিরে এস।...তোমরা আবার ফিরে এস।" প্লাটফরমে দাঁড়ানো মানুষগুলো সবাই একসঙ্গে অনুরোধ করতে লাগল।

"ফিরে এস..."

আমি শুনছিলাম, পেছনে মামা দাঁড়িয়েছিল। রাগে গরগর করে মামা বলল, "হুঁ বদমাশ কোথাকার! আগে তো মেরে ধরে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, আর এখন কিনা বলছ, ফিরে এস···লুচ্চা কোথাকার!"

প্লাটফরমে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা মামার কথা শুনতে পেল না। ওরা সমানে বলে চলেছে :

"বৌ-ঠাকুরুন, তোমার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে আবার এখানে চলে এস। বৌ-ঠাকুরুন বলো, কবে আসছ? নিজের গ্রামের কথা তো তুমি ভুলে যাওনি? বৌ-ঠাকুরুন, ফিরে এস।

মা তাদের কথার জবাব দিতে পারছিল না। মাথার কাপড় সামলাতে সামলাতে মা সমানে হাত জোড় করে চলেছিল।

প্লাটফরমের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গার্ড লণ্ঠন দেখিয়ে চলেছে আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজাচ্ছে। ইঞ্জিনও হুইসেল দিল। ঝিকঝিক করে গাড়ি চলতে লাগল। দলে দলে মানুষ আমাদের কামরার সঙ্গে সঙ্গে কদম কদম এগিয়ে চলল।

"আচ্ছা বৌ-ঠাকুরুন, সেলাম···খোকাবাবু সেলাম···রবেল সিংকে সেলাম দিও···সবাইকে আমাদের সেলাম জানিও···"

মা হাত জোড় করে ছিল, আর উচ্ছ্বাসে গদগদ হয়ে যেন কিছু বলতে চাইছিল। গাড়ির গতি ক্রমেই বাড়তে লাগল। আমরা দু-জনেই জানলা দিয়ে বাইরে মাথা বের করে হাত জোড় করে রইলাম। ভিড়ের সমস্ত মানুষ হাত ওপরের দিকে তুলে চীৎকার করে চলেছিল।

গাড়ি প্লাটফরম ছাড়ার পর আমি বার্থ থেকে পুটলিগুলো এক-দিকে সরিয়ে রেখে, কিছু বলার জন্যে মার দিকে তাকালাম।

দেখলাম, মার দুচোখ বেয়ে বেয়ে অবিরাম জল পড়ছে। ওড়না দিয়ে মা বারবার চোখের জল মুছে চলেছে। কিন্তু বন্যার তোড়ে

বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জল আর বাগ মানছিল না—শুধু বয়ে চলেছিল।

গাড়ি জেহলমের পুলের ওপর দিয়ে ছুটছিল। রাত্রির নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ভেঙে শুধু একটা ঘটাং ঘটাং শব্দ ভেসে আসছিল। জানলা দিয়ে ঝুঁকে আমি জেহলমের পুল দেখতে লাগলাম। শুনেছিলাম, জেহলমের পুল খুব মজবুত। পাথর আর ইস্পাত দিয়ে তৈরী জেহলমের পুল আমি এই অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার দৃষ্টি ক্রমেই আরও—আরও নীচের দিকে চলে যাচ্ছিল। সেখানে শুধু ধূসর অন্ধকার, কালো অন্ধকার। আমি জানতাম, এই ধূসর অন্ধকার আর কিছু নয়—জল,—কলকল করে বয়ে চলা জেহলমের স্বচ্ছ আর নির্মল জল। পাথর আর ইস্পাতে তৈরী এই পুলের নীচ দিয়ে জেহলমের স্বচ্ছ আর নির্মল জল অবিরাম বয়ে চলেছে।

য শ পা ল

খোদা আর ঈশ্বরের লড়াই

গভীর অন্ধকার। নিস্তব্ধ কার্ফু'র রাত্রি।

'গংগু কী গলি।' গলির দুদিকে সার সার দোতালা-তেতলা দালান। একটিও দালান-কোঠার বন্ধ দরজা-জানলা দিয়ে আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে না। বাড়িগুলোতে কোন জনপ্রাণী আছে বলেও মনে হচ্ছে না। বাজার থেকে যে ইলেকট্রিক লাইন গলিতে টেনে নেওয়া হয়েছিল, দিন-চার আগে বাজারে আগুন লাগার জন্যে সেই লাইন পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে। ফাঁকা জনপ্রাণীশূন্য বাড়িগুলো যে থমথমে ভাব সৃষ্টি করেছে, সেই থমথমে ভাব যেন গলির অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ এবং গভীর করে তুলেছে। গলির মুখেই—ডান এবং বাঁ দুদিকে প্রসারিত 'সৈদ মিট্‌ঠা' বাজারও কেমন একটা থমথম করছিল। জনপ্রাণীশূন্য উজাড় বাজারে শুধু ইলেকট্রিক লাইটগুলো টিমটিম করে জ্বলছে, আর এই টিমটিমে আলো যেন নিস্তব্ধতার যে বৈরাগ্য, সেই বৈরাগ্যকে ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে।

দেশ বিভাগের খবরে, লাহোরের গুলজার এবং গুজ্জান দু-মহল্লার দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তুমুল দাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। ফলে দু জায়গার মানুষই ভয়ে আতঙ্কে বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়েছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণায়

—হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সংহার মূর্তি ধারণ করে এবং উন্মাদ হয়ে ওঠে। এই উন্মত্ত পাগলপণ দাঙ্গা বন্ধ করার জন্যে সরকার কার্ফু জারি করে। কার্ফুর যে আতঙ্ক, সেই আতঙ্ক রাত্রির নিস্তব্ধতাকে আরও ভারাক্রান্ত এবং গভীরতর করে তুলেছে। শহরে যে আতঙ্ক এবং নিস্তব্ধতা ছেয়ে রয়েছে, তার ওপর মুষলধারে আছড়ে পড়ছে আগস্ট মাসের বৃষ্টি। বৃষ্টির ঝাপটায় হাওয়া এমনই কাবু হয়ে পড়েছে যে, একটুও হেলতে-দুলতে পারছে না।

'গংগু কী গলি'তে যে সব হিন্দুরা থাকত, তারা তেরোই আগস্ট বাড়িঘর ফেলে পালিয়েছে। শুধু মুলাঁই (মূলদেই জ্যোঠি) রয়ে গিয়েছে। বাজারের কাছে, গলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই গোটা কয়েক ছোট-মোট দোকান। এই ছোট দোকানগুলো হচ্ছে মুসলমানদের— নিয়ামত দর্জি, কলাইকার রসিদ, নজু পটুয়া, নেচেওয়ালা লতিফের। আগস্ট মাসের গোড়া থেকেই তারা 'গংগু কী গলি'-র এ মুখো হয়নি। শুধু গলির মুখে যে দোকান সেই দোকানের মালিক ললারি (যে কাপড় রঙ করে) ফজ্জে আর তার ছেলে নসরুই শুধু অনন্যোপায় হয়ে রয়ে গিয়েছে। চার হাত লম্বা আর দু হাত চওড়া এই দোকান ঘরই তাদের মাথা গুজবার একমাত্র ঠাঁই। ফজ্জের নীচু আর ছোট ঘর বা দোকান যাই বলুন না কেন, তার কড়ি-বরগার সঙ্গে অসংখ্য তার টানানো। তারগুলো খালি পড়ে রয়েছে। দাঙ্গার আগে, সুদিনে ফজ্জে আর নসরু পাগড়ি, শাড়ি এবং ওড়না রঙ করে তাতে কলপ আর অবরক লাগিয়ে এই তারগুলোতে টান টান করে শুকোতে দিত। দোকান ঘরে পাল্লা ছাড়া একটা আলমারিও রয়েছে। রঙের পুরিয়া, ডিব্বা এবং হাজার রকম টুকিটাকি জিনিসে তা ভর্তি। ঘরের এক কোণে বাপ-বেটার যাবতীয় সম্পত্তি—অ্যালুমিনিয়ামের কলাইকরা লোটা, ডেকচি এবং একটি থালা। আর চাটাইয়ের ওপর থাকে তাদের পরনের দু'চারটে জামা-কাপড়। কাপড় রঙ করার মাটির চাড়ি এবং কলপ তৈরির হাড়ি রাত্রে তারা দরজার কাছে বৈঠকী গল্প করার যে মাচা পাতা রয়েছে তার নীচে রেখে দিত। গলির লাগোয়া যে প্রাচীর, সেই প্রাচীরের শেষ প্রান্তে রাখা থাকত জলের মটকা। ফজ্জে আর নসরুর ঘরে শোয়ার খুব একটা দরকার পড়ে না। লাহোরের প্রচণ্ড

শীতের বা বর্ষার দিনগুলোতেই ওরা ঘরে ঘুমোয়। তাছাড়া ফজ্জে দোকানের চৌকাঠের সামনেই রাতটা কোনমতে কাটিয়ে দেয়, আর নসরু গলিতে আসা-যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিয়ে একটা চাটাই বিছিয়ে শুয়ে পড়ে। চাটাই-এ শুয়ে শুয়েই ও রাতের এক প্রহর পর্যন্ত 'হীর' বা 'টপ্পা' গেয়ে চলে।

নসরু আর রমেশের মধ্যে 'হীর' এবং 'টপ্পা'-র জোর লড়াই চলে। রমেশেরা ফজ্জের দোকান ছাড়িয়ে দুটো বাড়ি পরে দোতালায় থাকে।

রমেশ তাদের বাড়ির গেটের কাছে বসে, দুকানে হাত রেখে গলা ছেড়ে তান ধরে ; আর নসরু গলির চাটাই-এ বসে, কানে হাত রেখে, রমেশের বাড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে প্রতি উত্তরে গলা সপ্তমে চড়ায়। কখনও কখনও বা তারা দুজনে রমেশদের বাড়ির চত্বরে বসেও এক সঙ্গে তান ধরে।

উনিশশ সাতচল্লিশের জুলাই পর্যন্ত 'সৈদ মিট্‌ঠা'-তে হিন্দুদেরই বেশী আধিপত্য ছিল। ইতিমধ্যে বাজারে তিন-চারজন মুসলমান মারাও গিয়েছে। মুসলমানরা এখন আর এই বাজারের রাস্তা ধরে যাতায়াত করে না, ফলে 'গংগু কী গলি'-তে মুসলমানরা তাদের ছোট ছোট দোকানপাট বন্ধ করে রেখেছে। 'গংগু কী গলি'-তে অন্য মুসলমানদের দোকান বন্ধ হয়েযাওয়ার পরেও ফজ্জে এবং নসরু কিন্তু সেখানেই রয়ে গেল। ফজ্জে ভয়কে লুকিয়ে, আল্লার ভরসায় নিজেকে সঁপে দিল। তাছাড়া এই গলিতে আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে ফজ্জে আছে, সেটাও তার কম ভরসা নয়। গলির কাচ্চা-বাচ্চা আর তরুণ-তরুণী সবাই তাকে মামা বলে ডাকে। বাড়ির বৌ-ঝি আর বড় মেয়েরা মাথার আঁচল না টেনেই ওড়না, শাড়ি এবং পাগড়ি রঙ করানোর জন্য তার দোকানে আসে। মনের মত রঙ না হলে, বা কলপ এবং অবরক কম হলে তারা তার সঙ্গে ঝগড়া করতেও ছাড়ে না। বাচ্চারা ছেঁড়া ঘুড়ি ঠিক করার জন্যে তার কলপের হাড়ির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে কলপ নিয়ে ছুটে পালাত।

ফজ্জে চীৎকার করে নসরুকে বলত, নসরু, ধর ধর, চোর পালাল। …গলিতে যে সরু হাত দশেক লম্বা বাঁশ দড়ি দিয়ে ঝোলানো থাকত,

তা নামিয়ে নিতে নিজেই বাচ্চারা এক এক লাফে সটান তাদের ছাদে গিয়ে উঠত। গলির বৃদ্ধা, বৌ, মেয়ে সবার নাম-ধামের সঙ্গে সে পরিচিত। তাই এদের ছেড়ে সে কোথায় যাবে? অন্য জায়গায় ওর আপন বলতে আর কে আছে!

'গংগু কী গলি'-তে মুসলমানদের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিন্দুরা নিজেদেরই জয় অনুভব করল। ফজ্জে আর নসরু তাদের দোকানপাট ফেলে পালিয়ে না যাওয়ায়, দু-চারজন হিন্দু তা চ্যালেঞ্জ বলে মনে করল। এখন আর কেউ রঙ করার জন্যে তাদের কাপড় দিতে আসে না। কর্মচন্দ একদিন তাকে চোখ রাঙিয়ে বলেছে, 'কি মিঞা তোমার ব্যাপার-স্যাপার কি?'

ফজ্জে হাত জোড় করে বলেছে, "বাদশা, তোমার যা ইচ্ছে—তোমার যা হুকুম তাই-ই হবে। চল্লিশ বছর ধরে আমি এই গলির নুন খাচ্ছি, নিজের বলতে অন্য কোন জায়গা নেই। তুমি যদি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও, চলে যাব। অন্য কোথাও আমার যাওয়ার জায়গা নেই। বাদশা, এ রকম ঝড় তো হয়-ই, আবার থেমেও যায়। মাথা গরম করে কি লাভ, বল?"

হরচরণ পন্সারি মধ্যস্থতা করে বলে, "আরে ওকে থাকতে দাও, ও থাকলে কার কি আসে যায়? কালই যদি গলির বৌ-ঝিদের শাড়ি, ওড়না রঙ করার দরকার হয়, তখন কে করবে?"—কিন্তু কর্মচন্দ-র সাত বছরের ছোট ভাই ধর্মচন্দ এবং রমেশের ছোট ভাই রাজেশ তাদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকে কিছুতেই বশে আনতে পারছিল না। ওরা লাট্টু দিয়ে গাচ্ছা মেরে গলিতে রাখা ফজ্জের মটকা ভেঙে ফেলল। দিন পনেরো আগেও এমন ঘটনা ঘটলে ছেলেরা বকাবকি খেত। কিন্তু আজ ছেলেদের কেউ একটি কথাও বলল না।

নসরুর রক্ত ওর বাবার মতো ঠাণ্ডা নয়। মটকা ভেঙে দেওয়ায় তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে কাফের হিন্দুদের এ অপমান কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। শহরের অন্য মুসলমানরা যা করছে, সেও তাই করতে চাইল। পাকিস্তানের জন্যে যে ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই ধর্মযুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে সে-আকুল হয়ে উঠল। কিন্তু তার ভিরু প্রকৃতির বাবার যে জিদ সেই জিদের জন্যে ওর নিজের ইচ্ছেকে

দাবিয়ে রাখতে হল। হিন্দুদের দুর্গের মধ্যে বৃদ্ধ বাবাকে একলা ফেলে রেখে সে কেমন করে যায়? বেশ কয়েকদিন ধরেই নসরু তার বাবাকে গলি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার জন্যে বোঝাল। কর্মচন্দ শাসিয়ে যাওয়ার এবং মটকা ভাঙার পর নসরু রাগে দাঁতে দাঁত পিসে ওর বাবাকে বলল "শালা এই কাফেরদের মার···এখানে আর থাকা সম্ভব নয়। চল অন্য কোথাও জায়গা না পেলে মসজিদ বা দরগায় গিয়ে থাকব।"

ফজ্জে নীচু গলায় ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর শুয়োরের বাচ্ছা, খুব বাড় বেড়েছ। এখনো এমন কিছু ঘটেনি, এরকম হয়ই। বেকুফের মতো কথা বলিস না,······এই দোকান আমার বাপ করে গিয়েছে। এই ঘরে তোর জন্ম হয়েছে। তোর জন্মের সময় এই গলির বৌ-ঝিরা তোর মাকে দেখাশোনা করেছে। এই ঘরেই তোর মার মৃত্যু হয়েছে। আর এই গলির নুন খেয়েই তুই বড় হয়েছিস, তোর শরীরে বল এসেছে। চুপচাপ বস, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

হিন্দুরা ফজ্জেকে যে অপমান করেছে, সেই অপমান গলাধঃকরণ করে নসরুকে কড়া ধমক দিল সে। ফজ্জের ধমক খেয়ে যুবক নসরুর চোখ জলে ভরে ওঠে। ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বাবাকে বলল, "তোমার শরীরে মুসলমানের রক্ত নেই।"

ফজ্জে রাগে রি রি করে উঠল, "তেরি মা কি,....শুয়োর, তুই বড় মুসলমান হয়েছিস! তুই-ই একমাত্র দীনদার গাজী, না? তোর ঠাকুর্দা মুসলমান ছিল না? তুই কোন মুসলমানের বাচ্চা? তোরা সব নতুন মুসলমান হয়েছিস? শুয়োর চুপ করে বস।"

উনিশশ সাতচল্লিশ সাল, আগস্টের দ্বিতীয় সপ্তাহেই সৈদ মিট্‌ঠা বাজারের অবস্থা পালটে গেল। দু-দুবার মুসলমানরা আক্রমণ করল। হিন্দুদের অনেক বাড়িঘর এবং দোকানপাট জ্বালিয়ে দেওয়া হল। এখন দোকানপাট প্রায়ই বন্ধ থাকে। 'গংগু কী গলি'-র সমস্ত বাসিন্দাই হিন্দু। লাহোর ছেড়ে ইতিমধ্যে হাজার হাজার পরিবার পালিয়েছে। তা সত্ত্বেও 'গংগু কী গলি'-র হিন্দুরা এই গলিতেই জাঁকিয়ে বসে থাকা ঠিক করল। ঔরঙ্গজেব ও নাদির খাঁকেও আমরা ডরাই

না—জিন্না আর মুসলিম লীগ আমাদের কি করবে ? আমরা আমাদের ধর্মও ছাড়ব না, আমাদের বাড়িঘর ছেড়েও পালাব না। কিন্তু সৈদ মিট্‌ঠাতে আগুন, খুনখারাপি, লুটতরাজ শুরু হয়ে গেলে ভয়ে বেশ কয়টি পরিবার পালিয়ে যায়। আর যারা পড়ে রইল তারাও আর ভরসা না পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। থেকে গেল শুধু মুলাঁ জ্যেঠি।

বছর ছাব্বিশ আগে মুলাঁ জ্যেঠি বিধবা হয়েছে। ভগবানের কৃপায় ওর তিন তিনটি মেয়ে। মুলাঁ-র স্বামী পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে ভাইদের থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। মুলাঁ জ্যেঠির সঙ্গেও তার ভাসুর এবং দেওরদের খটাখটি লাগত। সব সময়েই সে মনে করত, আত্মীয়-স্বজন সবাই বুঝি তাকে ঠকাচ্ছে। 'গংগু কী গলি'-তে তার যে বিরাট বাড়ি, তাতে দুটি ভাড়াটে আছে। সোনার যে গয়নাগাটি ছিল তা বিক্রি করে দিয়ে সে গোপনে অন্যের গয়নাগাটি বন্ধক রেখে সুদে টাকা ধার দিত। সবচেয়ে ছোট মেয়ের বিয়েই হয়েছে আজ থেকে বছর চোদ্দ আগে। ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে আর একটি ভাড়াটে বাড়ে। ভাড়াটেদের সঙ্গে ওর শুধু সম্পর্ক ছিল ভাড়া নেওয়ার। ভাড়া দিতে চারদিন দেরী হলে ভাড়াটেদের চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করে ছাড়ত। পাড়া-প্রতিবেশীদের সঙ্গেও ওর কোন রকম সম্পর্ক ছিল না। ঠাকুরের পূজোপাঠ আর জপতপেই ওর সারা দিন কেটে যেত।

গলির হিন্দুরা ভয়ে পালাতে শুরু করলে মুলাঁ তার বাড়ি আর গুপ্ত সম্পত্তির মায়ায় আরও জড়িয়ে পড়ল। সে সময় কারো সঙ্গেই প্রীতির কোন সম্পর্ক ছিল না। নিজের গৃহদেবতা ছাড়া ও দুনিয়ায় আর কাউকে বিশ্বাস করত না। পাড়া-প্রতিবেশীরা ওর এই পাগলামো দেখে বলত, বুড়ি এত টাকা-পয়সা দিয়ে কি করবে ? বোধ হয় মন্দির বা ধর্মশালা বানিয়ে নাম কিনতে চায়। এই সংকট মুহূর্তে কেউই স্বেচ্ছায় সহানুভূতিশীল হয়ে বুড়ির বোঝা নিজের কাঁধে চাপাতে চাইল না। নিস্তব্ধ গলিতে মুলাঁ তার বিরাট শূন্য বাড়িতে ঠাকুরকে ভরসা করে একাই রয়ে যায়। আর নীচে, গলির মোড়ে থেকে গিয়েছে কেবল ফজ্জে ললারি ও তার ছেলে নসরু।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগে, 'গংগু কী গলি'-র প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে ফজ্জের কোন না কোন ভাবে একটা সম্পর্ক ছিল। মুলাঁ জ্যেঠির ছোট মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে ফজ্জের সঙ্গে মুলাঁ জ্যেঠির সম্পর্ক ছিল শুধু মাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গত মাসের ভাড়া নেওয়ার। তু-তিনবার করে তাগাদা না দিলে ফজ্জেও কিছুতেই ভাড়া দিত না। তাই মুলাঁ জ্যেঠি ফজ্জেকে ভাড়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে দোতালার বারান্দায় ফজ্জের দোকানমুখো হয়ে ঠাকুর নিয়ে বসত। আর পূজা করতে করতে সময় মতো ভাড়া না দেওয়ার জন্যে ফজ্জেকে সমানে গালিগালাজ করত।

গলি থেকে সবাই যখন এক এক করে তাদের জিনিসপত্র আর পরিবার পরিজন নিয়ে পালাত, তা দেখে ফজ্জে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলত, "হায় আল্লা, এ কী কিয়ামতের দিন এল। সবাই যদি চলে যায় তবে এই উজাড় জায়গায় আমি একা কী করে দিন কাটাব! ভূতের ডেরায় আমি একা কী করে থাকব!"

কাফেরদের পালাতে দেখে নওজোয়ান নসরু উল্লসিত হয়ে ওঠে। দাঁত পিষতে পিষতে নসরু বলল, "হারামি কাফেরদের জাহান্নামে যেতে দাও। পাকিস্তানে কাফেরদের কোন স্থান নেই।"

কারা কারা যাচ্ছে, আর কারা কারা থেকে গেল, ফজ্জে এক তুই করে গুনে চলল। তেরোই আগস্ট ভোরে সাধুরাম এবং যমুনাদাসও তাদের পরিবার নিয়ে চলে গেল। ওরা চলে যাওয়ার পর ফজ্জে উদাসভাবে তার ছেলের দিকে তাকাল। বলল, "শুধু মুলাঁ জ্যেঠিই রয়ে গেল।"

নসরু মুখ বিকৃত করে উপেক্ষার সাথে বলল, "ও ডাইনী আর কোথায় যাবে। সোনা-রূপো মাটিতে পুঁতে তার ওপরই সাপ হয়ে থাকবে। ও…ও আর কোথায় যাবে!"

সেদিনই তুপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় মত্ত মুসলমানদের একটা দঙ্গল হীরামণ্ডির দিক থেকে এসে সৈদ মিট্ঠা বাজারের ওপর চড়াও হল। হিন্দুরা আগেই তাদের দোকানপাটে বড় বড় তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছিল। মুসলমানরা পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আল্লা-হো-আকবর সলতনে ইলাহি জিন্দাবাদ প্রভৃতি স্লোগান দিতে লাগল। দোকানের

তালা ভেঙে তারা লুটতরাজ শুরু করে দিল। কাপড়ের দোকান থেকে লুটেরারা সিল্ক, মখমল এবং মলমলের থান নিয়ে পালাতে লাগল। কেউ কেউ মনিহারি দোকান থেকে বাদাম, কিসমিস, ছুহার আটা, সুজি, চিনির বস্তা নিয়ে ভাগল। কেউ কেউ বাসনের দোকান এবং সোনার দোকানের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হৈ-হল্লা শুনে কি হচ্ছে দেখার জন্যে ফজ্জে আর নসরুও গলির মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেল। লোভে নসরুর জিভ জলে ভরে উঠল। ও বলল, "আব্বা এক-আধ থান মখমল বা আটা, চিনির বস্তা যা পাই উঠিয়ে নিয়ে আসি?"

ঘৃণায় ফজ্জে ওকে ধমক দিয়ে বলল, "চুপ করে থাক হারামজাদা।"

নসরু ওর বাবার সঙ্গে তর্ক করে বলল, "কেন, সবাই তো নিয়ে যাচ্ছে। কথায় আছে, এগুলো তো ধর্মযুদ্ধের প্রসাদ।"

ফজ্জের রাগ আরও দ্বিগুণ হয়ে গেল, "শালা, চুরি-ডাকাতি করা জেহাদ, তাই না? ধর্মযুদ্ধের প্রসাদ তো নয়, শুয়োরের বিষ্ঠা।" ঘৃণায় আর রাগে ফজ্জে একগাদা থুথু ফেলে বাড়ি-মুখো হল। এবং নিজের দোকানের চৌকাঠে গিয়ে বসল।

ধর্মের জন্যে নসরুর যে উন্মাদনা, বাবাকে ব্যঙ্গ করেও তা শান্ত হল না। ও সামনে একপা-দুপা করে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল এবং স্লোগান দিতে দিতে 'লুহারি মণ্ডি'র দিকে চলল। পথে নিহত তিন জন হিন্দুর লাশ পড়ে থাকতে দেখে ওর উত্তেজনা এবং জেহাদী রক্ত আরও টগবগ করে ফুটে উঠল। ধর্মযুদ্ধের যে লড়াই, সেই লড়াই-এর একজন হওয়ার জন্যে ওর হাত নিসপিস করতে লাগল।

লাহোরের প্রতিটি বাজারেই এমন লুটতরাজ আর বিধ্বংসী কার্য-কলাপ শুরু হয়ে গেল যে, অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্যে লরি ভর্তি সশস্ত্র ফৌজ পাঠাতে হল। গুড়ুম গুড়ুম করে রাইফেল গর্জে উঠল। ভিড় দেখলেই মিলিটারি গুলি চালাতে লাগল। ফজ্জে তার দোকানের চৌকাঠের ওপর বসে বাজারের দিকে তাকিয়ে রইল। একজন লোক পিতলের এক বিরাট পরাত বগলদাবা করে গলির সামনে দিয়ে পালাচ্ছিল। তাকে তাক করে বন্দুক গর্জে উঠল, লোকটি চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। পরাতটা তার হাত থেকে ছিটকে রাস্তার

ওপর পড়ে ঝনঝন করে উঠল। ভয়ে ফজ্জের সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল,—হায় নসরু!

রাইফেলধারী সিপাইরা সমস্ত বাজার এবং অলিগলি তছনছ করে দিয়ে গেল। কার্ফু শুরু হয়ে গিয়েছে। তিন জনের একসঙ্গে চলার কোন হুকুম নেই। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, সন্ধ্যা সাতটায়—মিউনিসিপ্যালিটির বাতি জ্বালার পর বাজারের ভেতর দিয়ে কেউ চলা-ফেরা করতে পারবে না। করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করা হবে।

কার্ফু শুরু হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও নসরু ফিরে এল না। ভয়ে ফজ্জের কলিজা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ওর চোখ জলে টলমল করে উঠল। নওজোয়ান ছেলের এরকম আহম্মকি দেখে রাগে ফজ্জের মুখ দিয়ে বারবার গালি বেরিয়ে আসছে, হারামজাদা বোকা পাঁঠা কোথাকার, মাথা একেবারে বিগড়ে গেছে। হায় আল্লা, কেন এমন হল?

আলো জ্বলার আগেই নসরু ফিরে এল। নসরুকে দেখে, ফজ্জের ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। ছেলেকে ধমক দিয়ে ফজ্জে বলল, "চল,…ঘরের ভিতর গিয়ে বস। খবরদার বাইরে একদম বেরুবি না। তাহলে মিলিটারির গুলিতে পাগলা কুত্তার মতো মরবি…সব বীরত্ব বেরিয়ে যাবে।"

কোন রকম পরোয়া না করেই নসরু বলল, "তাতে কি হয়েছে? মিলিটারিও তো আমাদের। আমরা সবাই মুসলমান, ভাই ভাই। কাফেররা সব পালিয়েছে। এক একজন পাঁচ পাঁচ সের করে সোনা ভাগে পেয়েছে। কাপড়ের থানে ঘর ভরে গিয়েছে।"

নিজের সম্প্রদায়ের বিজয়ে নসরুর মন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। লুহারি মণ্ডি থেকে ও একটা ছুরিও সংগ্রহ করে এনেছে। বুড়ো বাপ ছুরি দেখে যাতে ভয় না পেয়ে যায়, সেজন্যে সে কোমরের লুঙ্গির ভাঁজে ছুরিটি গুঁজে রাখে।

সাতটার সময় কার্ফু শুরু হওয়ার ভোঁ শুনে ফজ্জে আর নসরু—দু জনেই ভিত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ফজ্জে আর কিছুতেই রুটি সেঁকায় মন লাগাতে পারছে না। নসরু তার বাবার অবস্থা-গতিক দেখে কোন কথা বলল না। ঘরের মধ্যে যে চাটাই পাতা রয়েছে, তাতে দুজনেই

পাশাপাশি শুয়ে পড়ল। গলিতে অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠছে, আর ঘরের ভেতর যে অন্ধকার তা যেন আরও বেশী জমাট বেঁধে রয়েছে। কোন হাওয়া বইছে না—চারদিকে নিশ্চল, একটা গুমোট ভাব। আকাশ ভারি মেঘে ছেয়ে রয়েছে, আর অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা রৌদ্রের তাপে দগ্ধ পাকা দালান-কোঠার যে অসহ্য গরম, সেই গরমকে আরও ভ্যাপসা করে তুলেছে। সারা শহরে কোন সাড়াশব্দ নেই। হাওয়াও যেন শ্বাস রোধ করে রয়েছে।

ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গরমে শুয়ে শুয়েই ফজ্জে আর নসরু যেন শরীর থেকে নিংড়িয়ে নিংড়িয়ে তেলের মতো ঘাম বের করে চলেছে। ফজ্জে গা থেকে জামা এবং লুঙ্গি খুলে শুধু লেঙ্গুটি পরে নিল। নসরুও উদোম গায়ে শুয়েছিল। ঘামে শরীর চটচট করছিল বলে নসরু কোমর পর্যন্ত লুঙ্গি তুলে নিল। কার্ফু আর প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে দুজনেই বদ্ধ ঘরের মধ্যে আতঙ্কে নির্বাক হয়ে গিয়েছে। মেজাজ ক্রমশই তিরিক্ষি হয়ে উঠছে। ঘরে খেজুরের পাতার একটা হাত পাখা ছিল। ফজ্জে খেজুরের পাখা দিয়ে নিজেকে এবং নসরুকে হাওয়া করতে লাগল। হাত অবশ হয়ে গেলে, পাখা বারবার নসরুর বুকের ওপর আছড়ে পড়তে লাগল। বাবার হাত থেকে পাখাটা টেনে নিয়ে নসরু নিজেকে এবং বাবাকে হাওয়া দিতে থাকে। দুজনের মনই পরস্পরের প্রতি এবং সমস্ত পরিবেশের ওপর বিষিয়ে উঠছিল, আর দুজনে দুজনকে পালা করে হাওয়া দিয়ে চলেছিল। একমাত্র ঘুমই ওদের দেহ-মনে শান্তি এনে দিতে পারত। কিন্তু ভ্যাপসা গরমের জন্য ওদের চোখে ঘুম ছিল না। চারদিকে ভয়ের যে বুকচাপা নিস্তব্ধতা, সেই নিস্তব্ধতাকে খানখান করে শান বাধানো বাজারের ফুটপাতে সশস্ত্র মিলিটারির বুটের শব্দ ভেসে আসছিল। আর এই শব্দ যেন ওদের আরও ভয়ে কুঁকড়িয়ে দিচ্ছিল।

রাতের এক প্রহর পার হয়ে গিয়েছে। না ফজ্জে না নসরুর—কারো চোখে ঘুম আসছে না। ঘামে নসরুর পিঠ বারবার খেজুরের চাটাইয়ের সঙ্গে সেঁটে যাওয়ায় ওর মন-মেজাজ খিচিয়ে উঠছিল। বাবার হাতে পাখা ধরিয়ে দিয়ে ও চাটাই থেকে উঠে বাইরে চৌকাঠের ওপর গিয়ে বসল।

গলিতে চাপা পায়ের শব্দ শুনল। নসরু চমকে উঠল। শব্দকে অনুসরণ করে ওর চোখ ঘুরে গেল। দেখল, ধুতি আর চাদর দিয়ে নিজেকে আপাদমস্তক ঢেকে মুলাঁ পা টিপে টিপে বাজারের দিকে এগুচ্ছে। নসরু একবার বাবার দিকে ফিরে তাকাল, তাকিয়ে খুব নীচু গলায় বলল, "বাবা দেখ, বুড়ি মুলাঁ ভাগছে।"

শুয়ে হাওয়া করতে করতে ফজ্জে অবহেলায় বলল, "ভাগতে পারে ···একা আছে, ভয় পেয়ে গিয়েছে। আল্লাই ওকে বাঁচাবে।"

নসরু দেখতে পেল বুড়ি গলি ছেড়ে বাজারের রাস্তায় পা রেখেছে। "শালি, কাফের পোঁটলায় সমস্ত কিছু নিয়ে পালাচ্ছে।"···মুখ থেকে কথাগুলো বেরুতেই ওর সমস্ত লোমকূপ খাড়া হয়ে উঠল।

ফজ্জে করুণার সঙ্গে বলল, "আল্লা যদি ওকে বাঁচায়, তাতে তোর কি ?"

বাবার কথা শেষ না হতেই নসরু বারান্দা থেকে এক লাফে নীচে নেমে বুড়ির পেছনে ধাওয়া করল।

নসরুকে বাজারের দিকে ছুটতে দেখে ফজ্জে বুঝল ছেলে বিপদের মধ্যে পা বাড়াচ্ছে, যে কোন সময় প্রাণ যেতে পারে। কোন উপায় না দেখে সে খিস্তি করে উঠল আর খিস্তি দিতে দিতেই ছেলের পেছন পেছন ছুট দিল।

বৃদ্ধ ফজ্জে কোন রকমে অবসন্ন পায়ে টলতে টলতে বাজার পর্যন্ত ছুটে এল। সে দেখল প্রায় চল্লিশ কদম আগে একটা লাইটপোস্টের নীচে নসরু মুলাঁ জ্যেঠির পেটে চাকু চালিয়ে দিয়ে ওর পোঁটলা ছিনিয়ে নিয়ে আবার দৌড়ে আসছে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে ফজ্জে ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকাল।

সাফল্যের উল্লাসে নসরু বলল, "কাফের বুড়ি, সব কিছু নিয়েই পালাচ্ছিল।"···ও আর একমুহূর্ত দেরী না করে তাড়াতাড়ি পোঁটলা খুলতে লাগল।

ফজ্জের বুক ধড়ফড় করছিল। দুহাতে মাথা টিপে ধরে ও বসে পড়ল। জোরে জোরে ওর নিশ্বাস পড়ছিল। গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছিল না। হাতে কোন বল ছিল না, তাই বুড়ির কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা সম্পত্তি যখন নসরু খুলছিল সে বাঁধা দিতে পারল না।

হাতে বল থাকলে সে পোঁটলা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিত।

নসরু পোঁটলা খুলে ফেলল। ভেতরে ছোট্ট একটা বন্ধ কাঠের বাক্স। এক ঝটকায় ঢাকনা খুলতেই দেখল, "হায় একি,......শালি কাফের বুড়ি পাথরের এক খোদা নিয়ে পালাচ্ছিল।" ও ব্যঙ্গ করে হেসে উঠল।

ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারের মধ্যে রাগে ক্ষোভে ফজ্জের চোখ লাল টকটকে হয়ে উঠল। ছেলেকে সুরক্ষিত অবস্থায় দেখে ফজ্জে রাগে এবং গ্লানিতে বলে উঠল, "শালা শুয়োরের বাচ্চা,...খুব বাড় বেড়েছে তোর, একটা নিষ্পাপ বুড়িকে তুই খুন করলি। কাফের তার পাথরের খোদা নিয়ে ভাগছিল। ওর পাথরের খোদা দিয়ে যদি তোর খোদার মাথা ভেঙে দেওয়া হয়! তুই বড় গাজি হয়েছিস, তুই তোর খোদাকে বাঁচিয়েছিস না।"

রাজেন্দ্র সিং বেদী

লাজবন্তী

"হথ লাঁয়া কুমলান নী লাজবন্তী দে বুটে...."

[ও সখি, এ হচ্ছে লজ্জাবতী লতার গাছ, হাত লাগলেই লজ্জায় মুষড়ে পড়ে।]

দেশ ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে, আর সেই বাটোয়ারার পর অগণিত আহত মানুষ আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে শরীর থেকে রক্ত মুছে ফেলেছে। রক্ত মোছার পর তারা মনোযোগ দিল সেই সব মানুষের দিকে, যাদের দেহে সামান্যতমও আঘাত লাগেনি, কিন্তু হৃদয় আর মন সম্পূর্ণভাবে আহত—ক্ষত-বিক্ষত।

পাড়ায় আর গলিতে গলিতে 'ফির বসাও' কমিটি গঠিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রথম বহু কষ্টে 'ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থান দাও', 'জমিতে বসাও' এবং 'ঘরে স্থান দাও'—অর্থাৎ স্থান দাও প্রোগ্রাম শুরু হয়। এই প্রোগ্রামের সঙ্গে আর একটি প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল, যে প্রোগ্রাম কাউকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে না। প্রোগ্রামটি ছিল চুরি করে নিয়ে যাওয়া মেয়েদের সম্বন্ধে। স্লোগান ছিল—হৃদয়ে স্থান দাও। কিন্তু নারায়ণ বাবাজীর মন্দির এবং তার আশেপাশের যে প্রাচীনপন্থী মানুষের বাস তারা এর প্রচণ্ড বিরোধিতা করতে লাগল।

'হৃদয়ে স্থান দাও'—এই প্রোগ্রামকে কার্যকরী করার জন্যে মন্দিরের পাশেই যে মহল্লা, সেই মুল্লা শকুর মহল্লায় একটি কমিটিও হয়ে গেল। এবং এগারো ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সুন্দরলাল বাবু কমিটির সেক্রেটারী নির্বাচিত হলেন। আর উকিল সাহেব হলেন কমিটির সভাপতি। চৌকি কলার প্রধান মহুরি এবং মহল্লার অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ধারণা, সুন্দরলালের চেয়ে অন্য কেউ এতো ভালো কাজ করতে পারবে না। পারবে না, তার কারণ সুন্দরলালের স্ত্রীও এই দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে বলে। ওর স্ত্রীর নাম লাজো—অর্থাৎ লাজবন্তী।

প্রভাত ফেরিতে সুন্দরলাল এবং তার আর আর সাথীরা—রসালু নেকিরাম যখন গেয়ে চলে, 'হথ লাঁয়া কুমলান নী লাজবন্তী দে বুটে···' তখন সুন্দরলালের কণ্ঠ কান্নায় বুজে আসতে চায়। প্রভাত ফেরির সঙ্গে নীরবে হাঁটতে হাঁটতে ও লাজবন্তীর কথা ভাবে, 'জানি না ও কোথায় আছে, কখনও ফিরে আসবে কি! কে জানে···'। শান বাঁধানো রাস্তায় চলতে চলতে ওর পা টলতে থাকে।

ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থায় এসে পেঁ'ৗছেছে যে, লাজবন্তীর কথা আর বেশী ভাবতে পারে না সে। ওর দুঃখ ওর ব্যথা যেন সারা বিশ্বের দুঃখ আর ব্যথায় পরিণত হয়েছে। দুঃখ বোধ থেকে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্যে সুন্দরলাল নিজেকে জনসেবার কাজে ডুবিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সাথীদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাওয়ার সময় লাজবন্তীর কথা তার বার বার মনে পড়ে যায়। মানুষের হৃদয় কতই না নরম—স্পর্শকাতর। সামান্য একটু কঠিন কথাতেই ও আঘাত পেত, যেন লজ্জাবতী লতা—ছোঁয়া লাগলেই নেতিয়ে পড়ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাজবন্তীর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করতে ওর বাঁধেনি। উঠতে বসতে, যখন তখন নিজের আধিপত্য জাহির করার জন্যে ও তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম ঘটনাকে কেন্দ্র করে লাজবন্তীকে কী বেদমই না পিটিয়েছে।

লাজো লবঙ্গলতার মতো কৃশাঙ্গী এক গ্রামীণ মেয়ে। খুব ঘেমে যায় বলে ওর দেহের রঙ শ্যামবর্ণ হয়ে গিয়েছে। ওর সারা দেহে এক অদ্ভুত ধরনের চপলতা ছিল। কিন্তু সেই চপলতা ছিল শিশির বিন্দুর

মতো টলমল—যে টলমল শিশির বিন্দু বড় বড় কচুপাতার ওপর ছলকে ছলকে ওঠে। লাজোর তনুর কৃশতা কিন্তু অসুস্থতার জন্যে নয়। বরং ওর এই কৃশাঙ্গ সুস্থতারই সার্বিক লক্ষণ। একহারা লাজোকে সুন্দরলাল যেদিন প্রথম দেখে, অবাক বিস্ময়ে চমকে ওঠে, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারে লাজো সব রকম দায়িত্ব, সব রকম দুঃখ, সব রকম জ্বালা-যন্ত্রণা—এমন কি মার-ধরও সহ্য করার মতো ক্ষমতা রাখে। সুন্দরলাল ক্রমেই তার ওপর অত্যাচার এবং লাঞ্ছনা বাড়িয়ে চলেছিল, বাড়াতে বাড়াতে তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যেখানে যে কোন সুস্থ মানুষের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু লাজো এই বাঁধ-ভাঙ্গা সীমাকেও অতিক্রম করতে পেরেছিল। ও কখনই বেশীক্ষণ নিজের দুঃখকে ধরে বসে থাকতে পারত না। তাই ভীষণ লড়াই ঝগড়ার পর যখন সুন্দরলাল মুহূর্তের জন্যে হেসে ফেলত, ও নিজেকে আর সামলে রাখতে পারত না। সেও হেসে বলত, “কখনও যদি আবার মার, তবে কোনদিন তোমার সঙ্গে কথা বলব না।” বেশ বোঝা যেত, ও সমস্ত মার-পিটের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে। গেঁয়ো মেয়েদের মতো ওরও ধারণা ছিল, স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী এর চেয়ে ভালো ব্যবহার করে না। যদি কোন মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে মুখেমুখে এতটুকু তর্ক করে, তবে অন্য মেয়েরাই নাকের ওপর আঙ্গুল রেখে বিস্ময়ে বলে, “কি রকম মরদ দেখেছ, দু-চার ঘা দিয়ে বৌকে সিধে করতে পারে না।”······শুধু তাই নয়, এই লড়াই-ঝগড়াকে তারা তাদের গানের কলিতে বেঁধে রেখেছে। লাজো নিজেই গাইত, “আমি শহরের ছোকরার সঙ্গে বিয়ে বসব না, কারণ তাদের পায়ে থাকে ধামসা ধামসা বুট জুতো, আর আমার কোমর যে সরু।”... লাজো কিন্তু প্রথম দর্শনেই শহরের এক যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। সে ছোকরার নাম সুন্দরলাল। বরযাত্রীদের সঙ্গে সেও লাজো-দের গ্রামে গিয়েছিল, আর বরের কানে ফিসফিস করে বলেছিল, “মাইরি বলছি ভাই, তোর ওই শালি কিন্তু ভারি সুন্দর। খুব তুখোড় বৌ হবে। লাজবন্তী সুন্দরলালের সমস্ত মন্তব্যই শুনে ফেলেছিল। কিন্তু ও নিজেই ভুলে বসেছিল, সুন্দরলাল বড় বড় ধামসা বুট পরে এসেছে। আর ওর নিজের কোমরও সরু।

প্রভাতফেরির সময় এই রকম নানা কথা সুন্দরলালের এক এক করে মনে পড়ে যায়। আর ও মনে মনে ভাবত, শুধু একবারটির জন্যে যদি লাজোকে ফিরে পেতাম, ওকে সত্যি সত্যি আমার হৃদয়ে বসিয়ে রাখতাম। লোককে বলতাম, হতভাগীরা হারিয়ে গিয়েছে বলে ওদের কী দোষ। দাঙ্গার দুর্ঘটনায় শিকার হওয়ার জন্যে ওদের কেন দোষী করা হবে। যে সমাজ এই নিষ্পাপ—এই নির্দোষ মেয়েদের সমাজে স্থান দিতে কুণ্ঠা বোধ করে, সেই পচা-গলা সমাজকে জিইয়ে রেখে কি লাভ। এর চেয়ে তার ধ্বংসই শ্রেয়।···লুট করে নিয়ে যাওয়া মেয়েদের ঘরে ঠাঁই দেওয়ার কথা ও মনেপ্রাণে ভাবে। ও দেখতে চায়, ওরা আবার সমাজে ঠাঁই পেয়েছে। ও জানে, মা মেয়ে বোন বা স্ত্রী—যেই হোক না কেন তারা হচ্ছে ঘরের শোভা।

'হৃদয়ে স্থান দাও' প্রোগ্রামকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্যে মহল্লা মুল্লা শকুর-এর কমিটি বেশ কয়েকটি প্রভাতফেরি বের করে। ভোর চার-পাঁচটাই হচ্ছে প্রভাত ফেরির সবচেয়ে ভাল সময়। কারণ সেই সময় মানুষের হৈ-হট্টগোল থাকে না, কেউ টিপ্পনীও কাটতে পারে না। এমন কি সারারাত জেগে যে কুকুরগুলো পাহারা দেয় তারাও পেটের মধ্যে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে। শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়েই লোক-জন বলাবলি করে, "ঐ যে হৃদয়-পালটানোর দল চলেছে।" কখনও বা তারা শিষ্টভাবে, কখনও বা রাগে-ক্রোধে সুন্দরলালের প্রচার শোনে। কড়া প্রহরা বসিয়ে যে সব মেয়েদের এপারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা সবাই গমের দানার মতো এদিকে-সেদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। তাদের স্বামী এবং আত্মীয়-স্বজনেরা উত্তাপহীনভাবে প্রভাতফেরির ধুন আওড়াতে আওড়াতে চলে যায়। গানের শব্দে কখনও বা কোন শিশু মুহূর্তের জন্যে চোখ মেলে তাকায় এবং 'হৃদয়ে স্থান দাও'—এই ফরিয়াদ, এই হৃদয়-বিদারক প্রচারকে নেহাৎ একটি গান ভেবে আবার ঘুমে ঢলে পড়ে।

কিন্তু ভোরে, কানের মধ্যে যে শব্দ গুঞ্জরিত হয়, তা একেবারে ব্যর্থ হয়ে যায় না। সারাদিন ধরে সেই শব্দ সেই কলি মগজের মধ্যে গুনগুন করতে থাকে। মাঝে-মধ্যে মানুষ এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করেই গুনগুন করে গেয়ে চলে। যখন এই ধুন মানুষের মনের গভীরে স্থান

করে নিচ্ছিল ঠিক সেই সময় মিস মৃদুলা সারাভাই 'বদলা-বদলি' করে লুণ্ঠিতা মেয়েদের একটা দল পাকিস্তান থেকে ভারতে নিয়ে এলেন। তারা ভারতে এলে মহল্লা শকুরের অনেকেই তাদের 'স্থান' দেওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তাদের ভাই বন্ধু এবং আত্মীয়-স্বজনরা তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে শহরের বাইরে চৌকি কলাতে উপস্থিত হয়। হতভাগী অবলারা এবং তাদের ভাই বন্ধু এবং স্বজনরা অনেকক্ষণ ধরে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা হেট করে তারা তাদের বিধ্বস্ত ঘর-দোর আবার পুনর্গঠনের জন্যে ফিরে গেল। আর রসালু নেকিরাম এবং সুন্দরলাল সমানে কখনও 'মহেন্দ্র সিং জিন্দাবাদ', কখনও বা 'সোহনলাল জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিয়ে চলেছিল। এত জোরে জোরে ওরা গলা ফাটিয়ে শ্লোগান দিচ্ছিল যে, চীৎকারে একসময় তাদের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

লুণ্ঠিতা মেয়েদের অনেকেই তাদের স্বামী মা বাবা ভাই বোন চিনতে পারছে না বলে জানিয়ে দিল। 'এরা কেন বেঁচে রয়েছে, নিজেদের মর্যাদা এবং লজ্জাকে বাঁচানোর জন্যে কেন এরা বিষ খায়নি, কেন কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেনি? ভীরু বলেই এরা এমন ঘৃণ্য জীবনকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। হাজার হাজার মেয়ে তো তাদের মর্যাদা—তাদের সম্মান লুণ্ঠিত হওয়ার আগেই প্রাণ দিয়েছে।...' কিন্তু এই মানুষগুলো কীভাবে জানবে, বেঁচে থেকে ওরা কী বীরাঙ্গনারই না পরিচয় দিয়েছে! পাথরের মতো নিথর চোখ নিয়ে ওরা কত মৃত্যুকেই না অবলোকন করেছে! আর আজ, এই দুনিয়ায়, এমন কি তার স্বামীও তাকে চিনতে অপারগ হচ্ছে! তাদের মধ্যে একজন নিজের নাম বিড়বিড় করে আউড়িয়ে চলল,—"সুহাগবন্তী...আমি সুহাগবন্তী...কি, তুই আমাকে চিনতে পারছিস না বিহারী? আমি তোকে কোলে পিঠে নিয়ে কত খেলেছি...।" ওর কথা শুনে বিহারী আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। কিন্তু ওর মা-বাবা তাদের বুক দুহাতে চেপে ধরে নারায়ণ বাবার মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল। আর নারায়ণ বাবা উদাসীনভাবে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে রইল। তার এই চেয়ে থাকার মধ্যে কোন বাস্তব সত্য নিহিত নেই,—শুধু হাজার হাজার দৃষ্টিকে ধোঁকা দেয়ার প্রচেষ্টা। আকাশ হচ্ছে এমন

এক সীমারেখা, যে সীমারেখার পর আমাদের দৃষ্টি আর প্রসারিত হয় না।

পাকিস্তান থেকে মিলিটারি ট্রাকে বসিয়ে মিস সারাভাই বিনিময় করে যে মেয়েদের এনেছিলেন, তাদের মধ্যে লাজো ছিল না। এক হতাশা নিয়ে সুন্দরলাল ট্রাক থেকে শেষ মেয়েটিকে নামতে দেখেছিল। তারপর মনে বল ফিরিয়ে এনে সে আবার দৃঢ়তার সঙ্গে কমিটির কাজ-কর্ম শুরু করে দিল। এখন আর তারা শেষ রাত্রে প্রভাতফেরি নিয়ে বের হয় না। বরং সন্ধ্যার দিকে মিছিল বের করে। কখনও কখনও বা ছোট ছোট পথসভার আয়োজন করে। এইসব পথসভার সভাপতিত্ব করেন কমিটির প্রধান সভাপতি উকিল কালিকাপ্রসাদ 'সুফি'। আর গলা খাঁকারি দিতে দিতে তিনি ভাষণ দিতেন! তিনি যখন ভাষণ দিতেন রসালু একটা পিকদানি হাতে তাঁর পাশে ডিউটি দিত। লাউডস্পিকারে এক অদ্ভুত ধরনের খা…খা… হ…হ…খা…খা…শব্দ হত। এরপর মাইকে দু-চারটে কথা বলার জন্যে নেকিরামও উঠে দাঁড়াত। সমস্ত ভাষণেই এরা শাস্ত্র এবং পুরাণ থেকে উদাহরণ টানত। এমন সব উদাহরণ টানত যে, তারা নিজেরাই নিজেদের যুক্তিকে দুর্বল এবং নিস্তেজ করে দিত। সভা একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে দেখে, সুন্দরলাল স্বয়ং উঠে দাঁড়াত। কিন্তু ও দু-চারটের বেশী কথা বলতে পারত না। কারণ কান্নায় ওর গলা বুঁজে আসত, চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ত। সে নিজের সিটে ধপ করে বসে পড়ত। শ্রোতাদের মধ্যে এক আশ্চর্য-রকমের মৌনতা ছেয়ে যেত। সুন্দরলালের হৃদয়ের গভীর থেকে যে দু-চারটে কথা বেরিয়ে আসত, তা উকিল কালিকাপ্রসাদ 'সুফি'র সারগর্ভ ভাষণের ওপরও প্রলেপ বুলিয়ে দিত। আর শ্রোতারা যে যার জায়গায় বসে হাপুস নয়নে কেঁদে নিজেদের মনের জ্বালা এবং যন্ত্রণাকে অনেকখানি শান্ত করে নিত। তারপর…তারপর তারা শূন্য মন নিয়ে ঘরে ফিরে যেত একসময়।

একদিন সন্ধ্যার সময় কমিটির লোকজন প্রচার করতে করতে প্রাচীনপন্থীদের যে দুর্গ তার চৌহদ্দির মধ্যে চলে এল। মন্দিরের সামনেই পিপুল গাছের নীচে শান বাঁধানো বিরাট চত্বর, সেই চত্বরে

বসে ভক্তরা শ্রদ্ধাভরে রামায়ণ পাঠ শুনছিল। নারায়ণ বাবা রামায়ণের লব-কুশ কাণ্ড পাঠ করছিলেন, সেই কাণ্ডের এক জায়গায় আছে 'ধোপা ধোপানীকে বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে। বের করে দেওয়ার সময় বলে, আমি শ্রীরামচন্দ্র নই, এত বছর রাবণের সঙ্গে ঘর করার পরও তিনি সীতাকে গ্রহণ করার মতো হিম্মত রাখেন। কিন্তু এই রামচন্দ্রজীই একদিন আবার মহারাণী সীতাকে ত্যাগ করলেন, যখন কিনা তিনি গর্ভবতী।' এর চেয়ে রামরাজ্যের আর কি ভালো এবং যথার্থ নমুনা হতে পারে? নারায়ণ বাবা বললেন, "এই-ই হচ্ছে যথার্থ রামরাজ্য, যে রামরাজ্যে নগণ্য ধোপার কথাও এত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে…"

কমিটির মিছিল মন্দিরের কাছে এসে থেমে যায়। রামায়ণ-কথা এবং শ্লোকের অর্থ শোনার জন্যে ওরা থমকে দাঁড়ায়। নারায়ণ বাবাজীর শেষ বক্তব্য শুনে সুন্দরলাল বলল, "বাবাজী, এরকম রামায়ণ-কথা শুনে কি লাভ?"

ভিড়ের মধ্যে কে যেন চীৎকার করে উঠল, "চুপ কর, চুপ কর, তুমি বলার কে?"

সুন্দরলাল সামনে এক পা-দু পা এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমার মুখ কেউ জোর করে বন্ধ করতে পারবে না।"

সুন্দরলালকে বাধা দিয়ে অনেকে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, "চুপ কর, চুপ কর বলছি, আমরা একটি কথাও বলতে দেব না।"

ভিড়ের আর এক দিক থেকে ভেসে এল, "টুটি টিপে ধরব।"

নারায়ণ বাবা খুব মধুর কণ্ঠে বললেন, "সুন্দরলাল, তুমি শাস্ত্রের মর্যাদা দিতে শেখনি।"

উত্তরে সুন্দরলাল বলল, "নারায়ণ বাবা, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না, আপনি তো রামায়ণের যে ধোপা তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনতে পান, কিন্তু রামরাজ্যের জন্যে উন্মুখ সুন্দরলালের কণ্ঠস্বর কেন শুনতে পান না!"

একটু আগেও যারা মারমুখি হয়েছিল, তারাই আবার গ্যাঁট হয়ে বসতে বসতে বলল, "আরে শোনই না, আসলে ও কি বলতে চায় শোন।…"

রসালু আর নেকিরাম সুন্দরলালকে সামনের দিকে ঠেলে দিল। সুন্দরলাল বলতে লাগল :

"শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন আমাদের পথপ্রদর্শক, কিন্তু বাবাজী এ কি-রকম ব্যাপার, উনি শুধু ধোপার কথাই সত্য বলে গ্রহণ করলেন—সত্যবতী মহারাণী সীতার সতীত্বের ওপর উনি বিশ্বাস রাখতে পারলেন না কেন ?"

নারায়ণ বাবা নিজের দাড়ি পাকাতে পাকাতে বললেন, "সুন্দর-লাল, সীতা হচ্ছেন ওঁর আপন ঘরণী। এই কথার যে গভীরতা তা তুমি উপলব্ধি করতে পারনি।"

সুন্দরলাল বলল, "আপনি ঠিক কথাই বলেছেন বাবাজী, এ দুনিয়ায় এমন বহু কথা আছে, যা আমার মগজে ঢোকে না। কিন্তু সত্যিকারের রাম আমি তাকেই মনে করি, যে স্বয়ং নিজের ওপর অত্যা-চার করে না। যে নিজে নিজের ওপর অত্যাচার করে, তার মতো পাপী আর কে আছে। অন্যের ওপর অত্যাচার করলে এত পাপ হয় না। ভগবান রাম সীতাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন…তাঁর অপরাধ তিনি রাবণের অন্তঃপুরে বন্দিনী ছিলেন। সীতা এর জন্যে কেন অপ-রাধিনী হবেন ? তিনিও কি আমাদের অনেক মা-বোনের মতোই ছলনা আর কপটতার শিকার হননি ? রামায়ণে সীতার সততা-অসততা বা রাবণের অত্যাচার যেভাবেই লিপিবদ্ধ হোক না কেন, রাবণের যে দশটা মাথা, তা দেখতে মানুষের মতোই। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় মাথাটি হচ্ছে গর্দভের।…আর আজকে, আমাদের যে সীতা তাকেও নির্বাসিত করা হয়েছে…সীতা…লাজবন্তী…" বলতে বলতে সুন্দরলালবাবু হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল। রসালু এবং নেকিরাম সমস্ত পোস্টার এক এক করে তুলে নিল। পোস্টারগুলিতে যে স্লোগান লেখা ছিল স্কুলের ছেলেরা তার ওপর কাগজ সেঁটে দিয়েছিল। মিছিলের একজন হঠাৎ স্লোগান দিল 'মহাসতী সীতা জিন্দাবাদ।' আর একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিড়ের অন্যপ্রান্ত থেকে স্লোগান ভেসে এল, "শ্রীরামচন্দ্র"…

স্লোগান এবং পাল্টা স্লোগানকে থামানোর জন্যে অনেকে এক সঙ্গে চীৎকার করে উঠল "আরে থাম, চুপ কর।"

নারায়ণ বাবার রামায়ণ-কথা ভণ্ডুল হয়ে গেল। অনেকেই মিছিলে

যোগ দিল। মিছিলের পুরোভাগে ছিল উকিল কালিকাপ্রসাদ এবং মুহুরি হুকুম সিং। পুরনো ছড়িটা মাটির ওপর ঠুকতে ঠুকতে ওরা মিছিল নিয়ে চৌকি কলার দিকে এগিয়ে চলল। কালিকাপ্রসাদ আর হুকুম সিং-এর পেছনে ছিল সুন্দরলাল, ওর দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে জলের ধারা নামছিল। আজ ও খুবই আঘাত পেয়েছে। মিছিল খুশিতে গলায় গলা মিলিয়ে গেয়ে চলেছে :

"হথ লাঁয়াঁ কুমলান নী লাজবন্তী দে বুটে।..."

তখনও গানের ধুন কানের মধ্যে গুনগুন করছে, ভোরের আলো তখনও সম্পূর্ণ ফুটে ওঠেনি। মহল্লা মুল্লা শকুরের চারশ চোদ্দ নম্বর বাড়ির বিধবা বধূ তখনও বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া নিতে নিতে বিরহ ব্যথায় কাতরাচ্ছে, এমন সময় সুন্দরলালের বন্ধু লাল চন্দর ছুটতে ছুটতে এল। নিজেদের প্রচেষ্টা এবং প্রতিপত্তি খাটিয়ে সুন্দরলাল এবং কালিকাপ্রসাদ লাল চন্দরকে রেশনের ডিলারশিপ পাইয়ে দিয়েছে। লাল চন্দরের গায়ে একটা মোটা মতো চাদর জড়ানো। সে হাত জোড় করে বলল :

"সুন্দরলাল বাবু, আপনাকে অভিনন্দন।"

তামাকে গুড় মাখাতে মাখাতে সুন্দরলাল বলল, "কিসের জন্যে আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছ, লাল চন্দর ?"

"আমি লাজো ভাবিকে দেখে এলাম।"

সুন্দরলালের হাত থেকে কল্কে ছিটকে পড়ে গেল। মেঝেতে মিঠে তামাক ছড়িয়ে গেল। দু-হাত দিয়ে লাল চন্দরের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করল, "লাজোকে কোথায় দেখেছ ?"

"বাগহ-এর সীমান্তে।"

ধরা কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সুন্দরলাল বলল, "তাহলে নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে ?"

লাল চন্দর তাকে আশ্বস্ত করে বলল, "না ভাইসাহাব, অন্য কেউ নয়, লাজো ভাবি-ই।"

"তুমি ওকে ঠিক চিনতে পেরেছিলে ?" সুন্দরলাল মেঝে থেকে মিঠে তামাক হাতের তালুতে ডলতে ডলতে জিজ্ঞেস করল। তারপর

রসালুর কল্কে হুকোতে বসিয়ে আবার প্রশ্ন ছুড়ল, "কি দেখে চিনলে যে ও লাজো ?"

"তার থুতনি আর গালের ওপর যে ছোট ছোট কলকা আঁকা ছিল।...."

সুন্দরলাল ওর কথার খেই ধরে বলল. "হাঁ, হাঁ, কপালেও আছে।" ও কিছুতেই চাইছিল না আর কোন সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকুক। লাজবন্তীর শরীরের পরিচিত সমস্ত কলকা ওর এক এক করে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল—ছেলেবেলায় ও নিজেই সখ করে কলকাগুলো খুদিয়ে নিয়েছিল। কলকাগুলো ছিল আবছা আবছা সবুজ রঙের, দেখতে অনেকটা লজ্জাবতী লতার দানার মতো। কলকার কথা উঠলেই লাজবন্তী লজ্জায় লাল হয়ে উঠত, যেন ওর সমস্ত গোপনীয়তা কেউ জেনে ফেলেছে—ওর গোপন খাজাঞ্চীখানা লুট করে যেন ওকে পথের ভিখারিতে পরিণত করা হয়েছে।...সুন্দরলালের সারা দেহমনে যেন এক অজ্ঞাত ভালোবাসা এবং পবিত্রতার শিহরণ খেলে গেল। ও আবার লাল চন্দরের কাঁধ চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "বাগহতে লাজো কিভাবে এল ?"

লাল চন্দর বলল, "বাগহ সীমান্তে ভারত এবং পাকিস্তানের মেয়েদের আদান প্রদান হচ্ছে।"

সুন্দরলাল গুটিসুটি মেরে বসে বলল, "তারপর কি হল ?"

রসালুও খাটিয়ায় উঠে বসল, বসে তামাকখোরের যে অদ্ভুত ধরনের কাশি, সেইভাবে কাশতে কাশতে জিজ্ঞেস করল, "সত্যি সত্যি, লাজবন্তী ভাবি এসেছে ?"

লাল চন্দর না থেমে গড় গড় করে বলে চলল, "বাগহতে আমরা ষোল জন মেয়ে পাকিস্তানে ফেরত দিই, পরিবর্তে ষোল জনকে নিই। কিন্তু আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে এক তুমুল ঝগড়া বেঁধে ওঠে। আমাদের ভলান্টিয়াররা বলল, 'তোমরা যে মেয়েগুলো ফেরত দিয়েছ, তার অধিকাংশই হয় বুড়, নয় আধবুড়ি। সবাই একজোট হয়ে ঝগড়া করতে লাগল। সেই সময় পাকিস্তানের ভলান্টিয়াররা লাজো ভাবিকে দেখিয়ে বলল, 'তোমরা একে বুড়ি বলছ ? তোমরা যত মেয়ে ফেরত দিয়েছ তাদের কারোর সঙ্গে এর তুলনা হয় ?' আর লাজো ভাবি

সবার নজর বাঁচানোর জন্যে তার ছোপ-ছোপ কলকাগুলো লুকনোর চেষ্টা করতে লাগল।

ঝগড়া বেড়ে চরমে উঠল। দু পক্ষই নিজের নিজের মাল ফেরত নেওয়া ঠিক করল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, 'লাজো ভাবি, চলে এস।' চীৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলে আমাদের সিপাইরা লাঠি চালাল।

সত্যতা যাচাই করার জন্যে লাল চন্দর কনুই-এ লাঠির আঘাতের চিহ্ন দেখাল। রসালু আর নেকিরাম চুপচাপ বলেছিল, একটি কথাও তাদের মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল না। আর সুন্দরলাল বহুদূর পর্যন্ত তার দৃষ্টি প্রসারিত করে এক অদ্ভুত চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল—'লাজো আসছে, না না, লাজো নয় ...সুন্দরলালের মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছিল, যেন হাজার হাজার মাইল তেতে-ওঠা বিকানিরের মরুপ্রান্তর পার হয়ে সে হেঁটে এসেছে। এসে গাছের শীতল ছায়ার নীচে বসে হাফাচ্ছে, এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না, বলতে পারছে না; "আমি পিপাসার্ত, আমাকে একটু জল দাও।" ওর মনে হচ্ছিল, দেশ ভাগের আগে যে রকম হিংসা-দ্বেষ ছিল, আজও ঠিক তেমনি আছে বরং তা যেন আরও শক্ত আরও মজবুত হয়েছে। শুধু তার আদলটুকু পালটিয়েছে মাত্র, কারো প্রতি কারো কোন সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই। কাউকে জিজ্ঞেস কর, 'সাঁভরওয়াল-এ লহনা সিং আর তার ভাবি বন্তী থাকত....' সঙ্গে সঙ্গে বিনা দ্বিধায় জবাব দেবে, 'কবে মারা গেছে।' এই মৃত্যু এবং মৃত্যুর যে গভীর তাৎপর্য তা দুপায়ে মাড়িয়ে সে নির্বিকারভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। এগিয়ে গিয়ে নিরুত্তাপ মানবতার জননীর সওদাগর হিসেবে নিজেকে জাহির করে। তারপর মানবতার রক্ত আর মাংসের কেনা-বেচা শুরু করে দেয়—যেন হাটে দুগ্ধবতী কোন মেষ বা গাভীর মুখ হাঁ করিয়ে তার বয়স আন্দাজ করা হচ্ছে। বিক্রির জন্যে হাটে নিয়ে আসা এই দুগ্ধবতী গাভীর মতোই যুবতী মেয়েদের রূপ-রস-মমতায় ভরপুর রহস্যময়তা এবং খোদাই-করা কলকাগুলোর যেন এক প্রকাশ্য প্রদর্শনী খুলে বসেছে। আর এই রেওয়াজ ক্রমশ সওদাগরদের দেহের শিরা এবং উপশিরায় নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছে। প্রথম প্রথম হাটে মালপত্র নিয়ে দর-কষাকষি

করে বিক্রি হত, তারপর নিজেদের মধ্যে আপসে রফা হত। আপন-রফা হয়ে গেলে হাতের তালুতে রুমাল পেতে নিত। আর সেই রুমালের নীচে আঙ্গুল নাড়িয়ে নাড়িয়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিত, কত দিলে চলবে। এখন আর রুমালেরও প্রয়োজন হয় না, খোলাখুলিই বেচাকেনা চলে। সওদাগরীর সামান্যতম যে নিয়ম-কানুন তা মানুষ ভুলে বসে আছে। এই বেচাকেনা এই কারবার দেখে 'বোকাশায়ো-র গল্প মনে পড়ে যায়। 'বোকাশায়ো'-তে এমনই এক বাজারের বা হাটের বর্ণনা আছে, যা মেয়েদের প্রকাশ্য কেনাবেচার বর্ণনা ছাড়া আর কিছু নয়। 'উজবুকরা' নগ্ন নারীর সারা অঙ্গ খুটিয়ে খুটিয়ে পরখ করছে। আঙ্গুল দিয়ে টিপে টিপে যখন পরখ করছে, সেখানে গোলাপী রঙের একটা টোল পড়ছে। আর সেই টোলের পাশ দিয়ে চক্রাকারে সাদা আর লালের মিলমিশ ঢেউ খেলে যাচ্ছে। পরখের পর পছন্দ না করে উজবুকরা চলে গেলে পরাজিত মেয়েরা অপমানের জ্বালা বুকে নিয়ে এক হাতে কোমরের দড়ি আর অন্য হাতে মুখ লুকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। কয়েক মুহূর্ত কেটে যাওয়ার পর পরাজয়ের যে গ্লানি, সেই গ্লানিও ধীরে ধীরে সরে যায়। নগ্ন দেহে তারা 'সিকন্দরিয়া' বাজারের জনবহুল পথ দিয়ে হেঁটে চলে। তারপর তারা আবার 'ত্রাইসেরা'-র রূপে বিভূষিত হয়ে ওঠে। একজন তার বান্ধবী সায়সোকে বলে, 'সায়সো, বলতো এ কী ধরনের নির্মম ঠাট্টা! দেখ সামনের দেয়ালে কি লিখে রেখেছে :

"বাকিস থেরসাইটিসের জন্যে
শুধু দুটো 'সিকি' খরচ কর।"

ও আবার নিজেই অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করল, "মাত্র দুটি সিকির বিনিময়ে…?"

সায়সো তখন বলল, "আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করার অধিকার কোন পুরুষ মানুষের নেই। বাকিসের জায়গায় যদি আমার নাম লেখা থাকত, তবে আমি লেখাগুলো মুছে দিতাম…"

বলতে বলতে ওরা মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, দেখল আর একটা দেয়ালে লেখা রয়েছে :

"নিতুসের সায়সো টায়মনের জন্যে
একটি রৌপ্য মুদ্রা…"

মুহূর্তের মধ্যে সায়সোর মুখে একটি গোলাপী আভা খেলে গেল। ও দেয়াল-লিখনের কাছে এগিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। আর অন্যান্য মেয়েরা ঈর্ষা এবং বিদ্বেষভরা চোখে তার দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল।

সুন্দরলাল অমৃতসরের সীমান্তে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় খবর এল লাজো এসে গিয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দরলাল হকচকিয়ে গেল। চৌকাঠের দিকে এক পা বাড়িয়ে দিয়ে ও আবার পিছিয়ে এল। মনে হচ্ছিল, কমিটির সমস্ত প্ল্যাকার্ড এবং পোস্টার বিছিয়ে এখনই বসে পড়ে এবং মন উজাড় করে খু-উ-ব কাঁদে। কিন্তু সবার সামনে এভাবে কান্না ও ঠিক মনে করল না। পুরুষের যে পৌরুষত্ব তা সে আবার নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনল, নিজের দুর্বলতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর নিজস্ব ঢঙে মাটিতে পা ফেলে ধীরে ধীরে চৌকি কলার দিকে এগিয়ে গেল এবং যেখান থেকে লুণ্ঠিতা মেয়েদের হাত-বদল করা হয়, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল সুন্দরলাল।

সামনেই লাজো দাঁড়িয়েছিল। অজানা এক আশঙ্কায় ও থরথর করে কাঁপছিল। সুন্দরলালকে তার চেয়ে ভালোভাবে কে চেনে বা জানে। বিয়ের পর থেকেই সুন্দরলাল ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত। আর আজকে ও অন্য পুরুষের সঙ্গে জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে এসেছে, না জানি আজ সে কি করে বসে! সুন্দরলাল লাজোর দিকে তাকাল, দেখল পুরোপুরি মুসলমানী কায়দায় একটা ওড়না বুকের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। আর সেই ওড়নার বা দিকটা বেশ খানিকটা নেমে গিয়ে দোল খাচ্ছে···এ হচ্ছে অভ্যেস, নেহাতই অভ্যেস···পরবর্তী জীবনের যে অভ্যেস তার সঙ্গে ও নিজেকে কোনমতে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ও জানে, নিজে যে পিঞ্জরে আবদ্ধ তার থেকে উড়ে যাওয়া এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সুন্দরলালের কথা ও এত ভাবছিল যে, কাপড় এবং ওড়না ঠিক মতো পরতে ও একেবারে ভুলে গিয়েছিল। হিন্দু আর মুসলমানদের মধ্যে আদব-কায়দায় যে মূল পার্থক্য—'আঁচলের ডান খুট আর বা খুটের' তা বেমালুম

ভুলে যায়। আর এই মুহূর্তে, সুন্দরলালের সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ও আশা আর নিরাশার এক অজানা ভয়ে থরথর করে কাঁপছিল।

সুন্দরলাল যেন আচমকা এক ধাক্কা খেল। দেখল, লাজবন্তীর গায়ের রঙ আগের চেয়ে অনেক খুলেছে, আর গায়ে-গতরে বেশ মাংস লেগেছে। না, শুধু স্বাস্থ্যবতীই হয়নি, বেশ মুটিয়ে গিয়েছে ও। লাজোকে নিয়ে সুন্দরলাল যেমনটি যেমনটি ভেবেছিল, সবই তাহলে মিথ্যে। ও ভেবেছিল, দুঃখে-শোকে লাজবন্তী একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে, ওর গলার স্বরও বোধহয় মিহি হয়ে গিয়ে ওকে বোবা করে দিয়েছে। কিন্তু দেখে মনে হল ও পাকিস্তানে বেশ আনন্দেই ছিল। ওর এই রূপ সুন্দরলালের ভালো লাগল না। ও নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল, কারণ ও আজ দিব্যি খেয়েছে। শুধু একটা ব্যাপারই ওর মাথায় ঢুকছিল না, পাকিস্তানে যদি ও আনন্দেই থাকবে, তবে এখানে এল কেন? খুব সম্ভব ভারত সরকারের চাপে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ও এখানে আসতে বাধ্য হয়েছে। ঠিক বুঝতে পারল না, ওর শ্যামবর্ণের ওপর এমন মসৃণতা কিভাবে এল, শুধু ক্লান্তি আর গ্লানির জন্যেই কি ওর দেহে মেদ হয়েছে—দুঃখের ভারে কি ও মুটিয়ে গিয়েছে, ওকে স্বাস্থ্যবতী বলে মনে হচ্ছে! কিন্তু এত মুটিয়ে গিয়েছিল ও যে, দু'পা হাটলেই ওর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

লাজোর সঙ্গে প্রথম দৃষ্টি বিনিময় হতেই ওর ভেতরে এক অদ্ভুত ধরনের মানসিকতার সৃষ্টি হল, কিন্তু তবুও সে তার নিজের মতটাকেই আঁকড়ে ধরে রইল। আশেপাশে আরও অনেক দাঁড়িয়েছিল। কে যেন বলল:

"আমরা মুসলমানদের উচ্ছিষ্ট মেয়েদের নেব না।"

কিন্তু রসালু নেকিরাম এবং চৌকি কলার বুড়ো মুহুরির স্লোগানের গমগম আওয়াজের নীচে ক্রমশ তা তলিয়ে গেল। কালিকাপ্রসাদের ফ্যাসফেসে গলার যে চীৎকার তা অন্য আওয়াজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ছিল। ও লম্বা লম্বা শ্বাস নিচ্ছে আর সমানে বলে চলেছে। এ হচ্ছে এক নতুন ধরনের বাস্তবতা—এ বাস্তবতা নতুন পরিস্থিতিতেই উদ্ভব হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, আজ যেন ওরা নতুন বেদ নতুন পুরাণ আর নতুন শাস্ত্র পড়ে এসেছে। এবং ওরা যে লড়াই-এ অংশ গ্রহণ

করেছে, সেই লড়াই-এ অন্যকেও সামিল করতে চাইছে।

অজস্র মানুষ এবং তাদের স্লোগানের আওয়াজে আবদ্ধ হয়ে লাজো আর সুন্দরলাল তাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। এই শোভাযাত্রা দেখে হাজার বছর আগের কথা মনে হচ্ছিল, যেন রাম-চন্দ্র আর সীতা স্বেচ্ছা বনবাস পর্ব শেষ করে অযোধ্যায় ফিরছেন। আর অযোধ্যাবাসীরা সারা হৃদয় উজাড় করে প্রদীপ এবং মালায় সজ্জিত করে বহু দুঃখ-কষ্টের পর তাঁদের যে সাফল্য, সেই সাফল্যের জন্যে তাঁরা জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

লাজবন্তী ঘরে ফিরে আসার পরও সুন্দরলাল আগের সেই একাগ্রতা নিয়ে এবং পরিশ্রমের সঙ্গে 'হৃদয়ে স্থান দাও' আন্দোলন অব্যাহত রাখল। কিন্তু তা সত্বেও আগের যে উদ্দীপনা তা অনেকটা থিতিয়ে গেল। সুন্দরলালের কথাগুলো অনেকের কাছে শুধু আবেগ সর্বস্ব বলে মনে হতে লাগল। ফলে তারা শক্তি হারিয়ে ফেলতে শুরু করল।

কিন্তু কে কি ভাবল বা করল তা নিয়ে সুন্দরলাল বাবু একেবারেই মাথা ঘামাত না। ওর হৃদয়ের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী সে ফিরে এসেছে —ওর হৃদয়ে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল তা বুজে গিয়েছে। সুন্দরলাল লাজোর স্বর্ণমূর্তি নিজের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করে স্বয়ং সেই মন্দিরের দোর গোড়ায় বসে আরাধনা শুরু করে দিল। প্রথম প্রথম ভয়ে শঙ্কায় লাজো কুঁকড়িয়ে থাকত, কিন্তু সুন্দরলালের উদারতা দেখে ধীরে ধীরে পাপড়ি মেলতে লাগল।

সুন্দরলাল লাজোকে আর 'লাজো' বলে ডাকে না, বলে 'দেবী'।

আর লাজো এক অজানা আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে যেন মত্ত হয়ে উঠেছে। ওর ভীষণ ইচ্ছে, সুন্দরলালকে সমস্ত কিছু খুলে বলে। আর বলতে বলতে এমন অঝোরে কাঁদবে, কান্নার স্রোতে ওর সমস্ত অপরাধ সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে নির্মল হয়ে যাবে।

কিন্তু সুন্দরলাল লাজোর কোন কথাই শুনতে বা জানতে আগ্রহী নয়। তাই লাজো তার পাপড়ি মেলতে মেলতে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। সে যেন এই লুকোচুরি খেলায় ধরা পড়ে যায়। সুন্দরলাল এর কারণ জিজ্ঞেস করলে ও 'উহু', 'না' 'এমনি' এর বেশী আর কিছু

বলতে পারে না। সারাদিনের খাটাখাটুনির পর ঘরে ফিরে সুন্দরলাল ক্লান্তি আর অবসাদে ঝিমুতে থাকে।

প্রথম দিকে দু-একবার 'দুর্যোগের দিনগুলির' কথা তুলে সুন্দরলাল জিজ্ঞেস করেছিল, "লোকটা কে?"

মাটির দিকে চোখ নামিয়ে লাজবন্তী উত্তরে বলেছিল, 'জুম্মা'। তারপর সোজাসুজি চোখ তুলে সুন্দরলালকে সমস্ত কিছু খুলে বলতে চেয়েছিল, কিন্তু সুন্দরলাল এক অদ্ভুত ধরনের এক বিস্মিত দৃষ্টি নিয়ে লাজবন্তীর দিকে তাকিয়ে রইল আর ওর কালো চুলের গভীরে আলতোভাবে আঙুল দিয়ে বিলি কাটতে লাগল—লাজবন্তী লজ্জায় আবার চোখ নামিয়ে নিল। সুন্দরলাল তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন খারাপ ব্যবহার-ট্যাবহার করেনি তো?

"না।"

"মারধোর করত?"

লাজবন্তী সুন্দরলালের বুকের ওপর মাথা রেখে বলল, "না।"

তারপর সে আবার বলল, "ও আমাকে কোনদিন গালিগালাজ বা মারধোর করেনি। কিন্তু ওকে দেখলেই আমার কেমন ভয় ভয় করত। তুমি আমাকে মারতে, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার ভয় লাগত না।··· আমাকে এখন তো আর মারবে না?"

সুন্দরলালের চোখ ছল ছল করে উঠল। লজ্জায় আর ব্যথায় ও কঁকিয়ে উঠল, 'না দেবী, তোমাকে আর কোনদিনও মারব না। না, কোনদিন না।"

লজ্জাবতী মনে মনে উচ্চারণ করল, 'দেবী'। দুচোখ ওর জলে টলমল করে উঠল।

এরপর লজ্জাবতী ওর সমস্ত কথাই সুন্দরলালকে খুলে বলতে চাইল। কিন্তু সুন্দরলাল বলল, "পুরনো কথা ছেড়ে দাও। এর জন্যে তোমার কি অপরাধ? সমস্ত অপরাধ হচ্ছে আমাদের সমাজের—যে সমাজ তোমার মতো দেবীকে মর্যাদা দিতে নারাজ। এতে তোমার কোন ক্ষতিই হবে না, ক্ষতি হবে এ সমাজেরই।"

লাজবন্তীর মনের কথা মনের মধ্যেই রয়ে গেল। কোন কথাই ও আর খুলে বলতে পারল না। শুধু মুখ বুজে ওর মুটিয়ে যাওয়া দেহের

ওপর চোখ বোলাতে লাগল। দেশ ভাগের পর এই দেহ দেবীর শরীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে—তা আর মানবী লাজবন্তীর শরীর নয়। ও সুখী, ও খুব আনন্দিত। এমন এক অদ্ভুত ধরনের আনন্দে ও আবিষ্ট, যার মধ্যে শঙ্কা এবং ভয় থরে থরে জমাট বেঁধে রয়েছে। আনন্দ আর খুশীতে থাকতে থাকতে ও অনেকবার চমকে উঠে বসেছে, কে যেন পা টিপে টিপে আসছে। আর সেই পায়ের শব্দে কান খাড়া রেখে আগ্রহে অপেক্ষা করেছে।

তারপর অনেক—অনেক দিন কেটে গিয়েছে, খুশি আর আনন্দের জায়গায় দুঃখ এসে বাসা বেঁধেছে। সুন্দরলাল আবার তার পুরনো পশুত্ব জাহির করছে বলে এই দুঃখবোধ আসেনি। বরং ও লাজোকে খুব আদর আর ভালোবাসতে শুরু করেছে। যে আদর আর ভালোবাসায় লাজো একেবারেই অভ্যস্থ নয়। লাজো আবার সুন্দরলালের সেই পুরনো লাজো হতে চায়—সামান্য কারণে যে তুমুল লড়াই ঝগড়া এবং পরমুহূর্তে ভাব করত। কিন্তু এখন আর লড়াই ঝগড়ার জন্যে তার মন উশখুশ করে না। সুন্দরলাল তার ভেতরে এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি করে দিয়েছে যেন সে কাঁচের আসবাব, ছুঁলেই ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাবে।....লাজো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে—নিরীক্ষণ করতে করতে তার মনে হয় সে আর সব কিছুই হতে পারে, কিন্তু কোন দিন আর লাজো হয়ে উঠতে পারবে না। ও আশ্রয় পেয়েছে সত্য, কিন্তু মনে হল ও আশ্রয়হীন—ছন্নছাড়া···।

ওর চোখের যে প্রবাহিত জলের ধারা, ওর যে দীর্ঘশ্বাস তা দেখার মতো দৃষ্টি বা শোনার মতো শ্রবণেন্দ্রিয় সুন্দরলালের একেবারেই ছিল না। মহল্লা মুল্লা শকুরের সবচেয়ে যে বড় সংস্কারক, সে নিজেই জানে না—হৃদয় কত কোমল, কত স্পর্শকাতর।···প্রভাতফেরি বের হয়েছে, রসালু আর নেকিরামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সুন্দরলাল যন্ত্রে ঘড় ঘড় আওয়াজের মত গেয়ে চলেছে।

“হথ লাঁয়া কুমলান নী লাজবন্তী দে বুটে···।